অখণ্ড সংহিতা

বা

ত্রয়োবিংশ শ্রী শ্রী স্বামী খণ্ড

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

দ্বাবিংশ খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ, কার্ত্তিক ১৪২

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

র্মার্থ শুল্ক : একশত টাকা

মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মুদ্রণ সংখ্যা ,২,০০০ (দুই হাজার) [২০১]

প্রকাশক— অযাচক আশ্রম
ডি. ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী—২২১০১০
দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টারঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
ডি. ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
লাক্সা, বারাণসী - ২২১০১০

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি, আই টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলিকাতা—৭০০০৫৪ । দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মণগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১) ২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২)
২২০২১২

"সাধন কুঞ্জ"
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড । দূরভাষ-০৩২৬-২৩১০৭১০

"দি মাল্টিভার্সিটি"
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড : ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫ অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

অখণ্ড-সংহিতা দ্বাবিংশ খণ্ডের প্রথম সংস্করণের নিবেদন

ইতঃপূর্ব্বে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অমৃতময়ী উপদেশবাণী "অখণ্ড-সংহিতা" একবিংশ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কোনও কোনও খণ্ডের দুই, তিন, চারিটা অবধি সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে। যে সকল খণ্ড সম্পূর্ণ বিক্রীত বা বিতরিত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পুনর্মুদ্রণের কাজে আমাদের মুদ্রাযন্ত্র ব্যস্ত থাকায় সময় মত দ্বাবিংশ খণ্ডের মুদ্রণ আরম্ভ করিতে পারি নাই। বিলম্বে হইলেও কাজ আমরা পুনরায় শুরু করিয়াছি। বাকীটুকু পরমেশ্বরের হাত।

এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা ভারতীয় জীবন-দর্শনে একটী দিক্-পরিবর্ত্তনের সূচনা লক্ষ্য করা যাইতেছে। একদিকে নানা স্থানে "অখণ্ডমণ্ডলী" স্থাপনের মধ্য দিয়া সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ববর্ণের লোককে একত্র বসাইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সমবেত উপাসনার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা পদ্ধতিবদ্ধ ভাবে চালু হইতেছে। অন্যদিকে, সাধ্যমত দেশের সকল অঞ্চলে কিছু কিছু কর্ম্মীকে প্রচারকর্ম্মে প্রশিক্ষণ প্রদান করিয়া দেশব্যাপী চরিত্র-গঠনের এক আন্দোলন চালু করা হইতেছে, যাহার সহিত কোনও ধর্ম্মীয় মতের, কোনও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার,

কোনও রাজনৈতিক আদর্শের কোনও সংঘাত নাই। দেশের মানুষ চরিত্রবান্‌ হইলে ধর্ম্মীয়, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কর্ম্মীদের কোনও কর্ম্মেরই বাধা উৎপন্ন হয় না বলিয়াই শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-প্রবর্ত্তিত এই আন্দোলন দেশের মাটিতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া শিকড় ছড়াইতে সমর্থ হইতেছে।

"অখণ্ড-সংহিতা" শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণীর সঙ্কলন মাত্র। এই গ্রন্থ তাঁহার জীবনী নহে। নিজ জীবনকে প্রকাশিত করিবার ব্যাপারে এই মহাপুরুষ কেবল উদাসীনই নহেন, অত্যন্ত অনাগ্রহী। তিনি বলেন,—"আমি তোমাদের দশ জনের মতই একটী সাধারণ মানুষ। বস্ত্রাবরণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত এই আমাকে তোমরা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের চক্ষুতে যতটুকু দেখিতে পাইতেছ, আমি তাহা অপেক্ষা এক ইঞ্চিও বড় নহি। তবে, তোমাদের প্রতি জনের মধ্যে যেমন তোমাদের অজ্ঞাতসারেও অন্তর্নিহিত সীমাহীন শক্তি বিরাজিত, আমার পক্ষেও তাহা হইতে পারে। এতটুকু সম্ভাবনার কথা আমি স্বীকার করি।" নিজেকে সাধারণ মানুষ করিয়া তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছেন এবং সাধারণ মানুষের প্রচলিত সুখদুঃখগুলিকে সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী অপক্ষপাত বিচার করিয়াছেন। নিরপেক্ষতা তাঁহার প্রতিটি উপদেশের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

যাঁহাদের চেষ্টায় এই সকল উপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁদের উদ্দেশ্যে সহস্র বন্দনা উচ্চারণ করিতেছি। ইতি—

১লা শ্রাবণ, ১৩৮৪

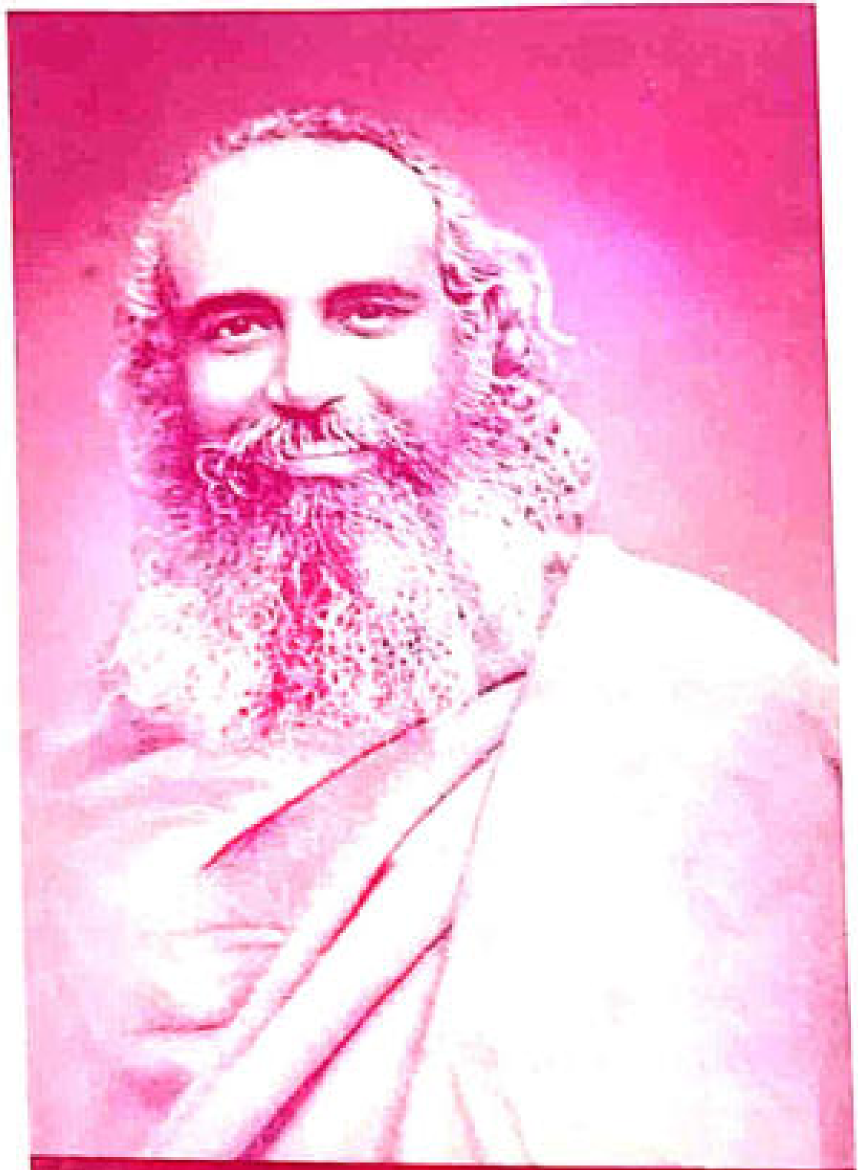
অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-১০

বিনীত—
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে দ্বাবিংশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৮৪ সনে দুই হাজার ছাপা হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'অখণ্ড-সংহিতা' দ্বাবিংশ খণ্ডের ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজারখানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিন হাজার খানা বিতরণের জন্য রাখা হইল। অখণ্ড-সংহিতার বিশেষত্ব-সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য খণ্ডের নিবেদনেই যাহা বলিবার বলা হইয়াছে।

এক লক্ষ অখণ্ড-সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতেছেন, সেই সকল মহানুভব দাতাদের দানের পরিমাণ ও নামের তালিকা "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ
পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(দ্বাবিংশ খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

পুপুন্‌কী আশ্রম
২১শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪২
(৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

আশ্রমে আসা এবং আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়া

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছেন। এমন সময়ে জনৈক অন্তেবাসী প্রশ্ন

করিলেন,—বাবামণি, আমার এই আশ্রমে বাস কত্তে ইচ্ছা কচ্ছে না। আমি কি কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাল যদি না লাগে, তবে অবশ্যই তুমি আশ্রম ছেড়ে চ'লে যেতে পার। তাতে আমার দিক থেকে আপত্তির কিছু নেই। তোমরা যখন আস, তখন একজনকেও আমি ডেকে আনি নি। কাউকে ভাঁড়িয়ে আনা আমার ধাতে নেই। কাউকে তাড়িয়ে দেওয়াও আমার স্বভাব নয়। এসেছ স্বেচ্ছায়, যাবেও স্বেচ্ছায়। তোমাকে যদি আমার অপছন্দ হয়, তা' হ'লে আমি তোমার দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য উপদেশ দিতে পারি, তাড়িয়ে দিতে পারি না। কাউকে আমি বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, মন্ত্রণা দিয়ে, বচন-বাহারে আকৃষ্ট ক'রে টেনে আনতে অধিকারী নই! সেটি আমার প্রথাও নয়। আবার চ'লে গেলে তোমার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে বেড়াব, এটাও আমার স্বভাব নয়। এসেছ হয়ত জীবনের কোনও মহৎ স্বপ্ন নিয়ে; তার যদি এখানে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা না দেখ, তবে নিশ্চয়ই তুমি নিজের দায়িত্বেই চ'লে যেতে বাধ্য। বিরল ক্ষেত্র ছাড়া বহিষ্কার আমার নীতি নয়। বর্জ্জন জিনিষটা আমি পছন্দ কমই করি। ক্ষমা এবং মার্জ্জনাই আমি ভালবাসি। আমি যে তোমাদিগকে পেট ভ'রে খেতে দিতে পারি না, সেটা আমার কৃপণতা নয়, সেটার কারণ আমার দরিদ্রতা। দরিদ্রতা-মোচনের জন্য আমি কাহারও কাছে ভিক্ষা করি না, কত্তে পারি না,—আমার দারিদ্র্যের

এটাই একমাত্র কারণ। যে সব আশ্রম ভিক্ষা ক'রে চলে, তাঁদের কর্ম্মীরা দুবেলা খেতে পান। আমি তোমাদিগকে আমার সঙ্গে সমান সমান পরিশ্রম, অর্দ্ধাশন আর অনশনই দিতে পারি। অন্য কিছু দিতে পারি না। সুতরাং তোমাদের পক্ষে বাড়ী ফিরে চ'লে যাওয়া বা অন্য কোনও আশ্রমের কর্ম্মী হওয়া ত' অযুক্তিযুক্ত নয়। যা অযৌক্তিক নয়, তাতে আমি কদাচ বাধা দেই না। তবে, তুমি যদি এখানে কোনো বিশেষ দায়িত্বের কাজের ভার নিয়ে থাক, তাহ'লে সে দায়িত্ব অপরকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে না দিয়ে হুট্ ক'রে একদিন বিনা খবরে উধাও হ'তে পার না। কারণ, তাতে প্রতিষ্ঠানটীর কোনও বিপদ ঘটতে পারে। অনশনেই থাক আর অর্দ্ধাশনেই থাক, এই গরীব সংস্থাটী তোমাকে দীর্ঘকাল অন্নদান ও আশ্রয়দানের চেষ্টা ক'রেছে। তার পক্ষে একটা ক্ষতিকর অবস্থা সৃষ্টি ক'রে চ'লে যাওয়া তোমার পক্ষে সদ্‌বুদ্ধির পরিচায়ক হবে না। "এস" ব'লে কাউকে ডাকি নি ব'লেই, "যাও" ব'লে কাউকে আমি আদেশ দিতে পারি না। অথচ সমাজের বিরুদ্ধে, গৃহস্থ-পরিবার-বিশেষের বিরুদ্ধে বা সংঘের বিরুদ্ধে কেউ যদি গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো গুরুতর অন্যায় করে, তাহ'লে মুখ মূক হ'য়ে থাকলেও মন বলতে বাধ্য হয়,—"যাও, তুমি চ'লে যাও।" অথচ যে যাবে, তার প্রতি ত' আমার প্রবল স্নেহাকর্ষণ রয়েছে। আশ্রমে থেকে যদি তুমি অতিথিরূপে অভ্যাগত-মহিলাদের

প্রতি অসম্মানপূর্ণ ব্যবহার কর বা কর্ব্বার চেষ্টা কর, অথবা আশ্রমের পরিচয়ে বিদেশে গিয়ে গৃহস্থের অন্তঃপুরে অসাধারণ খাতির জমিয়ে যদি কোনো রমণীর সম্ভ্রমকে অন্যের চোখে ছোট করো, তবে তোমাকে নিয়ে আমরা এখানে নির্ব্বিবাদে আশ্রমবাস করি কি ক'রে, বল ত'! দুনিয়ার সব আশ্রমেই এক এক বার এক এক দল নূতন কর্ম্মী আসে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ একক ভাবে, কেউ কেউ দলবদ্ধ ভাবে আশ্রম পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যায়। এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র। আদর্শের প্রতি আনুগত্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট মান আছে, যার নীচে তলিয়ে গেলে কেউ আর আশ্রমবাসের যোগ্য থাকে না। তখন কেউ যদি তাকে সরিয়ে নাও দেয়, তবু সে একটা ওজুহাত বের ক'রে নিয়ে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে এবং বাইরে চ'লে গিয়ে দরকার-মত অভিযোগ ও অপবাদ রচনা ক'রে প্রয়োজন ক্ষেত্রে তার রটনা করে। এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। ওতে আমার মন কখনো চঞ্চল হয় না।

বিবাহিতের যুগলে সাধন দিব্য জীবনের উন্মেষক

পাঁচ সাত মাইল দূরবর্ত্তী একটী গ্রাম হইতে একটী যুবক আসিয়া নানা প্রশ্ন আরম্ভ করিল।

একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একাকী

বসে ভগবানের নাম জপ কত্তে থাকলে নিজের সঙ্গে পরমেশ্বরের আত্মময় আত্মীয়তা আস্বাদিত হয়। কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী দুই জনেই যদি এক সঙ্গে ব'সে নামজপ বা ধ্যানাদি করে, তাহ'লে দুজনের সত্তা একত্র মিশে একটী সত্তায় পরিণত হ'য়ে এক সঙ্গে পরমেশ্বরের নিত্য সঙ্গের আনন্দঘন সুখ আস্বাদন কত্তে পারে। এর ফলে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে একটা অসাধারণ প্রীতির উদ্ভব হ'তে পারে, যার সাত্ত্বিকতা কদাচ তামসিকতার দ্বারা পরাজিত হয় না। বিবাহের মুহূর্ত্ত থেকেই স্বাভাবিক ভাবে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রীতি-সঞ্চারণ প্রত্যাশনীয়। যত দিন যায়, প্রীতি তত বাড়ে। কিন্তু দেহ-সংস্পর্শ-জনিত কাম বা দেহ-সান্নিধ্য-জাত মোহ তাতে প্রাধান্য নেয়। ঈশ্বরপ্রেম অনুশীলনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে যখন দুজন দুজনের সন্নিহিত হয়, তখন তাদের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সবই কাম-গন্ধবিরহিত শুদ্ধ বস্তুতে পরিণত হয়। তখন তারা হয় দেবভাবময়। যুগলে সাধন এভাবে তাদের দিব্য-জীবনকে উন্মেষিত করে।

স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দম্পতীর ভিতরে প্রেম-পরিবর্দ্ধনের জন্য কাম-চর্চ্চার কোনও আবশ্যকতা নেই, একথা যে একদল দিব্যসাধক ব'লে থাকেন, তা' অবাস্তব

কুহেলিকা নয়। তবে, বিবাহ একটা বৈধ সামাজিক সদাচার। সুতরাং বিবাহিত জীবনে আবশ্যকীয় কামাচার যদি সংযমশাসিত মনের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাকেও কামের অপবাদ থেকে মুক্তি দিতেই হবে। কিন্তু অশিক্ষিত অঞ্চলের এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আখ্যাধারী সাধকদের ভিতরে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার যে সকল প্রথা প্রচলিত আছে ব'লে প্রায়ই শোনা যায়, ওগুলির কোনও অপরিহার্য্য আবশ্যকতা আছে ব'লে আমি মনে করি না। সর্ব্বাবস্থায়ই স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ স্বাভাবিকই যেন থাকে, এই দিকে তোমরা লক্ষ্য দিও। স্বামী-স্ত্রী মিলে কোনও সাধনায় ব্রতী হ'লে তা' নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটাবে না। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যারা দাম্পত্য জীবনের গূঢ় গুহ্য সাধনায় ব্রতী হয়, তাদের ভড়ংই মাত্র বাড়ে, আসল কাজ প্রতি পদে ব্যাহত হয়। এই সকল বিষয়ে সৎসাহিত্যের একান্ত অভাব হেতু মানুষ চিরকাল অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। অথচ প্রতিটি গৃহস্থ জানে যে, বিবাহিত জীবনে কামচর্চ্চার যেমন একটা সম্মানিত স্থান আছে, পূর্ণ সংযম সাধনেরও তেমনি একটা অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি আমার কণ্ঠে এবং লেখনীতে অবিরাম এই কথা ব'লে যাচ্ছি, কিন্তু একদিন সহস্র সহস্র নরনারীকে গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে বলতে হবে,—"বড় দেরী হ'য়ে গেল ভাই, বড় দেরী হ'য়ে গেল,—আমরা সময় থাকতে ঘর ছেয়ে নিতে পারলুম না।"

জোর করে দীক্ষাদান

একজন বলিল,—অমুক ব্যক্তি বলতে শুরু করেছে যে, আপনি জোর ক'রে নাকি তাকে দীক্ষাদান করেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—জোর ক'রে আমি কখনো কাউকে দীক্ষাদান করি না। কারণ, দীক্ষাদানে আমার কোনও স্বার্থ নেই। যে ব্যক্তি দীক্ষাটা পেল, সে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আমার ব্যক্তিগত কোনও উপকার সাধন করুক, এমন কল্পনা আমি স্বপ্নেও কদাচ করি নি। আমার দ্বারা দীক্ষিত কোনও প্রাণীর প্রতি আমার ব্যক্তিগত, আর্থিক বা সামাজিক কোনও লাভের প্রত্যাশা আমার কল্পনায় ছিল না, নাই এবং কদাচ থাক্‌বে না। স্বার্থবুদ্ধিহীন না হ'তে পার্‌লে আমি ত' নিজের কাছে নিজে মিথ্যা হ'য়ে গেলাম। কেউ যদি দীক্ষা পাবার পরে মনে ক'রে থাকে যে, আমি তাকে জোর ক'রেই দীক্ষা দিয়েছি, অথবা দীক্ষা সে স্বেচ্ছায় নেবার পরেও যদি মনে করে যে, দীক্ষা নেওয়াটা তার পক্ষে ভুল হ'য়ে গেল, তবে অবাধে সে আমার প্রদত্ত দীক্ষামন্ত্র পরিত্যাগ কত্তে পারে। সে অধিকার আমি তাকে দীক্ষাদান-কালেই দিয়ে রেখেছি। হাজার হাজার দীক্ষার্থীকে আমি দীক্ষার দিনই ত' ব'লে দিয়েছি যে, আমার দেওয়া দীক্ষায় যে দিন অনাস্থা আস্‌বে, সঙ্গে সঙ্গে তা' ত্যাগ কর্ব্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গুরু ব'লে ভাববার অভ্যাসটা ত্যাগ ক'রে দেবে।

অন্য কোনও গুরু বিনা অভিসম্পাতে এমন দরাজ হুকুম দেবেন কিনা, আমি জানি না কিন্তু আমি তা' দিয়ে রেখেছি। এই জন্যই বর্ষে বর্ষে আমার কাছ থেকে শিষ্যদের নিকটে পত্র যায় না যে, বার্ষিক প্রণামীটা পাঠাচ্ছ না কেন? যারা মনে কচ্ছে যে, আমার কাছে মন্ত্রদীক্ষিত হ'য়ে ভুল করেছে, তারা সবাই দ্রুত অন্যত্র দীক্ষা নিয়ে মনের সঙ্কট মোচন করুক। বৃথা ধান্দায় প'ড়ে থেকে যেন দুর্লভ মনুষ্য-জন্মটা ব্যর্থ ক'রে না ফেলে। চারিদিকে মহাপুরুষের অভাব নেই। তাঁরা যে-কেউ আমার চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী ব্যক্তি। তাঁদের কারো আশ্রয়ে গেলে নিশ্চয়ই আমার প্রতি অন্যায় মোহ পরিহার করা কঠিন হবে না। দলে দলে তাঁদেরই শরণাপন্ন হও এবং তাঁদের দেওয়া সাধন-মার্গে অগ্রসর হবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা কর। একটা নির্দ্দিষ্ট লোককে দীক্ষা দিয়ে আমি হয়ত ভুল ক'রে থাকতে পারি। কিন্তু এই সব মহাপুরুষেরা ত' ভুল-ভ্রান্তির অতীত। তাঁরা আমার মতন ভুল কিছুতেই কর্ব্বেন না। সুতরাং রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে, তবে আবার ভয় কি?

বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাসি হাসিলেন। প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল,—একজন যদি মানুষ না চিনে ভুল ক'রে একটী মেয়েকে বিয়ে করে এবং বিয়ের পরে যদি বুঝতে পারে যে, বড়ই ভুল হ'য়ে গেছে, তখন স্ত্রীটী অন্যত্র চ'লে

গিয়ে আর একজনকে স্বামী কর্‌লে তার প্রথম পতি কি আপনার মত এই রকম অট্টহাস্য কর্ব্বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে কথা আমি বল্‌তে পাচ্ছি না। স্বামী যদি সরলচিত্তের মানুষ হয়, স্ত্রীর কাছে যদি তার যশ, মান, অর্থ, স্নেহ সুখ, সমাদর বা ভালবাসা প্রভৃতি কোনও কিছুরই প্রত্যাশা না থাকে, তবে হয়ত সে আমারই মতন অট্টহাসি হেসে গুরু-গম্ভীর ব্যাপারটাকে একেবারে গোলাপ-জলের মতন লঘু ক'রে দেবে।

স্থানীয় প্রতিকূলতা

একজন বলিল,—পুপুন্‌কী আশ্রমে একটা হাইস্কুল করার জন্য চারদিকের গ্রামে বেশ টাকাকড়ি এবং অনেক ধান্য-ফসল তোলা হচ্ছে। কতদিনে আপনি জিনিষটী গড়তে পার্ব্বেন? লোকেরা অস্থির অধীর হ'য়ে পড়েছে। অনেকে আপনার অপবাদও কচ্ছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি কিন্তু কারো কোনো টাকাকড়ি আজও হাতে নিই নাই। আমি কিন্তু কারো ধান, চাল, গম, যব, কিছুই গ্রহণ করি নাই। বিদ্যালয় চালানোর মত এত বড় একটা কাণ্ড কত্তে যে অর্থবল দরকার, আমার দ্বারা তা' অর্জ্জিত হ'য়ে এদেশে এখনো আসে নাই। সুতরাং কবে কি হবে, তা' আমি বাবা বল্‌ব কি ক'রে? পেয়েছি এক শ' বিঘা মাটি, তাও সর্ব্বত্র পুরাণো শালগাছের বিরাট

বিরাট মুড়াতে বোঝাই। গত ছয় সাত বৎসর ত' কেবল শালের মুড়াই তুললাম। তবু সিকি জমি উদ্ধার কত্তে পারি নি। সুতরাং আমার কার্য্যারম্ভে কত দেরী হবে, তা' ত' অনুমান কত্তে পাচ্ছি না।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিল,—এই জন্যই ত' এই বিষয় নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে সকলের তীব্র অসন্তোষ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ছুটে ছুটে যাব রংপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, সন্দীপ, বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিব, ভিক্ষা কর্ব্ব না, চাঁদা তুলব না, নিজের লেখা বইগুলির কিছু বিক্রী হবে আর সেই অর্থ চলে আসবে পুপুন্‌কীতে শালের মুড়া তুলতে। বল, এর বেশী আমি তোমাদের দেশের জন্য কি আর কত্তে পারি? তোমাদের প্রতীক্ষার শক্তি না থাকে ত' আমার সে শক্তি আছে। নানা অপমান, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও আমি আস্তে আস্তে কাজ চালিয়েই যাব। অভিমান ক'রে আমি কাজ ছেড়ে দেব না। স্থানীয় প্রতিকূলতা আজ আছে ব'লেই কালও যে থাকবে, এমন নাও হ'তে পারে। আর, অনন্তকালই যদি প্রতিকূলতা চলে, তাতে আমি ঘাবড়াব কেন? জীবনে আমি কখনো কোনো কাজেই সফল হই নি, তাই ব'লে কাজ ছেড়ে দেবার মতন হতাশাও আমার নেই। আমার উৎসাহ অনির্ব্বাণ, আমার যৌবন আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ অটুট থাকবে ব'লে আমি আশা করি।

মদের দোকানদার ও গণিকা

অপর একজন প্রশ্ন করিল,—সম্প্রতি আপনি অনেকগুলি গ্রামে যে ভাষণ দিয়েছেন, তার ফলে কিছু লোক মদ ছেড়েছে, কিছু দুশ্চরিত্র লোক গণিকাদের কাছে যাওয়া বন্ধ করেছে। এতে মদের দোকানদারদের আর গণিকাদের গ্রাহক কমে যাচ্ছে। এতে এরা অনেকেই আর্থিক ভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা নিয়েও আপনার বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে বিশেষ আন্দোলন চলেছে। কয়েক জন শয়তান লোক আপনার প্রাণহানি কর্ব্বার জন্যও চেষ্টিত হয়েছে। আপনি সাবধান হোন্।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—প্রাণহানি হবে ব'লে সাবধান হ'তে হবে? এতগুলি লোক মদ ছেড়েছে, অসতী নারীদের সংসর্গ ছেড়েছে, একথা শুনে আনন্দ কত্তে হবে না? আমি আমার ডাইরিতে দেখতে পাচ্ছি যে, শরীর আমার এবার খুবই পীড়িত থাকা সত্ত্বেও আমি মানভূমের সাতটী গ্রামে সাতদিন সাতটী বক্তৃতা দিয়েছি। বলেছি, মদ ছাড়, যে অর্থটা মদ্যে অপব্যয়িত হ'ত, তা' এনে তোমার শিশুপুত্রকে সুপথ্য সেবন করাও। বলেছি, কুসঙ্গ ছাড়, যে অর্থটা বেশ্যার পিছনে ব্যয় হ'ত, তা' এনে নিজের স্ত্রীকে খাওয়াও। এটা ত' অন্যায় নয়। মদের দোকানদার অন্য

জিনিষের ব্যবসায় করুক না! গণিকা তার ঘৃণ্য ব্যবসায় ত্যাগ ক'রে অন্য ব্যবসায়ে যেতে চেষ্টা করুক না! আস্তে আস্তে নানা স্থানের গণিকারা ও গণিকা-কন্যারা ভবিষ্যতের কথা ভেবে যেই সময়ে সবাই নূতন দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছে, সেই সময়ে এদেশের বিপথাশ্রয়িণী মায়েরা কেন চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বে, সব গণিকারা যদি মিলিত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, না খেয়ে মর্‌তে হ'লেও দেহ বিক্রয় ক'রে পয়সা রোজগার করা হবে না, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সমাজে চেতনা জাগ্রত হবে যে কি ক'রে এতগুলি মানবাত্মাকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসা যায়। যারা গাণিক্যের পথ নিয়েছে, তারা কেবল নিজের দোষেই বিপথে পড়ে নাই, তাদেরকে সমগ্র সমাজ ঠেলে ঠুলে ঐ নরককুণ্ডে ফেলে দিয়েছে, এই কথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার্য্য। আমি নিজে গণিকা মায়েদের ভিতরে গিয়ে এই কথাগুলি ব'লে আস্‌তে পাচ্ছি না, কারণ, আমার পূর্ব্ব-পরিকল্পিত আরও অনেক কাজ আছে। কিন্তু গণিকাদের যারা চেনে জানে, তারা একাজ কেন শুরু কর্ব্বে না? দিনের পর দিন দেশের হাওয়া বদলে যাচ্ছে। আজ যে অভ্যুদয় গণিকারা অসম্ভব মনে করে, কাল সে অভ্যুদয় তাদের সহজেই হ'তে পার্ব্বে। যারা পারে, যারা যোগ্য, যাদের নিরাপদ সুযোগ আছে, তারা গণিকা মায়েদের কাছে এই বার্ত্তা দ্রুত পৌঁছে দিক্।

পুপুন্‌কী আশ্রম
২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৪২
(৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

স্থানীয় কর্ম্মীর আবশ্যকতা

কালাপাথর গ্রাম হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীবিষ্ণুচরণ মাহাতো একটী করিয়া ফুলকপি, ২/৩টী গাজর, একটী করিয়া ওলকপি ও শালগম নিয়া আসিয়াছেন, আশ্রমকে উপঢৌকন দিতে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চমৎকার ত' জন্মেছে! তোমাদের নিজ নিজ বাগানের ত'? বীজ কোথায় পেলে?

উভয়েই সানন্দে স্বীকার করিলেন যে, পুপুন্‌কী আশ্রম হইতে যে বীজ দেড় দুই মাস আগে দেওয়া হইয়াছিল বিনামূল্যে এবং শুধু কৃষির উন্নতি-বিধানের আশায়, সেই বীজ হইতে এই সব উৎকৃষ্ট সব্জীর উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—পুপুন্‌কী, কামনাগড়া, জোল্‌হাডি, গোমদিডি, চিকশিয়া, বদড়ো, আদমডি, কুমড়ি, দ্বারিকা আদি দশ বারোটী গ্রামেই আমি প্রতি বৎসর ফুলকপি, বীট, গাজর, ওলকপি, মূলা, পালং প্রভৃতির বীজ বর্ষা একটু কমলেই ত' নিয়ম ক'রে বিনামূল্যে বিতরণ করি। আর বর্ষা আসবার ঠিক্ সময়ে লাউ, কুমড়া,

ঝিঙ্গা, শশা, দুন্দুল, ডাঁটা, চিচিঙ্গা, উচ্ছে, করলা, সীম, বরবটি, প্রভৃতি বারো চৌদ্দ রকমের তরিতরকারীর বীজ অকৃপণ হাতে ঘরে ঘরে গিয়ে দান ক'রে আসি। কিন্তু কেউ কিছু উৎপাদন কর্ল্ল কিনা, জানতেও পারি না। নিজেদের উন্নতিতে নিজেদের এত আলস্য ত' অভাবনীয় ব্যাপার। তোমাদের নিজেদেরই কর্ম্মীরূপ পরিগ্রহণ ক'রে তোমাদের দেশী ভাইদের মধ্যে কাজ করা উচিত।

পূর্ণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—নিজেদের উন্নতিতে নিজেদের আলস্যের চেয়েও বড় কথা এই যে, চোরের উৎপাতে আর গরুর উৎপাতে কেউ নিজেদের ফসল রক্ষা কত্তে পারে না।

বিষ্ণুচরণ বলিল,—পরস্পর পরস্পরের ফসল নষ্ট ক'রে দেয় বাবামণি। আমার ফসল হ'তে গেলে আমার প্রতিবেশী এসে গোপনে আমার ফসল খারাপ ক'রে দিয়ে যাবে। ফলে ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষে আমিও জরজর হব এবং সুযোগ পেলেই আমিও অতি গোপনে তার ফসল উজাড় ক'রে দেব। এই জিনিষটাই এই দেশের সর্ব্বপ্রকার কৃষির উন্নতির অবধারিত শত্রু।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চেষ্টা কত্তে হবে, যাতে মানুষের প্রতি মানুষের ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ ক'মে যায়। তারই ত' নাম সভ্যতা। অনেক ধনের অধিকারী হ'য়েও কেবল মানুষের অনিষ্ট সাধন ক'রে বেড়ালাম, এর নাম সভ্যতা নয়। একে অন্যকে সাহায্য করলাম, তার নামই ত' সভ্যতা।

শ্রীযুক্ত পূর্ণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—আপনি যদি বাবামণি কৃপা ক'রে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সবাইকে এই কথাটা বুঝিয়ে দেন, তবে যদি মানুষ জাগে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি ত' সারা বৎসরই এই মানভূমে ব'সে থাকি না। আমাকে নানা দেশে নানা জেলায় ঘুরে বেড়াতে হয়। যখন পুপুন্‌কী আশ্রমে ফিরে আসি, তখন জ্যান্ত মানুষটা আসে না, আসে বল্‌তে গেলে একটা মৃতদেহ। এই দেহটার যেই সময়ে পুনরুজ্জীবিত হবার জন্য প্রয়োজন একটু বিশ্রামের, ঠিক সেই সময়েই মানভূমের কড়া রৌদ্রে আর কড়া শীতে আমাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়। কাজ ত' আমি ক'রেই যাচ্ছি, কিন্তু এদের বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে যে, আমি বিদেশী, আমি পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এসেছি। সুতরাং আমার সেবা-প্রয়াসের ভিতরে নিশ্চয় কুমতলব আছে। তোমাদের দেশী লোকেরা যদি নিজ নিজ গ্রামের সন্নিহিত অঞ্চলগুলি ঘুরে ঘুরে আমার কথার প্রতিধ্বনি শুনাতে পারে, তাহ'লে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হবেই হবে। আমি কৃষিবীজ বিতরণ করি, গ্রমবাসীরা ব্যাখ্যা শোনে এবং সেই অপব্যাখ্যা আবার বিশ্বাসও করে যে এখন বিনামুল্যে বীজ দিয়ে দিয়ে পরে আমি লোকের বাড়ী গিয়ে বিনামুল্যে ফসল তুলে নিয়ে আস্‌ব। এরকম আশ্চর্য্য ব্যাপার চলতে থাক্‌লে আমি কাজ করি কি ভাবে বল না বাপু। শ্রমে আমার অরুচিও নেই, কৃপণতাও নেই, কিন্তু আমি ত' একটা

রক্তমাংসের মানুষ, কতখানি শ্রম এবং একই বিষয় নিয়ে কতবার শ্রম আমি কত্তে পারি বল! যে-কোনো কাজ হাতে নিয়েই আমি ভাবি বিফল ত' আমি হবই, কিন্তু সফলতা লাভের পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি রাখ্ব কেন? ফলে আমার দেহরথের ঘোড়াকে সাধ্যের অতিরিক্ত বেগে ধাবমান হবার জন্য ক'ষে চাবুক মারি, দেহটার প্রতি একবিন্দু দয়া আমি করি না। এই জন্যই, সব দেশে কাজ কত্তে গেলেই স্থানীয় কর্ম্মীর আবশ্যকতা খুব বেশী। আমার আশ্রমে যে ব্রহ্মচারীরা তোমাদের সেবার জন্য মোতায়েন আছে, তারা এক এক জনে এসেছে ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলা থেকে। তোমাদের মানভূম জেলা থেকে কর্ম্মী আস্‌ছে না কেন? আমি ত' আমার একটী কর্ম্মীকে পোষণের জন্যও তোমাদের জেলা থেকে একটী কপর্দ্দক কখনো উপার্জ্জন করি না। স্বরচিত-গ্রন্থ আমার একমাত্র বিক্রেয়, তা' ত' এদেশের পড়ুয়ারা বিনা পয়সায় নেয়। যারা পয়সা দেবে ব'লে নিয়ে যায়, তাদের কাছেও টাকার আর তাগাদা নেই ব'লে কেউ টাকা আর শেষ পর্য্যন্ত দেয়ই না। সিলেট, ঢাকা, পাবনা, যশোর, ত্রিপুরা, নোয়াখালীর কেউ ওষধ নিলে কখনো কখনো টাকা পাঠায় কিন্তু এই জেলায় কারো কাছে ঔষধের টাকা নেওয়া হয় না। তবু তোমাদের জেলা থেকে কর্ম্মী পাচ্ছি না কেন? আমার ধারণা এই যে, তোমরা নিজেদিগকে ভারতবাসী ব'লে ভাবতে পাচ্ছ না।

আমরা যখন দেশ ছেড়ে এসেছি, তখন নিজেদিগকে শুধু বাঙ্গালী ব'লে মনে ক'রে তুষ্টি পাইনি, আমরা নিজেদিগকে ভারতবাসী ব'লে জ্ঞান করছি। বাংলা আর বিহার ত' দুটা সাময়িক সীমারেখার ব্যাপার মাত্র। ভারতবর্ষ সাময়িক নয়, ভারতবর্ষ একটা শাশ্বত সত্য। রাজর্ষি অশোক বিহারের নয়, তিনি শাশ্বত, ভারতের অবিস্মরণীয় প্রতিমূর্ত্তি। শ্রীগৌরাঙ্গ বাংলার নয়, তিনি শাশ্বত ভারতের অবিস্মরণীয় প্রেমের জাগ্রত প্রতিমা। বন্দেমাতরম শুধু বাংলার বন্দনা নয়, সমগ্র ভারতের বন্দনা। আজ একথা না বুঝতে পার, ভবিষ্যতে নিশ্চিতই তোমাদের একথা স্বীকার কত্তে হবে।

বর্দ্ধমান

১৪ই চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৪২

(২৭ মার্চ, ১৯৩৬)

চিত্র-প্রদর্শনী

ইতিমধ্যে পুপুন্‌কী আশ্রমে পূর্ণ তিন মাস ব্যাপিয়া প্রস্তুতি-পর্ব্ব চলিয়াছে একটী চিত্র-প্রদর্শনী তৈরী করিবার কাজের। ত্রিপুরা জেলান্তর্গত রহিমপুর-নিবাসী চিত্রশিল্পী শ্রীগিরিশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে এবং তাঁহার সুদক্ষ সহযোগী ও জামাতা শ্রীঅন্নদা চরণ চক্রবর্ত্তীকে পাঁচকিত্তা হইতে পুপুন্‌কী আনা হইয়াছে চিত্র-সমূহ নির্ম্মাণের জন্য। তিনশত বড় বড় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় তাহার বিবরণী রক্ষিত হয় নাই।

একখানার নমুনা দিলেই ব্যাপারটা বোধগম্য হইবে। যথা,— মা শিশুকে কোলে নিয়া বসিয়াছেন আর ভাবিতেছেন। নীচে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখা আছে—

"শিশুরে লইয়া কোলে যে চিন্তা করিবে,
এই শিশু জগতেরে সেই বস্তু দিবে।"

চিত্র-প্রদর্শনী দেখিবার জন্য ধারাবাহিক সাত দিন ধরিয়া পুপুন্কী আশ্রমে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ হইয়াছে এবং তৈরী-করা সরণীর উভয় পার্শ্বে চিত্র-সমূহ স্কন্ধ-সম উচ্চতায় স্থাপিত রহিয়াছে। আট দশটী সরণীর প্রত্যেকটিতে দুই তিন জন করিয়া ব্যাখ্যাকর্ত্তা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শ্রোতাদিগকে প্রতিটি চিত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছেন। এই প্রদর্শনী পরে পূর্ব্ববঙ্গেও নানা স্থানে যাইবে, বলিয়া একটী কল্পনা রহিয়াছে। উৎসব গিয়াছে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, রবিবার পূর্ণিমা দিন।

এই তিন মাসের মধ্যে শ্রীশ্রীবাবামণি ঝড়ের বেগে ছুটিয়া কলিকাতা, চাঁদপুর, রহিমপুর, মোচাগড়া, নবীপুর, নগরপাড়, কুমিল্লা ঘুরিয়া আসিয়াছেন।

গুরু-দর্শন

অদ্য অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি বর্দ্ধমান পৌঁছিয়াছেন। অবস্থান হইতেছে মিঠাপুকুর লেনে শ্রীখগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে।

মিঠাপুকুর লেনেই এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন কলিকাতা মোহন লাল ষ্ট্রীটের শ্রীমতী রত্নাবলী দেবী। ইনি রংপুরের রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং রংপুরেই শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণে দীক্ষিতা। ইনি গদ্‌গদ কণ্ঠে আনন্দ সহকারে বলিতে লাগিলেন,— গুরুদর্শনে সহস্র কোটি তীর্থ-দর্শনের ফল হয়। আজ আমার সেই দর্শনই হ'ল। জানেন বাবামণি, আমি কাউকে কদাচ বলি না কিন্তু আপনার কথা মনে হ'লে আমার সমগ্র দেহমনঃপ্রাণ পুলকে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। আমার মনে হয়, যেন একটী নিমেষের মধ্যে শূণ্যতা থেকে পূর্ণতায় উপনীত হলাম।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—গুরুর সম্পর্কে এই ভাবটা ত' খুবই ভাল মা, খুবই ভাল। কিন্তু কাউকে বল্‌তে নেই। ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে যেমন তার খবর বাইরের লোককে জানতে দিতে নেই, এই ব্যাপারটাও সেই রকম।

হিরন্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

গদ্‌গদকণ্ঠে রত্নাবলী দেবী বলিতে লাগিলেন,—নিজের কথা আর বল্‌ব কি, আমি ত' আমার ছোট বোন্ হিরণ্ময়ীর তুলনায় অতি তুচ্ছ। আপনার কথা স্মরণ হ'লে ওর যেন সমগ্র অস্তিত্বটাই আর এক জগতের হ'য়ে যায়। প্রথম প্রথম এই ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু একদিন মা

বল্লেন, দেখ্, এসব গভীর তত্ত্ব তোরা বুঝবিনে। গুরুর দেওয়া নামে ডুবে যা, তবে যদি কিছু বুঝিস্। তারপরে একদিন বাবা বল্লেন, ভাগ্যে আমার ছোট ছেলে সুহৃদের শক্ত অসুখ হয়েছিল, তাই না আমরা বাবামণির দর্শন পেলাম। এই মূর্ত্তিটি মনে মনে একবার ভাবলেই কাজ হ'য়ে যায়, অন্য সাধন-ভজনের দরকারই নেই। রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার বাবা। তাঁর মতন বুদ্ধিজীবী মানুষ বিনা যুক্তিতে শুধু ভাবের আতিশয্যে কথা বলতে পারেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এসবও বাইরে ব্যক্ত কত্তে নেই। ভক্ত কবি না গান লিখেছেন,—

গোপনে হৃদয়ে রাখ
আদরিণী শ্যামা মাকে,
ও মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ না দেখে।

খগেনদার সহধর্ম্মিণী পারুলদি আসিয়া বলিলেন,—বাবামণি এখন পথশ্রমে ক্লান্ত। তাঁকে বিশ্রাম কত্তে দিন।

হরিওঁ ও ওঙ্কার

সন্ধ্যার সময়ে স্বল্পকাল হরিওঁ কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হরিওঁ কথার মানে কি? ওঙ্কারই বা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হরি মানে সব-কিছুর আহরণকারী, অর্থাৎ যাঁর ভিতরে সব কিছু আছে, ছিল এবং থাকবে। সেই যে পরম সত্তা, তিনি "ওম্" অর্থাৎ "হাঁ", মানে আছেন। তিনি যে আছেন, এইটী একটী পরমতম সত্য এবং এই সত্যে আমাদের নিষ্ঠা অর্পণ কত্তে হবে। হরি মানে পরমেশ্বর, মানে সর্ব্বদেবতা, সর্ব্বউপাস্য বা সর্ব্ব আরাধ্যকে নিজের ভিতরে আত্মসাৎ ক'রে যিনি আছেন, সেই পরম-মহেশ্বর। হরি মানে এখানে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু নন, ঐ বিষ্ণুও যাঁর আরাধনা করেন, তিনিই হরি। ব্রহ্মা যাঁর নামে সাধন করেন, যোগীশ্বর মহাদেব যাঁর ধ্যান নিরন্তর করেন, ইন্দ্র-বরুণ-চন্দ্র-যমাদি যাঁর আরাধনায় নিমগ্ন হ'য়ে দেবত্ব পেলেন, হরি বলতে তাঁকেই বুঝা যায়। সেই হরি হচ্ছেন ওম্ অর্থাৎ সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়, সর্ব্বতত্ত্বের সমুচ্চয়, সর্ব্বভাবের সমাহার, সর্ব্বমতের সম্মেলন, সর্ব্বপথের পরম লক্ষ্য। হরিওঁ ব'লে কীর্ত্তন করার মানে হচ্ছে, সকলের সকল উপাস্যই সকলের পক্ষে সমান সত্য, এই বিশ্বাসকে মর্য্যাদা দান ক'রেও নিজে সর্ব্বদেবমহেশ্বরকে একান্ত ভাবে নিজ জীবন সমর্পণ করা। ওম্ আবাহক মন্ত্র, ওম্ ধারক মন্ত্র, ওম্ সমর্পণেরও মন্ত্র। ওম্ ব'লে তাঁকে ডাক্‌ছি=হরিওঁ। ওম্ ব'লে তাঁকে ধরে রাখছি=হরিওঁ। ওম্ ব'লে তাঁতে সম্যক্ আত্মসমর্পণ করছি=হরিওঁ। ওম্ আবরক মন্ত্র, অর্থাৎ ওঙ্কার নিজ ধ্বনি-গহ্বরে সর্ব্বমন্ত্রকে গর্ভে রক্ষাবৎ রক্ষা কচ্ছেন।

ওম্ ভেদক মন্ত্র, অর্থাৎ ওম্ এই মন্ত্র বাইরে থেকে অন্য যে কোনও মন্ত্রের গুহ্যতিগুহ্য অন্তর্দেশে প্রবেশ করেন এবং ভিতরের মন্ত্র-চৈতন্যের সঙ্গে নিজ অভেদত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মানে, সব মন্ত্রই অবিরাম অবিশ্রাম জপ কত্তে কত্তে শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র ওঙ্কারেই পরিণত হয়। এই কারণেই ওঙ্কার-জাপক অন্য কোনও মন্ত্রের জাপককে ভ্রান্ত বা বিপথগামী ব'লে জ্ঞান কত্তে পারে না। ওঙ্কার প্রেমময় পরম মন্ত্র, তুমি ইচ্ছা ক'রে জপ না করলেও তা' আপনা আপনি সব মন্ত্রের হৃদদেশে আপনা আপনি জপিত হ'তে থাকেন। ওঙ্কার স্বতঃসিদ্ধ মন্ত্র ব'লেই এই মন্ত্র তোমার শ্বাসে-প্রশ্বাসে, তোমার হৃৎস্পন্দনে, তোমার দেহের প্রতিটি জীবকোষে, প্রতিটি রক্তকণিকায় প্রতিটি অণুপরমাণুতে জপিত হচ্ছেন। এই মন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই এই মন্ত্রের কোনো ঋষি নেই, এই মন্ত্রকে পেয়েই প্রত্যেকে ঋষিপদবাচ্য হয়েছেন। বেদশাস্ত্র বা বেদমন্ত্র আবির্ভূত হবার ঢের ঢের আগে এই ওঙ্কার তপস্বীদের বোধগম্য হয়েছিলেন, এই জন্যই ওঙ্কার-ধ্বনিকে বেদ-জনক বা বেদজননী বলা যেতে পারে।

স্থাপিত প্রণবের আকৃতি বা হরফ

এই সময়ে স্থানীয় হরিসভার পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া আলোচনায় যোগদান করিলেন। তিনি ওঙ্কার-বিগ্রহ সম্পর্কে

জানিতে চাহিলেন বলিলেন,—বিগ্রহ কি ওঁ হবে, না ঔং অথবা ওঁ হবে না, ওম্ হবে? অথবা ওং হবে? অউম্ও ত' হ'তে পারে। কোনটা হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিগ্রহ বাংলা হরফে ওঁ হওয়াই উচিত, কারণ, অন্য সবগুলি বর্ণবিন্যাসেরই উচ্চারণ এক। প্রণবের প্রকৃত উচ্চারণ ঠোঁট দিয়ে বা জিহ্বা দিয়ে করা সম্ভব নয়। ওঁ, ঔং, ওঁ, অউম, ওম্, ওং প্রভৃতি প্রত্যেকটি বর্ণবিন্যাসই ঠিক একই অনির্ব্বচনীয় ধ্বনির nearest approximation বা কাছাকাছি ধ্বনিমাত্র। বারংবার জপ কত্তে কত্তে তবে বহু ভাগ্যফলে প্রকৃত প্রণবের উচ্চারণ উপলব্ধিতে এসে থাকে। সেই যে প্রকৃত প্রণব, যা' হচ্ছে জগতের সকল ধ্বনির প্রাণবিন্দু, তাকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই হচ্ছে আক্ষরিক বিগ্রহ স্থাপনের আয়োজন। একজন ইংরাজ বলতে পারে, এটা ওঁ না হয়ে Aum বা Om বা Aung, বা Ong হোক্ না। হ'লে ক্ষতি নেই। কিন্তু ইংরাজি না-জানা লোক সেখানে বসলে তার পক্ষে ওটা প্রণবধ্বনির স্মারক হবে না। একজন যদি ওড়িয়া হরফে প্রণব লিখে নেয়, আর একজন যদি তেলেগু হরফে প্রণব লেখে, তৃতীয় একজন যদি তামিল হরফে প্রণব স্থাপন করে, চতুর্থ একজন যদি কন্নাড় হরফে, পঞ্চম একজন যদি মালয়ালাম হরফে এবং ষষ্ঠ একজন উর্দ্দু হরফে প্রণবের কাছাকাছি ধ্বনির স্মারক অক্ষরটি বা অক্ষরগুলি লিখে

স্থাপন করে, তবে সেই সেই ভাষাভাষীর পক্ষে ত' সুবিধারও কথা, গৌরবেরও কথা কিন্তু সর্ব্বজনীন কোনো সমাবেশে পূজাবেদীতে প্রণব-স্মারক কিছু রাখ্‌তে হ'লে, বঙ্গদেশে প্রচলিত ওঁ বা হিন্দীভাষীদের দেশে প্রচলিত বা তার কাছাকাছি রূপটী অর্থাৎ ঔং হ'তে পারে। এ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ার ঝঞ্ঝা কখনো আসবে ব'লে আমার মনে হয় না। তবে, ভবিষ্যতের কথা কিছু বল্‌তে পারি না। নানা কারণে মানুষের মনে প্রাদেশিক চেতনা এত তীব্র ভাবে জাগতে শুরু করেছে যে, ভবিতব্যে কি আছে, তা' এখন অনুমান করা ভার।

কে আবার ওঙ্কার-মন্ত্রে সাধনা করিবে

এক কথায় আরও দশ কথা আসিয়া পড়িল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বহু কালের পুরাতন দেশ ভারতবর্ষ। বহু যুগের বহু সাধনা পুঞ্জীকৃত হ'য়ে জমে আছে এই দেশের ধূলিকণাগুলির মধ্যে। বিরোধের মধ্য দিয়ে যাদের মুখচন্দ্রিকা হয়েছিল, মিলনের মধ্য দিয়ে তাদের ক্রমাগত একীকরণের চেষ্টা চলেছে এই সহিষ্ণুতার খনিটার মধ্যে। বহু ভাষা পরস্পরের সাথে মিলে নূতন নূতন ভাষাকে নূতন নূতন সাহিত্যকে জন্ম দিয়েছে। কিন্তু যেখানে যেখানে ভাষার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, অনেক সময়ে উচ্চারণের বিভিন্নতা সেখানে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে। ওড়িয়ারা যদি কৃষ্ণ বল্‌তে

অবশ্যম্ভাবী রূপে ক্রুষ্ণ না বল্‌তে, যদি ঋষি বলতে রুষি উচ্চারণ না কর্ত্তেন, কৃপা বল্‌তে ক্রুপা না বলতেন, ধ্রুবং লিখে যদি ধ্রুতং না উচ্চারণ কত্তেন, তাহ'লে একজন বাঙ্গালীর পক্ষে উৎকলবাসীর ভাষা কত যে সহজবোধ্য হ'ত আর ওড়িয়া শ্রোতা বাংলা যে কত সহজে বুঝতেন, তা' বল্‌বার নয়। আসামের ভাষা আর বঙ্গদেশের ভাষা এত সাদৃশ্যপূর্ণ যে, অসমিয়ারা যদি স কে হ উচ্চারণ না কত্তেন, আর বাঙ্গালীরা যদি ব বর্ণটিকে একটু পরিবর্ত্তন ক'রে উচ্চারণ করেন, তাহ'লে পরস্পরের পক্ষে পরস্পরের সাধারণ ভাষা বুঝতে কষ্ট খুবই কমে যেতে পারত। হিন্দীতে ব ওয় স শ ষ প্রভৃতির উচ্চারণের সঙ্গে বাঙ্গালীর উচ্চারণের বৈষম্য উভয়তই অসুবিধা উৎপাদন ক'রে থাকে। খুব সম্ভবতঃ দেশের ভাষা-বিজ্ঞানীরা উপযুক্ত সময়ে এসব পার্থক্যের অবলোপের জন্য যোগ্য উপায় আবিষ্কার করার চেষ্টা কর্ব্বেন। কারণ, এটা করা আবশ্যক। কিন্তু প্রাদেশিকতা-প্রীতি অত্যুগ্র হ'লে এই জাতীয় চেষ্টা যাত্রা শুরুর আগেই অবরুদ্ধ হবে। তাই, প্রণব-বিগ্রহ কোন্ দেশে কোন্ ভাষায় নিজস্ব হরফে হবে, তা' নিয়ে এখনি একটা ফতোয়া দিয়ে রাখতে পারি না।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—কজনেই বা প্রণব-মন্ত্রকে আলম্বনরূপে গ্রহণ ক'রে সাধন ভজন কর্ব্বে! আমরা ব্রাহ্মণরাই অধিকাংশে প্রণব জপ করি না, কেউ করি শক্তিমন্ত্র,

কেউ করি বিষ্ণুমন্ত্র, কেউ করি কৃষ্ণমন্ত্র, কেউ করি শিবমন্ত্র জপ। ব্যাপক ভাবে ওঙ্কার-মন্ত্র জপ ক'রে সাধন লক্ষ লক্ষ লোকে কর্ব্বে ব'লে মনে করা যায় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনারা অর্থাৎ শাস্ত্রাভিমানী ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা শতকরা প্রায় নিরানব্বই জনই সকলের প্রণব-জপের বিরোধী। শুধু বিরোধী নন, শতকরা দশজন ব্রাহ্মণও প্রণবমন্ত্রে ঈশ্বর-সাধনা করেন কিনা সন্দেহ-স্থল। জপ করেন তাঁরা অন্যান্য খণ্ড মন্ত্র। যার যাতে মন, সে তাই জপ কর্ব্বে, এটাতে কারো আপত্তি না করাই উচিত। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের প্রণবমন্ত্র-জপে দল বেঁধে সকল পণ্ডিতেরা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও আপনা আপনি প্রণব-মন্ত্র মানুষের মনে নিজের জন্য স্থান ক'রে নিচ্ছেন। এ অবস্থাটা আমাদের প্রচারণার ফলে হয় নি। কারণ, আমার কথা যদি বলতে যান, তবে বল্‌ব, আমি কদাচ ধর্ম্ম, সাধনা, মন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে সভাস্থলে বক্তৃতা দেই না। বক্তৃতাকালে আমি কেবল ব্রহ্মচর্য্য-পালনের আবশ্যকতার কথাই বলি। অন্য কথাকে অবান্তর বা নিষ্প্রয়োজনীয় জ্ঞান করি। আমি আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণের জন্য একটী প্রাণীকেও আকর্ষণ করি না। তবু আপনা আপনি দীক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। দীক্ষাদানকালে আমি একমাত্র প্রণব-মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র দিতে আগ্রহ বোধ করি না। আপনা আপনি যিনি নিজ মহিমায় প্রচারিত হ'তে পারেন, তাঁকে প্রচারের জন্য আমাদের বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নেই।

রামমোহন রায়

কথাপ্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের কথাও উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আধুনিক কালে সমগ্র জাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে গতানুগতিকতা পরিহার করার দিকে যিনি দিলেন সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তনা, আমার মতে তিনি রাজা রামমোহন। তিনি গরীব ছিলেন না, তাই গরীবদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ তাঁর হয় নি। তিনি অশিক্ষিত ছিলেন না, তাই অজ্ঞান মূর্খ অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে নিজেকে পরিচিত করার সুযোগ তাঁর হয় নি। তিনি পল্লীগ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন না, সুতরাং সাধারণ গ্রামবাসীরা তাঁর সংসর্গে আসতে পারে নি। তিনি দারত্যাগী পরিব্রাজক পদ-পথচারী সন্ন্যাসী ছিলেন না, অতএব বন-প্রান্তের, অরণ্য প্রান্তরের, মরুভূমির কুক্ষিগত দরিদ্র পল্লীর হাঁড়ি, ডোম, মুচির সাথে মিশবার সুযোগ পান নি। তাই তিনি তাঁর মুক্তার মত স্বচ্ছসুন্দর মুক্ত চিন্তাগুলি সাধারণ লোকদের মধ্যে বিতরণ কত্তে পারেন নি। তিনি ধনীর সমাজে, বিদ্বানদের সমাজে, শহরবাসী সম্ভ্রান্ত লোকদের সমাজে নিজ জীবনের উপলব্ধ সত্যকে বিতরণ করেছিলেন এবং একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, এসব লোকেরা অন্যের কথা এক কথায় মেনে নেয় না, তর্ক করে, যুক্তির পর যুক্তি দিয়ে প্রতিহত করে। গুরুনানক সেই ভুলটী করেন নি। তিনি পল্লীবাসী দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে উপদেশ বিতরণ করেছেন,

কেউ হয়ত গ্রহণ করে নি, কেউ হয়ত আবার প্রাণমন দিয়েই গ্রহণ করেছে। যে গ্রহণ করেছে, সে মনে প্রাণে তার অনুসরণও করেছে। রামমোহনের প্রথম কথাই ত' এই যে, হিন্দুদের মধ্যে যারা শাস্ত্রজ্ঞ ব'লে নিজেদের মনে করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল উৎসকে মানেন না, তার নির্দ্দেশ পালন করেন না। তাঁদের শাসনে সাধারণ লোক দেখেন নি বেদ, পড়েন নি উপনিষদ। পণ্ডিত ও পণ্ডিতম্মন্য লোকেরা রামমোহনের উক্তির প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু এই সব বাদ প্রতিবাদের ঢেউ পাড়াগায়ে পৌঁছে নি। কারণ, পৌঁছুবার মতন বিরাট ঘটনা কিছু ঘটে নি।

সাধারণ লোকেরা বুদ্ধিহীন নহে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—রামমোহন হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জীবনে একটী কটূক্তিও কখনো করেন নি। ধর্ম্মের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে যে সকল কুসংস্কার ধর্ম্ম নামে পরিচিত হ'য়ে মানুষের স্বাধীন চিন্তার সিংহদ্বারকে অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে তিনি লড়েছেন। খ্রীষ্টান বা মুসলমানরা ধর্ম্মের নামে যদি কিছু অযৌক্তিক কাজ ক'রে থাকে, তবে তারও প্রশ্রয় তিনি দেন নি। খ্রীষ্টান মিশনারি ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মের গ্লানি প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁর মতন প্রবল সংগ্রাম এর আগে আর কেউ করেছেন ব'লে ইতিহাস সাক্ষ্য

দিতে পার্ব্বে না। কিন্তু তাঁর কথা এবং লেখা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে নি। যদি ঐ সকল কথা সাধারণের কাছে পৌঁছাবার কোনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুব্যবস্থা থাকত, তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম যে, রামমোহনের কঠিন কঠিন তত্ত্বকথাগুলিও অনেক সাধারণ লোকই বুঝতে পারে। জনসাধারণকে এত হেয় জ্ঞান করা উচিত নয় যে, বড় বড় কথা হ'লেই তারা বুঝতে অক্ষম নিশ্চয়ই হবে। তারা প্রতিজনে বুদ্ধির ঐরাবত না হ'তে পারে, বুদ্ধির ঘোটক বা বুদ্ধির গাধা, তাদের মধ্যে অনেকেই আছে। অতি অল্প হ'লেও বড় বড় কথা তারা বুঝতে পারে। মহম্মদের একেশ্বরবাদের তত্ত্ব অশিক্ষিত মুসলমানেরা বুঝতে পারল কি ক'রে? সাধারণ লোকের বুদ্ধিশক্তিতে বিশ্বাস ক'রে তাদের কাছে একেশ্বরতত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছিল ব'লেই তারা তা বুঝতে সমর্থ হয়েছে। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ কি সাধারণ একটা দর্শনিক তত্ত্ব? এই বাদ অতি সাধারণ গ্রাম্য লোকদের মধ্যে বিস্তারিত হ'ল কি ক'রে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকদের অবজ্ঞা না ক'রে ছুটে গেলেন তাদের মধ্যে প্রেম বিলাতে, তার ফলে অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্বের কচ্‌কচি উপেক্ষা ক'রে সর্ব্বসাধারণ পণ্ডিত-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের অনুশীলনে লেগে গেল। আচার্য্য শঙ্কর সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মবাদ "অহং ব্রহ্মাস্মি" নিয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দিগ্বিজয় ক'রে বেড়ালেন, ফলে একেশ্বর-ব্রহ্মবাদ নিতান্ত অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণে

স্থান ক'রে নিল। এই সকল তত্ত্ববোধ স্থায়ী হ'য়ে রইল না এই কারণে যে, এক মহাপ্রভুর পরে আর এক মহাপ্রভু, তাঁর পরে আরো এক মহাপ্রভু ঐ ভাবে হরিনামে মত্ত হ'য়ে প্রেমের লীলা প্রকট কত্তে কত্তে সারা দেশ পরিক্রমণ করেন নি। শঙ্করের ব্রহ্মবাদ এমন ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেয়েও অনড় হ'য়ে জাতির মধ্যে গেঁথে বসে রইল না এই জন্য যে, এক শঙ্করের পর আর এক শঙ্কর কাশ্মীর থেকে কামরূপ, বদরিকা থেকে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত এক ব্রহ্মবাদ নিয়ে পরিব্রজ্যা ক'রে বেড়ালেন না। মনে করা ভুল যে, সাধারণ লোকেরা অসাধারণ কথা বোঝে না। তারা বোঝে, তবে কাউকে তাদের কাছে গিয়ে তা বুঝিয়ে দিতে হয়। রামমোহনের বার্ত্তা জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে কেউ করেছিল কি? কিছু পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্ম-সমাজ রূপে যে প্রচারক-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হ'ল, তাঁরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বা আচার্য্য শঙ্করের আবেগ, আকুলতা, বৈরাগ্য ও অনাসক্তি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আসমুদ্র হিমাচলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন কি? শিক্ষিত সমাজই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, অশিক্ষিতেরা নয়।

বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিদ্যাসাগর ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন না, তবু এই প্রসঙ্গে তাঁর নামটা এসে যায়। তিনি ছিলেন

দীন-দরিদ্র-অত্যাচারিত-নির্য্যাতিতের প্রাণের বন্ধু। নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে তিনি দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করেছেন। সুতরাং তাঁর বিষয়ে অন্য লোকে প্রচার না কর্ল্লেও দুঃখীরাই সর্ব্বত্র তাঁর মহিমা ও মর্ম্মকথা প্রচার করেছে। কীর্ত্তিলাভে অনাগ্রহী ব্যক্তির শাশ্বত কীর্ত্তি অর্জ্জনের এই ইতিহাসটী একেবারে অনন্য-সাধারণ। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথাও এসে যায়। তিনি আমেরিকাতে গিয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন কচ্ছেন দেখে ব্রাহ্ম-প্রচারকেরাই তাঁকে বিদেশী মানুষদের চোখে হেয় করার জন্য চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টার বিপরীত ফল হ'ল ওখানে ব্রাহ্মদের কাজ কর্ম্মের ফলে বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি এমন এক প্রচণ্ড বিকাশ প্রদর্শন কর্ল্ল যে, জগৎ স্তম্ভিত হ'ল আর ভারতবাসী আমরা তাঁকে আমাদের দেশের দিগ্বিজয়ী বীর-রূপে পূজা করার জন্য ব্যাকুল হলাম। যাদের কর্ত্তব্য ছিল রামমোহনের বক্তব্যগুলি বিদেশে প্রচার এবং স্বদেশে অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করা, তাঁরা কণ্ঠযোগে লেখনীযোগে বিবেকানন্দ বধ-কাব্য রচনা কত্তে গিয়ে তাঁর চণ্ডকেশরী-মূর্ত্তি দর্শন ক'রে মূর্চ্ছিত হ'লেন। রামমোহনের এটা পরম দুর্ভাগ্য যে, তাঁর পদচ্ছায়াসেবীরা প্রকারান্তরে রামমোহনকেই নিধন কর্ল্লেন। এগুলি বড়ই বেদনাদায়ক কথা।

ব্রাহ্ম-সমাজের দান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকেরা

দেশবাসীর অনেক কুসংস্কার দূর কত্তে অশেষ শ্রম স্বীকার করেছেন। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্বাদেশিকতা, স্বাবলম্বন-প্রিয়তা, সৎসাহস, ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি নানা ব্যাপারে এদেশের নবজাগরণে তাঁরাই হ'লেন অগ্রদূত বা পন্থা-প্রদর্শক। কিন্তু তাঁরা রামমোহনের বার্ত্তা নিয়ে কুটীরে কুটীরে যান নাই। এই জন্যই রামমোহনের অবদান সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু জানি না, কেবল অস্পষ্ট একটা সংস্কার-স্মৃতিতে বহন ক'রে বেড়াই যে, রামমোহন রায় ছিলেন একটা কালাপাহাড়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, রাজা রামমোহনই নবভারত-গগনের প্রথম সূর্য্য, যাঁর কিরণচ্ছটার প্রভাব ভাবী ভারতের জীবনের উপরে কখনো ব্যর্থ হবে না। দ্বিতীয় সূর্য্য বিবেকানন্দ, যাঁর বিচ্ছুরিত কিরণরাশি নানা বর্ণে, নানা বৈচিত্র্যে জাতির ইতিহাসে করেছে রূপ-পরিগ্রহ এবং কর্ব্বে অনন্ত কাল ধ'রে। ভোগসর্ব্বস্ব আমরা তার মূল্য না বুঝতে পারি, কিন্তু অবহেলিত হ'লেও স্বর্ণখণ্ড স্বর্ণই থাকে, পিতল হ'য়ে যায় না।

বর্দ্ধমান

১৫ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৪২

(২৭শে মার্চ্চ, ১৯৩৬)

প্রণবের উচ্চারণ

প্রশ্ন হইল,—প্রণবের প্রকৃত উচ্চারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রণবের প্রকৃত উচ্চারণ জিহ্বা,

ওষ্ঠ ও শরীরের অন্য কোনও অঙ্গ দ্বারা প্রকাশ সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন,—ব্রহ্ম কখনো উচ্ছিষ্ট হন না। প্রণব সেই রকম বস্তু, যা' মুখে উচ্চারণ সম্ভব নয়। হ্রীং, ক্লীং, ক্রীং, ঐং, হুং, শ্রীং, রাং প্রভৃতি সহস্র সহস্র বীজমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করা যায় কিন্তু ওঙ্কারমন্ত্রের সম্যক্ উচ্চারণ ওষ্ঠে, কণ্ঠে, জিহ্বায় বা অন্য কোনও প্রকারে করা যায় না। যেটুকু যায়, সেটুকু হচ্ছে nearest approximation অর্থাৎ কাছাকাছি ধ্বনির অনুরণন। যেমন ওঁ, ওম্ অউম্, ওঁ, ঔং ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটাই হচ্ছে প্রণবের নিকটতম অনুরণন। এর মধ্যে কোনোটা অশুদ্ধ নয়, কিন্তু প্রত্যেকটাই খানিকটা অপূর্ণ। বারংবার জপ কত্তে কত্তে প্রণবের প্রকৃত ধ্বনি অন্তরে শুনতে পাওয়া যায়। এর যে-কোনও একটাকে ধ'রে জপ শুরু ক'রে দিলে প্রত্যেকে একই প্রণবধ্বনিতে পৌঁছে যাবে। এই জন্যই এদের মধ্যে একটাও অশুদ্ধ নয়। ওঁ জপারও যে ফল, ওম্ জপারও সেই ফ.।, অউম্ জপারও সেই ফল, ঔং জপারও সেই ফল। এ যেন বিরাট বিশাল পিণ্ডাকৃতি গোলাকার একটা মিশ্রির তালকে আমি, আপনি, রামা, শ্যামা, যদু, মধু চারদিক থেকে জিভ দিয়ে চেটে চেটে আস্বাদন কচ্ছি। জিভ দিয়ে মিশ্রিপিণ্ডকে স্পর্শ করার সময়ে চট্ ক'রে একটা আওয়াজ হচ্ছে, সেই আওয়াজটাই কারো কর্ণে ওঁ, কারো কর্ণে ওম্, কারো কর্ণে অউম্, কারো কর্ণে ঔং ব'লে ঠেকছে। অথচ যার যার নীরব আস্বাদনে এই

বিচিত্রতা নেই, আস্বাদনের বেলায় প্রতিজনেই ঠিক একই রূপ মিষ্টিস্বাদ পাচ্ছে। গল্প দিয়ে এই অদ্ভুত তত্ত্বটা বোঝান যায় না, তবু একটা গল্পই বল্লাম। গুরু কাউকে মন্ত্র দেবার কালে সে যা শুনেছে, তাকে অশুদ্ধ ব'লে সংশয় করা ভুল। তাকে নিঃসংশয়িত সত্য ব'লে জেনে কেবল জপ ক'রে যেতে হবে।

গুরুহীনের প্রণব-জপ

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—গুরু যদি কাউকে প্রণব-মন্ত্র না দিয়ে থাকেন, তাহ'লে কি সে প্রণব-জপ কত্তে অধিকারী?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুহীনের মন্ত্রজপে হয়ত গভীর নিষ্ঠা আসে না এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিনিবেশও জন্মে না। এই জন্যই সবাইকেই গুরু করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। গুরু চাই, কথাটার সমর্থনের যুক্তি হচ্ছে এইটুকু। যার গুরু নেই বা যে গুরু পেল না, অথবা যে এমন গুরু পেল না, যাঁতে পূর্ণ নির্ভর করা চল্‌বে, তার পক্ষে পরমেশ্বরকেই গুরু ব'লে মেনে নিয়ে সাধন আরম্ভ করা ভাল। তারপরে সাধন কত্তে কত্তে যখন যা' সত্য সত্য প্রয়োজন, তা' এসে যাবে। শূদ্রেরা প্রণব জপ কর্লে নরকে যায়, এসব ভয় প্রদর্শনকে গ্রাহ্য করার দিন চলে গেছে। মাতৃগর্ভ থেকে মাটিতে প'ড়ে প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ ক'রেই ত' আমি সর্ব্বপ্রথম আমার অস্তিত্বের প্রমাণ ঘোষণা করেছিলাম। ওঁয়া ওঁয়া ত' ওঙ্কারেরই একটী

অনুরণন মাত্র। গুরু খোঁজার জন্য ব্যাকুল না হ'লেই বা ক্ষতি কি? যার প্রয়োজন আছে, বিনা খোঁজা-খুঁজিতেই তার গুরু এসে যাবেন। না আসেন ত', নামকেই গুরু ক'রে নিতে হবে। আমাকে গুরু করার প্রয়োজন নেই। আমি যখন জন্মিনি, তখনো কত শূদ্র মনে মনে প্রণব জপ করেছেন, যা' শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা দমন ক'রে রাখতে পারেন নি। স্ত্রী-শূদ্র সবাই নানা স্থানে আমার জন্মের অনেক আগে থেকেই নিজ নিজ মনের অভিলাষ-অনুযায়ী প্রণব-জপ ক'রে পরমার্থ ও শান্তি আহরণের চেষ্টা করেছিলেন ব'লেই ত' আমার জন্মগ্রহণ সম্ভব হ'ল। নামই গুরু, গুরুই নাম। নাম-সমূহের মধ্যে প্রণবই শ্রেষ্ঠ, অতএব প্রণবই শ্রেষ্ঠ গুরু। মনের ঝোঁকে নয়, প্রাণের প্রেরণায় এই নামরূপী মহাগুরুর সঙ্গে যুক্ত হ'তে হবে। স্বরূপানন্দ ত' তিন দিনের। ওঙ্কার মহামন্ত্র শাশ্বত যুগের, সনাতন কালের। ওঙ্কার মহামন্ত্র চিরন্তন ইতিহাসের আদি, মধ্য এবং অন্ত।

প্রণব সম্পর্কে বক্তৃতা

প্রশ্ন ঃ—আজ বিকালে হরিসভা-প্রাঙ্গণে প্রণব-মন্ত্র সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিবেন? দিলে, এখনি শহরময় প্রচার ক'রে দিতে পারি। আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্য মানুষ পাগল। ঐ মুখারবিন্দ-নিঃসৃত ভাষণ জীবনে যে লোক একবার একটী মিনিটও শুনেছে, সে আর তা' কখনো ভুলবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রণব আমার জীবন-মরণের আরাধ্য মহামন্ত্র। তাঁকে নিয়ে আমি কখনো সভাস্থলে বক্তৃতা দিতে রুচি পাই না। প্রাণের জিনিষ প্রাণেই থাকুন। আমি ভাষণ দিব চরিত্র-সম্বন্ধে, ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে, সংযম-সম্বন্ধে, দাম্পত্য জীবনের দিব্যায়ন সম্পর্কে, সন্ন্যাস-জীবনের অটুট বৈরাগ্য এবং অকপট জীবসেবার আদর্শ সম্বন্ধে। প্রণব সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার কিছু নেই। কারণ, প্রণব-মন্ত্র তাঁর নিজের বিক্রমে নিজেকে বিশ্বতোমুখ বিস্তার দান কর্ব্বেন। কি ভাবে তা' হবে, তার বিচার-বিবেচনা নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের পক্ষে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। আপনা আপনি মানুষেরা বুঝতে পার্ব্বে যে, শত শত মন্ত্র জ'পে কালক্ষয় না ক'রে সর্ব্বমন্ত্রের জন্মভূমি, সকল মন্ত্রের সমন্বয়-ক্ষেত্র, সকল তন্ত্রের সমাহার-মঞ্চ প্রণবের আশ্রয়েই অতি সহজে এবং অতি স্বাভাবিক ভাবে সর্ব্ব সাধারণের পরম-মঙ্গলের সেতু। যে কাজটা পরমাত্মার ইচ্ছায় আপনা আপনি হবে, সেই কাজটা নিয়ে আমাদের তাড়াতাড়ি বা হুড়াহুড়ি করার প্রয়োজন কি?

প্রশ্নকর্ত্তা প্রণত হইলেন। সমাজে বিপুল প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ইনি একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি। নানা কারণে তাঁহার পুণ্য নামটী এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত বিবেচনা করা গেল না। তিনি বলিলেন,—শুনেছিলাম, আপনি হিন্দু-ধর্ম্মের বিনাশ সাধন কচ্ছেন, কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনি মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র নিয়ে এসেছেন। ধন্য ভগবান্।

গণিকাবৃত্তির উৎস

ঘণ্টাখানিক পরে একটী সুন্দর সুবেশ যুবক আসিয়া দর্শনার্থী হইল। কি প্রয়োজন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিল,—বলতে পারেন, শহরে বন্দরে এত গণিকার আধিক্য ঘটেছে কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বাজারে পণ্য জমে চাহিদার অনুপাত অনুসারে। একদল লোক আছে, নিত্য যাদের মাংস সেবন চাই। দোকানদাররা সে খবর পেয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মাংস আমদানীর ব্যবস্থা আছে। অনেক লোক আছে, যাদের প্রতিটি ব্যঞ্জনে পলাণ্ডু না হ'লে চলে না। খোঁজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারীরা পাটনাতে লোক পাঠায় পিঁয়াজ আমদানী করার জন্য। অনেক সময়ে শহর-বন্দরের মানুষেরা গান-বাজনার প্রতি খুব ঝুঁকে পড়ে, ব্যবসায়ীরা তখন হারমোনিয়াম, বেহালা, তানপুরা, সেতার, এস্রাজ, তবলা, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ প্রভৃতির দোকান খোলে। যখন কোনো স্থানে এমন চরিত্রের পুরুষদের আধিক্য ঘটে, যারা সস্তায় স্বল্প সময়ের জন্য মাঝে মাঝে নবপরিচিতা মেয়ে মানুষের সঙ্গসুখ নিভৃতে ও গোপন ভাবে পেতে চায়, তখন আড়কাঠিরা গ্রামে গঞ্জে বেরিয়ে পড়ে এমন মেয়েদের খোঁজে, যারা তাদের ব্যবহার দিয়ে, যৌবন দিয়ে, বশ্যতা দিয়ে যে-কোনও খদ্দেরকে তুষ্টি দান ক'রে পয়সা রুজি কত্তে পার্ব্বে। জগতে গণিকার হাটগুলি

প্রায় ক্ষেত্রে এই রকম ভাবেই জ'মে উঠেছে। দুশ্চরিত্র পুরুষেরা কিছু চায়, যার বিনিময়ে অর্থ ব্যয়ে তারা খুশী মনে প্রস্তুত, আর সেই পয়সা নিতে চায় একদল শিথিল-চরিত্রা মেয়েমানুষ,—এই ঘটনা থেকেই গণিকাবৃত্তির সৃষ্টি।

গণিকারা হতভাগিনী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অভাব বশতঃও অনেকে গণিকাবৃত্তির পথে পাদচারণা কত্তে বাধ্য হয়। স্বামী যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত, তার চিকিৎসার ব্যয় সঙ্কুলন অসম্ভব কিন্তু চিকিৎসকটীর কাছে দেহ বিক্রয় কর্লে সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর পুনর্জ্জীবন লাভের পথ খুলে যায়, এমন দুর্ঘটনায় প'ড়েও জগতে দুই চারিজন সতী সাধ্বী নারীকে শেষ পর্য্যন্ত গাণিক্যের পথ গ্রহণ কত্তে বাধ্য হ'তে হয়েছে। আমার মতে, স্বামীর মৃত্যু এবং নিজের বৈধব্য নিশ্চয়ই গণিকাবৃত্তির চেয়ে শতগুণ শ্রেয়ঃ। কিন্তু অবস্থার তাড়নায়, পরিস্থিতির পীড়নে সেই কথাটা বারংবার মনে মনে ভেবেও কোনো কোনো নারী শেষ পর্য্যন্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে দেহ দান না ক'রে পারে নি। এটা জগৎ-সভ্যতার এক কলঙ্ক। গণিকার জগৎ এক অন্ধকারময় জগৎ, ওখানে রাত্রিতে আলো জ্বলে কিন্তু একটা প্রাণীরও অন্ধকার দূর হয় না। কোনো কোনো নারীকে চুকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে, কাউকে কাউকে উচ্চশিক্ষার সুযোগদানের নাম ক'রে পল্লীগৃহ থেকে টেনে এনে এই

অশান্তির নীড়ের চঞ্চল পাখীতে পরিণত করা হয়েছে। এরা নিজেরা দোষী নয়, দোষ বাজারের চাহিদার, দোষ চাহিদা মেটাবার আড়কাঠিদের আর দোষ এসব মেয়ের অজ্ঞতার বা অনভিজ্ঞতার। এই সব মেয়েদের মধ্যে অনেক হীরা, মতি, পান্না আছে, যারা কাচের দরও পেল না। এরা সত্যই হতভাগিনী।

গণিকা-ত্রাণের পরিকল্পনা

যুবকটী বলিল,—তারই জন্য আমি এদের উপকার কর্ব্বার একটা পরিকল্পনা করেছি। কাজও আরম্ভ করেছি। ভেবেছিলাম, ওদের কাছ থেকেই বাধা পাব, কিন্তু দেখছি যাকেই সৎপথে ফিরে আসবার কথা বলছি, সে-ই উৎসাহিত হচ্ছে।

যুবকটী তাহার যাবতীয় পরিকল্পনার কথা বলিল। শ্রীশ্রীবাবামণি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন এবং পরে মন্তব্য করিলেন,—কারও ঘরে আগুন লাগলে দমকলের লোকেরা জলের পাইপ, পাম্প, অগ্নিনির্ব্বাপক সরঞ্জাম নিয়ে সেখানে ছুটে যায়। কিন্তু পাগলের মত যায় না। আত্মরক্ষার যাবতীয় সুব্যবস্থা ক'রে তবেই যায়। কারণ, আগুন তারা নিভাতে পারুক আর না পারুক, শেষ পর্য্যন্ত তাদের কর্ম্মক্ষম অবস্থায় জীবিত থাকা প্রয়োজন। তারা অগ্নি-নির্ব্বাপণ অসম্ভব জেনেও অনেক সময় কেউ কেউ আগুনে ঝাঁপ দেয় এবং জীবন

বিপন্নও করে, এই কথাটা জেনে যে, তার পেছনে আরও অগ্নি-নির্ব্বাপক সাহসী মানুষেরা প্রতি পদক্ষেপে এগিয়েই আসছে। যে-কোনও ত্রাণকর্ম্মে এমন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাতে প্রতিকূলতার প্রবল তরঙ্গে একজন ডুবে গেলে পরক্ষণে কেউ না-কেউ সেইখানে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসে। এর নাম সংগঠন। সংগঠন না থাকলে একক চেষ্টায় কেউ কখনও বিরাট কোনও কাজ সমাধা করতে পারে না। তোমারই মতন একদা ব্রাহ্ম-সমাজের সাহসী যোদ্ধারা কলকাতার রামবাগান, হাড়কাটাগলি, চিৎপুর রোড় আদি নানা অঞ্চলে পতিতা. মায়েদের উদ্ধার-কল্পে প্রাণপাত পরিশ্রমে লিপ্ত হয়েছিলেন। জনশক্তি এবং ধনশক্তি দুটাই তাঁরা প্রচুর প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু কাজ চালু রাখা সম্ভব হয়নি। সুতরাং প্রকৃত প্রতিকার যদি কিছু করতে হয় এবং নিরাপদ প্রতিষেধের পথ যদি ধরতে হয়, তবে দালাল এবং আড়কাঠিদের পৌরুষকে খর্ব্ব করার জন্য কুমারী এবং সদ্যঃ-সধবা মেয়েদের ভিতর কর্ম্মযজ্ঞের আয়োজন করতে হবে। আমি "কুমারীর পবিত্রতা"য় আর "সধবার-সংযমে" যে সব কথা লিখেছি, অসংখ্য বক্তৃতামঞ্চে যে সব কথা এদের সম্পর্কে বলেছি, যদি তা' প'ড়ে থাক বা শুনে থাক, তবে পল্লীতে-পল্লীতে, ঘরে-ঘরে প্রতিটি উৎসুক কাণের কাছে সেই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। নিজে যে সমস্যাটিতে পড়েছ, তার প্রতিকারের উপায় সহজ নয়। কিন্তু প্রতিষেধের পথ খোলাই আছে।

ভোগপ্রলুব্ধতার কুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক ক্ষেত্রে নারীরা নিজ নিজ পরিবেশ থেকে এমন কুশিক্ষা পায়, এমন কুদৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয় যে, ভোগলালসা এবং বিলাস-তৃষ্ণা মিটানো এক অসাধ্য ব্যাপার হ'য়ে পড়ে। তখন তারা কুণ্ঠাহীন মনে প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে দেহ-বিক্রয় শুরু করে। পাশ্চাত্য ভোগবাদ এদেশে যতই প্রবল হবে, এই উপসর্গটি ততই বাড়বে। আর্থিক অনটন যেমন অনেক মেয়েকে বিপথে টেনেছে, অনটন না থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত ধন লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তেমন অনেক মেয়েকে সর্ব্বনাশের পথে টানে। বড় বড় নেতারা ত্যাগবাদকে যে ভাবে নিন্দা করছেন, ভোগবাদকে যে ভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, শিল্পে-সাহিত্যে যৌনতাকে প্রচ্ছন্নতামুক্ত ক'রে প্রকট বীভৎসতায় টেনে নেওয়া হচ্ছে, তাতে দেশের মহাসৌভাগ্যের দিনেও হয়ত আমরা এই কথা ব'লেই আফশোষ করব যে, রামবাগান ত' ভদ্রপল্লী হ'য়ে গেল কিন্তু ভদ্রপল্লীর ললনাদের আচরণ হঠাৎ রহস্যময় হ'ল কেন? গণিকা উদ্ধার করতে যাচ্ছ,—ভাল কাজ। কিন্তু নিজে যেন তলিয়ে না যাও। এদিকে খেয়াল রেখ। সবল হ'তে গেলে দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। কিন্তু দুর্ব্বলতা আসতে গেলে সময় লাগে একটী নিমেষের। আর্ত্তের উদ্ধারই প্রকৃত পুরুষের পৌরুষ। কিন্তু দেবদাসেরা কত দুর্ব্বল, তা' ভাবলে

চোখে জল আসে। চন্দ্রমুখী ত' অনেক আছে। সম্ভবত নারী-চরিত্রের এটাই স্বাভাবিক মহত্ত্ব কিন্তু দেবদাসেরা যে দেবতার দাস নয়, ভোগলালসারূপী দানবীর দাস। বিপদটা ত' এইখানেই।

গণিকার আত্মোদ্ধার

যুবকটী চলিয়া যাইবার ঘণ্টাদুই পরে কতিপয় নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। যুবকটী যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি ইহারা করিল। বলিল,—আমরা সৎপথে চলতে চাই, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনোপায় সংগ্রহের জন্যই অন্ধকার পথে পা বাড়িয়েছিলে, জীবিকার্জ্জনের শুদ্ধতা দিয়েই এই পথের বাইরে চলে আসতে হবে। চিন্তা ক'রে দেখ, কার কোন্ দিকে যোগ্যতা। ঘর ছেড়ে বেরুবার আগে যেমন জানতে না, কোথায় শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে, বর্ত্তমান খাঁচা ছেড়ে বেরুবার পরেও তেমনি এক অনিশ্চিতের দিকেই তোমাদের ঝাঁপ দিতে হবে। স্বামীবতী পত্নী হ'য়ে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার চেয়ে নিরাপদ উপায় তোমাদের পক্ষে আর কিছু নেই। কিন্তু একটী মাত্র পুরুষকে জীবনের পরম কেন্দ্র বা চরম লক্ষ্য ক'রে চলবার সাহস ও ধৈর্য্য না থাকলে এই পথটি সুনিশ্চিত সুখের পথ নয়। সংসারী জীবনে স্ত্রী স্বামীর একান্তই অধীন, কেবল উপার্জ্জনের যোগ্যতার আর অপটুতার

কারণেই নয়, সামাজিক কারণেও। তাই, তোমাদের সদুপায়ে উপার্জ্জনের পথই চেষ্টা ক'রে আবিষ্কার করে হবে। মুসলমান-সমাজ অনেক স্থানে অনেক বিপন্ন পতিতাকে সংসারের বধূ-রূপে আদর ক'রে তুলে নিয়েছে, হিন্দু-সমাজ এই বিষয়ে একেবারে অনিচ্ছুক। ভুলকে এবং ভ্রান্তিকে ক্ষমা ক'রে গ্রহণ করার আগ্রহ যতদিন হিন্দু-সমাজে না আসছে, ততদিন তোমাদের পক্ষে এই সমাজের বুকে ফিরে গিয়ে আশ্রয় পাওয়ার প্রকাশ্য সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না মায়েরা। তোমরা নিজেরাই অবিরাম চিন্তা কর যে, কি ক'রে তোমরা সদুপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন করে পার। রিরংসার তাড়না যাদেরকে বারংবার চঞ্চল করে না, নিত্য নূতন পুরুষের সংসর্গ লাভের মানসিক উত্তেজনা যাদের জীবন-গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগবস্তু সংগ্রহে এবং নানাবিধ বিলাসিতায় প্রমত্ত হ'তে যাদের মনে সায় নেই, তারা ইচ্ছা করলে একখানা চরকা হাতে নিয়ে দূরদেশে চ'লে গেলে তাকে অবলম্বন ক'রেই আস্তে আস্তে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। মানুষের মন ভোলাবার বিদ্যার চর্চ্চা পরিণামে জীবনের কোনো কাজে আসে না কিন্তু নিজের অন্ন ধর্ম্মাশ্রিত পরিশ্রমের দ্বারা অর্জ্জনের বিদ্যা আয়ত্ত করার চেষ্টা করলে যে-কোনো অসহায়া নারী নিজেকে অন্ন, বস্ত্র, আচ্ছাদন, নিরাপত্তা ও আত্মপ্রসাদ দিতে পারে। কোনো কিছু করার আগে তার বিষয়ে বিশদ চিন্তা ও ধ্যানের প্রয়োজন আছে। হুট্ ক'রে একটা কাজ

ক'রে ফেলে তারপরে কেবল অনুতাপ আর অনুশোচনা ক'রে লাভ নেই।

একটী মেয়ে বলিল,—এমন কতকগুলি পুরুষ আছে, যারা আমাদের নিজেদের ঘরে বধূ-রূপে তুলে নেবার সাহস রাখে না অথচ আমাদের পিছনও ছাড়ে না। এরা ঈর্ষ্যাপরায়ণ, ক্রোধী এবং গুরুতর অন্যায় কার্য্য ক'রে হ'লেও আমাদেরকে আমাদের নিজ অবস্থায়ই জোর ক'রে ধ'রে রাখতে চায়। তাদের বিরুদ্ধতা অতিক্রম ক'রে আমরা কোনো কাজেই হাত দিতে পারি না। এ এক বিষম সমস্যা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মশক্তিতেই তোমাদের আত্মোদ্ধার কত্তে হবে। তোমরা একান্ত অসহায় ব'লেই ত' মা তোমাদের আত্মশক্তির প্রবোধন একান্ত প্রয়োজন। যদি কিছু কত্তে পার, তবে তা' আত্মশক্তির বলেই সম্ভব হবে, রাম, শ্যাম, যদুর আশ্বাসে বা সাহায্যে বিশেষ কিছু হবে না। বিশ্বাস কর যে, তোমরা মহাশক্তিরই অংশ-স্বরূপিণী, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়া মহাশক্তি আর তোমরা এক এবং অভিন্ন। ইচ্ছা করলে তোমরা সব কত্তে পার। স্বদেশী আন্দোলনের আর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এক একটা চরম মুহূর্ত্তে তোমরাও যে দলবদ্ধ ভাবে কত কত অসামান্য কাজ করেছ, তার খবর আমি রাখি। আমি দেখেছি, তোমাদের শক্তি কম নয়। তবে, লজ্জা, আত্মগ্লানি আর অনুতাপ তোমাদের প্রসন্নতাকে ধিকি ধিকি ক'রে দগ্ধ কচ্ছে। তাই, তোমাদের মনুষ্যত্বের সহজ

প্রকাশ বাধা পাচ্ছে। কিন্তু এটা সতী, সাবিত্রী, বেহুলার দেশ। সেই আদর্শ তোমাদের মন থেকেও একেবারে লুপ্ত হয় নি। তোমরা সীতা হ'তে পার নি, তবু রামচন্দ্রকে পূজা কর। তোমরা সতী হ'তে পার নি, তবু দেবাদিদেব মহাদেবের ত্যাগেশ্বর মূর্ত্তিকে পূজা কর। তোমাদের অন্তরের এই পূজনশীলতা তোমাদিগকে নরক-কুণ্ড থেকে উদ্ধার কর্ব্বে। নরক চিরকাল নরক থাকবে না, ধরিত্রীও চিরকাল নরকের দ্বিতীয় একটী সংস্করণ হ'য়ে প'ড়ে রইবে না। অন্তরের আদর্শবাদ সব কিছু মন্দের রূপ-বিবর্ত্তন ঘটাবে। ঋষির ভারতে আবার ঋষিদের প্রবর্ত্তিত পবিত্রতার তপস্যা শুরু হবে। তোমরা ভগবানের নামে পরিনিষ্ঠিত হও, নামে লগ্ন হও, নামে মগ্ন হও, নামের ভিতর থেকে আনন্দরস আহরণে তৈরী হও। সেই আনন্দ ফোয়ারার মতন তোমাদের দগ্ধ হৃদয়ে স্নিগ্ধতা বর্ষণ করুক। ভগবানের নাম অবিরাম অবিশ্রাম স্মরণ কত্তে কত্তে একদিন দেখবে, খাঁচা ভেঙ্গে গেছে, তোমার ডানায় উড়ে যাবার ক্ষমতা এসেছে, আর তুমি দুর্ভাগ্যের দাসত্বে বন্দিনী নও, তুমি মুক্ত।

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব

আগন্তুকারা চলিয়া গেলে একজন প্রশ্ন করিলেন,—এখন যারা এসেছিল, তারা কারা?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এসেছিলেন মায়েরা। স্ত্রীলোকের

পরিচয় একমাত্র 'মা' নাম ছাড়া অন্য কোন্ নামে হ'তে পারে বল ত! রামপ্রসাদ এঁদের মা বলেছেন, রামকৃষ্ণ এঁদের মা বলেছেন। এঁরা আমার, তোমার, সবার মা, এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু।" ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্ত্রীলোকই আমার মা। অর্জ্জুন উর্বশীকে মাতৃস্বোধন করেছিলেন, মায়ের প্রাপ্য পূজা দিয়েছিলেন। সব নারীকেই মা ব'লে ভাবার দৃষ্টান্তের অভাব ভারতের মাটিতে নেই। জগতের একটী স্ত্রীলোককেও যে সত্য সত্য মা ব'লে ভাবতে পেরেছে, আস্তে আস্তে জগতের সব স্ত্রীলোককে মা ব'লে ভাবার তার পথ খুলে যায়। তোমরা ছোট বড়, পাপী পুণ্যবতী, সমাজে আদৃত ও পতিত সকল নারীকে মা ব'লে ভাবতে শিখ, মা ব'লে ডাকতে শিখ। এর ফলে সমগ্র পৃথিবীর পাপভার ক্রমশঃ কমতে থাকবে। নারীরা কামিনীও নয়, রমণীও নয়, তারা জননী ও প্রাণশক্তি-বিধায়িনী। যে দেশের নারীর প্রতি মাতৃভাব যত সুদৃঢ়, সেই দেশের সভ্যতা তত উন্নত ব'লে জানবে। মা ডাকে প্রাণমন পূর্ণ ক'রে নাও। মাকে ভালবাস। মায়ের পবিত্রতাকে অলঙ্ঘনীয় ব'লে জ্ঞান কর। সমগ্র জগৎকে মাতৃভাবের শিক্ষা দাও।

বালি (হাওড়া)

১৬ই চৈত্র, রবিবার, ১৩৪২

(২৯শে মার্চ্চ, ১৯৩৬)

প্রাতে সাড়ে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি বালি আসিয়াছেন।

গৃহস্বামী হইতেছেন বর্দ্ধমানের খগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই। ইনি বালিতে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার।

সাধুদের পর্য্যটন

একজন প্রশ্ন করিলেন,—সাধুরা এত ঘুরে বেড়ান কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে জন্য সাধুরা এক এক সময়ে এক এক স্থানে ব'সে পড়েন, ঠিক্ সেই একই কারণে কখনো কখনো তাঁরা দেশ-পর্য্যটনও ক'রে বেড়ান। উদ্দেশ্য, লোকহিত। আর একটী উদ্দেশ্য তাঁদের, নিজেকে শিক্ষাদান। নানা স্থানে ভ্রমণে থাক্‌লে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি মমতা আসে না, এইটী হচ্ছে ভ্রমণের অন্যতর লাভ। একই স্থানে দীর্ঘকাল থাকলে স্থানীয় চিন্তাশীলতার আবহাওয়া তাঁরা নিজেদের চরিত্র ও সাধনার দৃষ্টান্ত-মাহাত্ম্যে 'বেশ কতকটা পরিবর্ত্তিত ক'রে দিতে পারেন, এইটা হ'ল ভ্রমণ না করার লাভ। সব কাজেরই ভাল ও মন্দ দুইটা দিকই আছে। এক এক জনের দ্বারা হয়ত ভালর দিকটা বেশী হয়, এক এক জনের হয়ত মন্দের দিকটা বেশী হয়। যাতে নিজের ভালো ও মানুষের ভালো বেশী ক'রে হ'তে পারে, তার দিকে তাকিয়েই সাধুদের কর্ত্তব্য হচ্ছে সতর্ক ভাবে চলা। নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের দৃষ্টান্তগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কারোর উচিত নয় নানা দেশে পর্য্যটন করা।

সাধু-সঙ্গের অনুকূল ও বিপরীত ফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বার্থবুদ্ধিহীন চিত্তে সদাদর্শ নিয়ে কাজ করলে তা' প্রত্যাশাতীত সাফল্য একদিন না একদিন অর্জ্জন কর্ব্বেই কর্ব্বে। এই কথাটী মনে রেখেই সাধারণতঃ সাধুরা দেশ-পর্য্যটন করেন বা এক স্থানে স্থির হ'য়ে ব'সে পড়েন। প্রকৃত সাধুর প্রেম সর্ব্বজীবের প্রতি। প্রকৃত সাধু নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য কোনও চিন্তা, বাক্য বা চেষ্টা প্রয়োগ করেন না। তাঁর ভরসা পরমেশ্বর, যিনি সাধুর সব প্রয়োজন নিজ গুণে মিটাবেন। ঈশ্বর-সেবার বুদ্ধি নিয়ে সাধু কাজ করেন। তীর্থ ভ্রমণে মন পবিত্র হয় এবং পবিত্রচেতার সংস্পর্শে অন্য লোকের মনে সদ্‌ভাবের উদ্দীপনা হয়। টুরিষ্টের ভ্রমণ আর তীর্থ-যাত্রীর ভ্রমণ, উদ্দেশ্য বা ফলের দিক দিয়ে কদাচ এক নয়। কিন্তু যে যেই ভাব নিয়েই ভ্রমণ করুক, ভ্রমণের ফল সে পাবেই এবং তার সংসর্গ লাভ করার ফল নানা স্থানের লোকেরা পাবেই। অনেক সময়ে সাধুদের দলে অনেক চোর বা প্রতারক মিশে থাকে ব'লে প্রকৃত সাধুর তাতে দোষ হয় না। অনেক সময়ে চোরের দলের মধ্যে সত্যিকারের সাধুকেও পাওয়া যায় ব'লে চোরের দলের তাতে প্রশংসা হয় না। প্রত্যেক ভ্রমণকারী নিজ নিজ চরিত্রের ব্যক্তিগত সত্তাকে সঙ্গে ক'রে দেশ-ভ্রমণ করে, তোমরাও

তাদের সংস্পর্শে পড়ে ব্যক্তিগত ভাবেই কেউ লাভবান্ হও, কেউ বা ক্ষতিগ্রস্ত হও। সিদ্ধাই বা অলৌকিক শক্তির আধার মনে ক'রে সাধুদের পিছনে ঘুরে বেড়ানো নিতান্ত নিরর্থক ব্যাপার। অলৌকিক শক্তির বিকাশ-সাধন তোমার মতন একটী সাধারণ লোকের পক্ষেও সম্ভব। নিজে যে তুমি সাধারণ, একথা যতটা সত্য, তোমার ভিতরে যে অভাবনীয় শক্তির উৎস লুক্কায়িত রয়েছে, একথাও ততটাই সত্য। তুমি যদি নিবিষ্ট মনে একাগ্র চিত্তে কেবল নিজের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য-সমূহ ক'রে যেতে থাক, তবে তোমার নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুবর্ত্তনের ফলেই তোমার অজ্ঞাতসারে কতকগুলি অজানা শক্তির বিকাশ অতি অবশ্যই ঘ'টে যাবে। অলৌকিক কাণ্ড দেখাবার জন্য তোমার অবতার বা মহাপুরুষ হবার প্রয়োজন নেই। যারা দেশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অনেক অলৌকিক শক্তি দেখায়, তাদের মধ্যে কতক লোক যে স্রেফ ম্যাজিশিয়ান বা যাদুকর ছাড়া আর কিছু নয়, একথা বিশ্বাস করো। কারো পাদস্পর্শে তোমার প্লীহা রোগ সেরে গেল, এটা সম্ভব হ'তে পারে, হয় তোমার বিশ্বাসের শক্তিতে, নয় তাঁর আশীর্ব্বাদের ফলে, যিনি পাদদ্বারা স্পর্শটী দিলেন। কিন্তু আর একবার তোমার প্লীহারোগ যে কখনো হবে না, এর নিশ্চয়তা নেই। কারো নয়নের স্নেহদৃষ্টির ফলে তোমার মনের কাম উপশান্ত হ'য়ে যেতে পারে কিন্তু পরবর্ত্তী কালে আর যাতে কামের বশীভূত না হ'তে হয়, তার জন্য তোমার আত্মশক্তির

প্রবোধন প্রয়োজন। কারো অলৌকিক শক্তি যদি তোমার আত্মশক্তির প্রবোধন করে, তবে ঐ শক্তির সহায়তা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। কারো অলৌকিক শক্তির লীলা প্রদর্শন যদি তোমাকে পরনির্ভর কাপুরুষ ক'রে দেয়, তবে তেমন শক্তির সহায়তা গ্রহণ তোমার পক্ষে মারাত্মক ভুল। সব মানুষেরই যেমন কতকটা অলৌকিক ক্ষমতা নিজ নিজ অজ্ঞাতসারেই আছে, ঠিক্ তেমনি অনেক সাধুর ভিতরে অল্পাধিক অলৌকিক শক্তির বিকাশ সত্যই ঘটেছে। এই শক্তি তাঁরা লোককল্যাণে লাগাবেন ব'লেও কেউ কেউ দেশ পর্য্যটন করেন। আমি কিন্তু কোনো অলৌকিক শক্তিকে প্রয়োগ করারে জন্য দেশ-ভ্রমণ করি না। তোমার ভিতরে যে শক্তি আছে, তারই ঘটুক প্রবোধন এবং নিজ শক্তির বলেই তুমি যেন আত্মোদ্ধার কত্তে পার, তারই জন্য আমি তোমাদিগকে আমার সঙ্গ দেই। আমার নিজের কোনও প্রাপ্য বা অভীষ্ট তোমাদের কাছে নেই। তবু আমার অনেক লাভ হয়। প্রথম এবং প্রধান লাভ দেশকে চেনা, দেশের মানুষকে চেনা। হরেক রকমের মানুষের সঙ্গে হরেক রকম অবস্থায় যদি না মিলন ঘটে, হরেক উপলক্ষ্যে যদি দেশের মানুষকে কাছে না পাওয়া যায়, তাহ'লে কি দেশকে চেনা যায়? তোমাদের দেখলুম, চিনলুম, জানলুম, আমার কাজ তাতেই হ'য়ে গেল। একটী সাধারণ সৎ মানুষ দেশের নানা দিক্ ভ্রমণ ক'রে গেলে তার চিত্তের সরল ভাবগুলি চারদিকে ছড়ায়, একথা যেমন সত্য, ঠিক

তেমনি সত্য এই যে, কোনো অসাধারণ মানুষ দেশের নানা অঞ্চলে ঘুরে গেলে তাঁরও চিন্তার স্বচ্ছ সুফল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সৎ চিন্তার চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী বিকিরণই হচ্ছে সভ্যতা বিস্তারের শ্রেষ্ঠ উপায়। শিক্ষাদান, প্রচারণা প্রভৃতির ন্যায় নানা দেশ ভ্রমণও একাজের সহায়ক। তাই, সাধু হোন্, আর না হোন্ প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ নিজ চিন্তার সম্ভার নিয়ে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ নিশ্চিতই সকলের পক্ষে হিতকর।

স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ

অপর এক প্রসঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির নিজস্ব উপার্জ্জনের আবশ্যকতা প্রভৃতি নানা কারণ ও উপলক্ষ্যকে অবলম্বন ক'রে দিনের পর দিন স্ত্রী-পুরুষে অবিরাম মেলামেশার সম্ভাবনা ও রেওয়াজ বেড়ে যাচ্ছে। দরিদ্রতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্ভাবনা এবং রেওয়াজ দিনের পর দিন কেবল বাড়তেই থাকবে। নারীরা পুরুষের মতন সকল কর্ম্মক্ষেত্রে আস্তে আস্তে অবতরণ কত্তে থাক্‌বে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভার বলে নারীরা পুরুষকে হঠিয়েও দিতে থাক্‌বে। প্রথম প্রদত্ত প্রশ্রয় আস্তে আস্তে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নেবে এবং একটা অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তথাপি পুরুষের মন আর নারীর মন নিশ্চিতই দুইটা আলাদা

আলাদা স্তরে বাস কর্ব্বে। উভয়ের শরীরগত পার্থক্য যেমন বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট, উভয়ের মানসিকতার পার্থক্যও অনেকটা প্রায় তদ্রূপ। এই কারণেই পুরুষের প্রতি নারীর কর্ত্তব্য এবং নারীর প্রতি পুরুষের কর্ত্তব্য নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হ'তে বাধ্য এবং বিভিন্ন রকম হ'তেই পারে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখ্তে হবে, নারীও সেই ব্রহ্ম, পুরুষ যেই ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিচারের দিক দিয়ে দুজনের স্বরূপের কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং একে অন্যকে সর্ব্বাবস্থায়ই শ্রদ্ধা কত্তে অধিকারী এবং একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাভাব পোষণ সঙ্গতও বটে।

শিক্ষার সমস্যা

অতঃপর শিক্ষার কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— শিক্ষার গোড়া সব সময়েই কাঁচা থেকে যাচ্ছে। ব্যাকরণ আগে না পড়িয়ে ভাষার বিশেষত্ব-সূচক নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট অংশ-সমূহ পড়তে বা আবৃত্তি কত্তে আগে শেখানো উচিত। ভাষার সৃষ্টি হ'য়েছে আগে, ব্যাকরণ এসেছে অনেক পরে। ভাষাকে সাবলীল ভাবে ওষ্ঠে ও জিহ্বায় উচ্চারণ কত্তে শেখাবার আগে ব্যাকরণের কচ্‌কচিতে যাওয়া উচিত নয়। মাতৃভাষার অতিরিক্ত ভিন্ন ভাষা শেখাতে হ'লে একই সঙ্গে দুই তিনটা ভাষার সমার্থবোধক ছোট ছোট বাক্য শিখিয়ে নেবার চেষ্টা করলে এবং সেই চেষ্টায় প্রাথমিক সাফল্য এসে গেল। বিশেষ ক'রে এক একটা ক'রে ভাষা বেশী

মনোযোগ দিয়ে শেখান উচিত। ভারতের মত বিচিত্রভাষী দেশে এবং ইয়োরোপের মত নানা ভাষা-প্রাধান্যের দেশে তিন চারটে ক'রে ভাষা না শিখলে সমগ্র দেশগুলি ভ্রমণ কঠিন ব্যাপার। সুতরাং মুখে মুখে নানা ভাষা শিক্ষা দেবার চেষ্টা ভাল। বই পড়ে নানা ভাষা শিখতে গেলে মস্তিষ্কের উপরে পড়্‌বে দারুণ চাপ, সুতরাং ঐ পন্থা বর্জ্জনই ভাল। ইতিহাস পড়াতে হ'লে ইতিহাস-সম্পর্কিত ভূগোলের অংশ-বিশেষ শিখান দরকার এবং মানচিত্র এঁকে এঁকে দেখান উচিত। জ্যামিতি শেখাতে গেলে মুখস্থের বালাই একেবারেই দূর ক'রে দিতে হবে এবং জ্যামিতির-বাক্স ব্যবহার ক'রে ক'রে ফিগার এঁকে এঁকে অগ্রসর হওয়ার রীতি অনুসরণ কত্তে বাধ্য করা উচিত। গণিত শেখাতে হ'লে চাই ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা। গণিত-শিক্ষক যদি ছাত্রছাত্রীকে পদে পদে উৎসাহ না দিতে পারেন এবং যদি যষ্টি, চাবুক, চপেটাঘাত প্রভৃতি দৈহিক শাস্তিদানের উপরে নির্ভর করেন, তবে তিনি নিজ অযোগ্যতারই পরিচয় দেবেন এবং ছাত্রছাত্রীর অন্তরে ভীতি-সঞ্চারের ফলে তাদের ভবিষ্যৎটা একেবারে দূর ক'রে দেবেন। সামাজিক কর্ত্তব্যবোধের শিক্ষাদান-কালে যদি ছাত্রছাত্রীর স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞানকে খুঁটি-রূপে না ধ'রে কেবল কর্ত্তব্যের তালিকা মুখস্থ করাতে চেষ্টা করেন, তাহ'লে তিনি তাঁর কাজে একেবারেই বিফল হবেন। শিক্ষকেরা অনেকেই

এসব কথা ভাবেন না ব'লে বর্ত্তমান ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি অধিকতর মারাত্মক কুফল সৃষ্টি কচ্ছে।

দরিদ্র-নারায়ণ

আর একজন আসিয়া কথা তুলিলেন,—মৎস্যজীবীদের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আলাদা ভাবে সংরক্ষিত আসন থাকা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু মৎস্যজীবীদের জন্য কেন, বারুজীবী, সূত্রধর, কামার, কুমার, মৃৎশিল্পী, চিত্রকর, নৃত্যজীবী ইত্যাদি ক'রে সকল শ্রেণীর লোকেরই জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আসন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যত রকমের জীবিকার লোক দেশে আছে, ঠিক তত রকমের একটা ক'রে আসন সংরক্ষণ সম্ভব কিনা, তাও দেখ্‌তে হবে। কেউ কেউ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরী-বাকুরীতে বিশেষ সুবিধার দাবী ক'রেও আন্দোলন কচ্ছেন। মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এরূপ দাবী উঠেছিল কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ নেতাদের এই প্রস্তাব মনঃপূত হয়নি ব'লে শুনেছি। রাজনীতির ডামাডোলে শেষ পর্য্যন্ত কোন্ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ক'রে কোন্ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা যে হবে, এই বিষয়ে এখন কোনো অনুমান করা যাচ্ছে না। তবে, আমি মনে করি, ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেকটী সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর লোকেরা যদি নিজ নিজ সমাজের লোকদের ভিতরে চরিত্র-চর্চ্চাকে প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত কত্তে

পারেন, তবে অনেক রাজনৈতিক সমস্যা বিনা সংগ্রামে হয়ত মিটে যাবে। শাসন-কর্ত্তারা যত বড়ই হোন, সরকার কয়জন লোককে চাকুরী দিতে পারেন? ব্যবস্থাপক সভায় বা কেন্দ্রীয় পরিষদে সভ্যসংখ্যা যতই বাড়ানো হোক্, সেখানে কয় জন প্রতিনিধির পক্ষে স্থান দান সম্ভব? অথচ চরিত্র-গঠনের আগ্রহের ফলে, চরিত্র-সাধনার অনুশীলনের ফলে ছোট বা বড় প্রত্যেকটী গোষ্ঠী আপনা আপনি এমন শক্তিধর হ'তে পারে যে, সরকারী আনুকূল্য ছাড়াই তারা নিজ নিজ গোষ্ঠীর বা স্বজাতীয় লোকদের অধিকাংশ দুর্ভাগ্য দূর ক'রে দিতে পারেন। একজন ধনী মৎস্যজীবী নিজের ধন কেবল নিজের ব্যবহারের জন্য রাখছেন ব'লেই ত' সমস্ত মৎস্যজীবী সম্প্রদায় তার কোনো সুফল পাচ্ছেন না। একজন ধনী চর্ম্মকার বা কর্ম্মকার বা কুম্ভকার নিজের সব সম্পদ একাই ভোগ কচ্ছেন ব'লেই ত' অন্য চর্ম্মকার, কর্ম্মকার বা কুম্ভকারেরা সেই ধনবত্তার সুফল পাচ্ছেন না। ধনী বণিকেরা নিজ নিজ ধন কেবল নিজের জন্যই সংরক্ষিত রেখেছেন ব'লেই ত' গরীব বণিকেরা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। সব গোষ্ঠী এবং সব সমাজের মধ্যেই অতি ধনী আর অতি দরিদ্রেরা বিভক্ত হ'য়ে রয়েছে। একদল অপর দলের কোনো উপকারেই আসছেন না। বণিকের সমাজে যারা দরিদ্র, তাদের ভিতরে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এদের দুঃখও ত' দেখ্‌তে হবে! ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধনী লোক দুচার জন মাত্র আছেন, এদের অধিকাংশই দরিদ্র, তার মধ্যে

দরিদ্রতম হচ্ছে ধর্ম্মযাজক, পুরোহিত, শাস্ত্রীয় পণ্ডিত শ্রেণীর লোকেরা। এরাও ত' মানুষ! এদেরও ত' দুঃখটার খবর নিতে হবে। প্রত্যেক জাতির ভিতরেই ধনীরা আছে, গরীবেরাও আছে। সুতরাং দুঃখ খুঁজে বেড়াতে হবে প্রকৃত গরীবদের। বর্ণ-হিন্দু ব'লে গরীবকে কোন সহায়তা দেওয়া হবে না, অনগ্রসর সমাজের ব'লে ধনীকে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, এটা কোনো আদর্শবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী হ'তে পারে না। মৎস্যজীবী হোক্ বা না হোক্, কে কোথায় দরিদ্র আছে, আগে তা খুঁজে বের কর এবং স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানের দেবতা এই নারায়ণদিগকে বিপন্মুক্ত হবার পথে কে কি সহায়তা কত্তে পার, কে কি সহযোগ দিতে পার, কে কি সদুপায় নির্দ্ধারণ কত্তে পার, তা' দেখ।

প্রকৃত ধর্ম্ম

একজন বলিলেন,—কিছু ধর্ম্মকথা শুনতে এসেছিলাম কিন্তু শুনলাম অন্য সব কথা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দরিদ্রেরা নারায়ণ। দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা দিতে হবে। এটা ধর্ম্মকথা হ'ল না? মন্দির স্থাপন আর দেবপূজাদান সম্পর্কে কথা বল্‌লে যদি ধর্ম্মকথা বলা হয়, তবে, দরিদ্রের দুঃখ-নিবারণের কথা বল্‌লেও ধর্ম্মকথাই হয়। কমিউনিষ্টরা নাকি ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু দরিদ্র, নিপীড়িত, নির্য্যাতিত, অবজ্ঞাত সাধারণ মানুষের

জন্যই ত' তাঁদের যত দীর্ঘশ্বাস। তাই আমি, তাঁদের কথাগুলিকেও ধর্ম্মকথা ব'লেই মনে করি। ধর্ম্ম শুধু ঘন্টাধ্বনি করার মধ্যে, শঙ্খনিনাদের মধ্যে, উলু-উলু রবের মধ্যে, বা পুষ্পবিল্বপত্রের মধ্যেই চূড়ান্ত ভাবে নিবদ্ধ নয়। ধর্ম্ম এক অতি ব্যাপক বস্তু, তার স্থিতি প্রত্যেক অভাবীর প্রতিটি সঙ্গত অভাব-পূরণের চেষ্টা-চরিত্রের মধ্যেও আছে। পরের দুঃখে কাঁদা আর ভগবানের জন্য কাঁদা, দুটিই প্রায় সমান জিনিষ। দুটিই চিত্তকে নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও ক্লেদমুক্ত করে।

হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা
১৭ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৪২
(৩০শে মার্চ্চ, ১৯৩৬)

অখণ্ড-সংহিতার প্রশস্তি

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় শিখ ও পার্শীদের শাস্ত্রগ্রন্থে সুপণ্ডিত লেখক ও খ্যাতিমান্ পুরুষ। ঢাকাতেই শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল এবং সেই পরিচয়েই শ্রীশ্রীবাবামণির এখানে তাঁহার গৃহে আসা। অখণ্ড-সংহিতা হস্তলিখিত অবস্থায় যখন ত্রিপুরা জেলার গ্রামে গ্রামে কর্ম্মীদের দ্বারা পঠিত-পাঠিত হইতেছিল, তখন ইনি কুমিল্লার অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি তখন সেই হস্তলিখিত বিরাট গ্রন্থ দেখিয়া বিস্ময় ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অদ্য তিনি অখণ্ড-সংহিতা সম্পর্কে নিজ মন্তব্য

পুনঃ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন,—বাবামণি, আপনি এক আশ্চর্য্য শাস্ত্রগ্রন্থ আপনার অনুরাগীদের হস্তে অর্পণ করেছেন! শিখেরা একমাত্র গ্রন্থ-সাহেবের প্রেরণায় শক্ত-মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট একটা সমাজ গ'ড়ে তুলেছেন। মুসলমানেরা একমাত্র কোরাণ শরিফের প্রেরণায় বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনার অনুরাগী, আপনার প্রতি বিরক্ত, শত্রু ও মিত্র সকলে বিশ্বজনীন শক্তি আহরণ করবেন আপনার অখণ্ড-সংহিতার উপদেশ থেকে।

শ্রীশ্রীবাবামণি একটু হাসিলেন। পরে বলিলেন,—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় বা হবে। যাঁর জগৎ, তিনিই গড়েছেন, গড়ছেন ও গড়বেন। আমি বা আপনি ত' নিমিত্ত মাত্র। অখণ্ড-সংহিতার সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অংশগুলি যে রহিমপুর আশ্রমের গোমতী নদীর জলে চিরতরে জলসমাধি পেল, তাতেও আমার দুঃখ নেই। আপনার চমৎকার অভিনন্দন পেয়েও আনন্দের আতিশয্য অনুভব কচ্ছি না।

যতীন বাবু বলিলেন,—না, আমাদের জীবৎকালে আমরা কত কত কল্যাণ-সঙ্ঘের আবির্ভাব, উত্থান ও বিস্তার দেখ্‌লাম, কিন্তু কোনো সঙ্ঘনেতা তাঁর অনুগৃহীতদিগকে অখণ্ড-সংহিতার মতন এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শাস্ত্র দান কত্তে পারেন নি। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক সর্ব্বপ্রকার মানবীয় কর্ত্তব্যের সম্পর্কে এমন সুসমঞ্জস সমাধান আর কোথাও দেখিনি। এমন অপক্ষপাত বিচার-বিশ্লেষণ, এমন ক'রে প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি

বিষয়ে যার যার প্রাপ্য সম্মান ও প্রশংসা তাকে বিতরণ ক'রে নিজ মন্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার বা নিজ গন্তব্যের পথ পরিষ্কার রাখার দৃষ্টান্ত আধুনিক কোনো সাহিত্যের মধ্যে আমি দেখিনি। আমাকে ভারতের বেশ কয়েকটা ভাবাই ত' শিখ্‌তে হয়েছে, বেশ কয়েকটা ভাষার ধর্ম্মসাহিত্য, নৈতিক সাহিত্য, সামাজিক সাহিত্য, লোক-সাহিত্য নিয়ে ঘাটাঘাটি কত্তে হয়েছে। এমন বৃহৎ ও অনিন্দ্যসুন্দর বনস্পতি আমি আর কোথাও দেখ্‌তে পাই নি। আপনার অখণ্ড-সংহিতার উপদেশ-বাণী একদিন ঘরে ঘরে পঠিত হবে, প্রাণে প্রাণে প্রোথিত হবে।

বিবাহের পরে কাল-প্রতীক্ষা প্রয়োজন

বেলা বাড়িবার আগেই শ্রীশ্রীবাবামণিকে ঘন্টা তিনেক সময়ের জন্য বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলে আসিতে হইয়াছে। কিছু কিছু জিজ্ঞাসু যুবক নিজ নিজ প্রশ্ন রাখিলেন। একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার শরীরের গঠন বলিষ্ঠ ও সুপুষ্ট। তোমার নববিবাহিতা পত্নীর বয়সও কম, তদুপরি তার শরীরের গঠন এখনো পূর্ণ হয় নি। এমতাবস্থায় তুমি যদি শারীরিক সুখভোগের আশা নিয়ে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা শুরু ক'রে দাও, তা' হ'লে তার দেহের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের বাধা হবে। দুই বা তিন বৎসর যদি প্রতীক্ষা

কত্তে পার, তবে তার দেহে যৌবন দীর্ঘকালের মত বিরাজমান থাক্‌বে, এটা স্বাভাবিক সত্য। একটা রুগ্না, অকালবার্দ্ধক্যভারপীড়িতা স্ত্রী নিয়ে সমগ্র জীবন ঘর করার দুর্ভোগের তুলনায় বিবাহের পরে দুই তিন বৎসর কাল দৈহিক ভোগ-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা অনেক বেশী লাভের ব্যাপার। স্ত্রী-আজও তোমার স্ত্রী, তিন বৎসর পরেও তোমার স্ত্রী। সে কখনো পর হ'য়ে যাবে না। তবে সে যদি অশিক্ষিতা অবুঝ মেয়ে হ'য়ে থাকে, তবে একটু দুশ্চিন্তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। তার সঙ্গে মনে প্রাণে অন্তরঙ্গ বন্ধুতা স্থাপন ক'রে সর্ব্বাগ্রে তার মনঃপ্রাণ অধিকার কর। তখন দেখ্‌বে, সে তোমার মুখের মধুবচনে, চোখের স্নিগ্ধ চাহনিতে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে তোমার পক্ষে আপনার চেয়েও আপন হ'য়ে যাচ্ছে। তাকে দাসী বা ভোগসঙ্গিনী ব'লে জ্ঞান না ক'রে তাকে সমগ্র জীবনের পরমলোভনীয় সঙ্গিনী ব'লে জ্ঞান কর, তার উপরে উৎপীড়কের হুকুম না চালিয়ে, তার মনের দিকে তাকিয়ে অতি সতর্ক ভাবে নিজের ব্যবহারকে সীমিত ও সংযত কর, তার ভালর জন্যই যে তুমি সংযমের অনুশীলনে চেষ্টিত, তা' তাকে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে দাও। ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় রমণ-মোহে মত্ত হ'য়ে গেলে তা নিয়ে দুজনে আবার পরস্পরে দোষারোপ কত্তে লেগে যেও না, হাস্য-কৌতুকের ন্যায় অবহেলার ব্যাপার মনে ক'রে ক্ষণিকের সঙ্কল্পচ্যুতিকে বিদায়বাণী শুনাও। নববিবাহিত দম্পতী তাদের প্রথম সময়কার

দিনগুলিকে কি ভাবে ব্যবহার কচ্ছে, তা' নিয়ে বাইরের লোক-গুঞ্জন সৃষ্টির সুযোগ দিও না। শরীরকে ব্যবহার না ক'রেও মন দিয়ে প্রণয় হ'তে পারে, আবার প্রণয়ের চিহ্নমাত্রও না রেখে মনকে নির্ব্বাসন দিয়ে শরীর দিয়ে সম্ভোগ হ'তে পারে। এই দুইটী অবস্থার মধ্যে প্রথমোক্ত অবস্থাটিই তোমাদের পক্ষে কাম্য হোক। তোমাদের দেহেন্দ্রিয় তোমাদিগকে দেহাতীত পরম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন ক'রে দেবে, এই জন্যই কিন্তু বিবাহ। কোনো কোনো গুরুদেবেরা একথা বোঝেন এবং শিষ্য-শিষ্যাদের ইঙ্গিতে এই উপদেশই দেন যে, শিব-পার্ব্বতীর মিলনে মহাযোদ্ধা কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাবই মানুষের কাম্য, কতকগুলি পাটনাই ইন্দুরের জন্মলাভে দেশের, জাতির, জগতের বা মানব-সভ্যতার কোনো লাভ নেই।

বলপূর্ব্বক জাতিভেদ-বিদূরণ

একজন প্রশ্ন করিলেন,—আমরা কি ইংরাজ সরকারকে এই আবেদন জানাতে পারি না যে, জাতিভেদ যখন আমাদের দেশের এক পরম শত্রু, তখন ইংরাজ আইন ক'রে দিন যে, প্রত্যেককে অসবর্ণ বিবাহই কত্তে হবে। সবাই মিলে আন্দোলন কর্লে ইংরাজ কি তেমন আইন পাশ ক'রে দেবেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ-প্রথা চিরকালই ভারতের শত্রুতা করেছে কিনা, এই কথাটা এখনো বৈজ্ঞানিক

ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। জাতিভেদ ভাঙ্গবার জন্য মহান্ সমাজ-সংস্কারকেরা চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের চেষ্টা কোথাও স্থানিক ভাবে কোথাও সাময়িক ভাবে অংশতঃ সফলও হয়েছে। এই সাফল্য যদি সত্যিকারের হয়, তবে সে আলোপ্য হ'য়ে থেকে যাবে। আমার ধারণা এই যে, জাতির স্তরবিভাগ একটা ছিল ব'লে, যারা ঠিক বৈদিক ধর্ম্মানুসারীদের গণ্ডীর ভিতরে কোনো দিনই ছিল না, তারাও কখনো দলবদ্ধ ভাবে, কখনো বিচ্ছিন্ন-ভাবে বাইরে থেকে এসে স্বেচ্ছায় বৈদিক আর্য্য-জাতির ভিতরে ঢুকে পড়েছে এবং নিজ নিজ উন্নতির মান অনুযায়ী স্তরটী বেছে নিয়েছে। একদা ঐতিহাসিক কারণেই এভাবে আর্য্য-জাতির মধ্যে শত সহস্র অনার্য্য-গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং আর্য্যেরা পরধর্ম্মসহিষ্ণু, পরমতে শ্রদ্ধাশীল ব'লে এরা নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাসকে পরিত্যাগ না ক'রেই আর্য্য-পরিবারগুলির ছত্রচ্ছায়ায় লালিত পালিত হবার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং জাতিভেদ আমাদের হুকুমের দাপট দেখে দূর হবে না, দূর হ'তে হ'লে তাকে বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদেই দূর হ'তে হবে। ইংরাজ এই বিষয়ে আইন রচনা ক'রে এই দেশের লোককে ক্ষেপাবে না, কারণ আমাদের মধ্যে জাতিভেদ দূর হ'লে তাঁদের যতটুকু লাভ, আমরা তাঁদের প্রতি নির্ব্বিদ্বেষ থাকলে তাদের লাভ তার চেয়ে অনেক বেশী।

প্রশ্ন হইল,—যদি কখনো দেশ আমাদের স্বাধীন হয় এবং স্বদেশী সরকার জাতিভেদ-প্রথা দূর ক'রে দেবার জন্য অসবর্ণ বিবাহ, ভিন্ন জাতিতে বিবাহ, ভিন্নভাষীর সঙ্গে বিবাহ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ বাধ্যকর করেন? তাহ'লে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশ ত' স্বাধীন একদা হবেই। স্বাধীনতা লাভের জন্য এখন যে সকল আন্দোলন চলছে, তার একটাও মিথ্যা হ'য়ে যাবে না। দীর্ঘকালের ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম ও ক্লেশ-সহন যথাকালে তার ফল প্রসব কর্ব্বেই। কিন্তু বাধ্যকর-জাতিভেদ-বিদূরণের জন্য কোনও উন্মুক্ত বা উলঙ্গ আইন কোনো স্বদেশী সরকারও বোধ হয় কত্তে পার্ব্বেন না। রোমান যুবকেরা যদি জোর ক'রে দুনিয়ার সব স্যাবাইন মেয়েদের ধর্ষণ ক'রে বিবাহ করে, তাতে রোমানদের দেশে কি বিশেষ অভ্যুন্নতি ঘটবে? সব জাতি সব জাতির মেয়েকে বিয়ে কর্ল, কিন্তু সন্তানেরা বহন ক'রে বেড়াল পিতার জাতিত্বের পরিচায়ক বংশোপাধিটী। জাতিভেদের জড় মরল কি? অমুসলমান ব্যক্তি মুসলমান হ'লে তার পুরাতন নামগোত্র সব ভুলতে হয়, একটী আরবীয় ভাষায় রচিত সুন্দর নাম তাকে দেওয়া হয়। এর ফলে ভারতেরই বংশধর কোটি কোটি মানুষ ভুলে গেছে যে, ভারত তাদের পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি; তাঁরা মনে কচ্ছে, ইরাণ, তুরাণ, ইস্পাহানের বড় বড় বীর সৈনিকদের তারা বংশধর এবং ভারতের প্রতি তাদের থোড়াই কর্ত্তব্য রয়েছে।

কেমন, জাতিভেদ দূর হ'য়েও জাতীয় জীবনে শক্তিসঞ্চার হ'ল কি? জাতিভেদ যদি দূর কত্তে হয়, তবে শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নিয়ে কথা কেন? কথাটাকে ব্যাপক ক'রে ইংরেজ, নিগ্রো, ইয়াঙ্কি, হটেনটট, জার্ম্মাণ, নাগা, ভোট, খাশিয়া, কাইফেং, মনসুং, রিয়াং, স্প্যানিশ, পর্টুগীজ, ফরাসী ইত্যাদিতেও বিস্তারিত হবে না কেন? পৃথিবীর সব জাতিকে এক কত্তে হ'লে সব জাতির মধ্যেই শুক্রশোণিতগত সংমিশ্রণ প্রয়োজন হবে। শুধু, একটা দেশের মধ্যে এই জাতিভেদরাহিত্য বদ্ধ হ'য়ে থাকবে কেন? পারস্পরিক ভাষাশিক্ষার প্রভাবে নানা জাতির ভিতরে ভাব-পার্থক্য দূর হবে এবং তার ফলে নানা জাতির মিশ্রণে বিচিত্র এক নূতন জাতির আবির্ভাবও অসম্ভব নয়। তথাপি কোনও দেশ স্বাধীন হয়েছে ব'লেই স্বাধীনতার অপব্যবহার ক'রে সর্ব্বজাতিকে বাধ্যকর ভাবে সর্ব্বজাতির সঙ্গে বিবাহিত হবার আইন প্রণয়ন কত্তে পারে ব'লে আমার ধারণা হয় না। গুরুতর সংগ্রাম-সঙ্কট-কালে পুনঃ পুনঃ লোকক্ষয় হ'তে হ'তে দেশের জনসংখ্যা ভয়ঙ্কর রূপে ক্ষীয়মাণ হ'তে থাকলে জারজ সন্তানকে পর্য্যন্ত জন্মের দিক্ দিয়ে কুলীনের মর্য্যাদা দেওয়া হ'তে পারে, এমন কি একই ব্যক্তির বহু নারী বিবাহ পর্য্যন্ত সমর্থিত হ'তে পারে কিন্তু কে কাকে বিয়ে কর্ব্বে কিম্বা কে কাকে বিয়ে কর্ব্বে না, তার সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ভার কদাচ আইন-রচয়িতাদের হাতে আসবে না, আসতে পারে না। জাতিভেদ-প্রথা কিসের উপরে

নির্ভর ক'রে বেঁচে আছে, বল ত। নিজ নিজ জন্মগত কৌলীন্য-বোধের উপরে। একজন মুচির ছেলে একজন মেথরের মেয়েকে নিশ্চয়ই বিয়ে কর্ব্বে না এই কারণে যে, সে মুচি জাতটাকে মেথর জাতের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করে। একজন ধোপার ছেলে একজন কপালীর মেয়েকে বিয়ে কত্তে রাজি হবে না। শুধু এই যুক্তিতে যে, তার নিজের জাতি কপালীদের জাতির চেয়ে হয়ত উৎকৃষ্ট। একই যুক্তিতে একজন ব্রাহ্মণের ছেলে অব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে কত্তে চায় না বা একজন বৈদ্যের ছেলে একটী শূদ্র-কন্যার পাণিগ্রহণে আগ্রহী হয় না। যে নিজেকে যত বড় মনে করে, সে নিজেকে তার চাইতে ছোটর সঙ্গে বৈবাহিক মিলনে মিলিত হ'তে দিতে চায় না, তবে নিজের চাইতে যাদেরকে জাতিতে সে বড় ব'লে মনে করে, তার দিকে তার লোভাতুরদৃষ্টি নিশ্চয়ই থাকে। শূদ্র-পুত্র ব্রাহ্মণ-কন্যাকে প্রাংশুলভ্য জ্ঞান করে শুধু এই জন্য যে ব্রাহ্মণ জাতটাকে শূদ্র জাতের চেয়ে তার বড় ব'লে মনে হয়। এই বড়ত্ব আর এই ক্ষুদ্রত্ব সবই ত' মনের গৌরব-বোধ আর অগৌরব-বোধের ব্যাপার। মনের এই বোধটাকে যে দূর ক'রে নিতে পারে, তার পক্ষে সমাজের গড়া প্রচলিত দেওয়াল টপ্‌কে যাওয়া অতি সাধারণ ব্যাপার। সুতরাং জাতিভেদকে দূর কত্তে হ'লে আইনের তত প্রয়োজন নেই। যত প্রয়োজন হচ্ছে প্রতি জীবের নিজ নিজ অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মানুভূতির অনুশীলন এবং অন্য জাতির

প্রতিটি মানুষের ভিতরে ঐ একই ব্রহ্মের নিত্যাবস্থান-চিন্তন। প্রকৃত প্রতিকারের স্থান হচ্ছে মনে, আইনের অঙ্গনে নয়। সাত শত বৎসর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তেজস্বী ব্যক্তিদের কোষমুক্ত তরবারির আস্ফালন দেখেও ভারতের হিন্দুরা সবাই মুসলমান হ'য়ে যায় নি, আজ তবুও ভারতের হিন্দুরই সংখ্যাধিক্য, এই একটী তথ্যের দ্বারাই একথা পরিষ্কার হবে যে, বলপূর্ব্বক কিছু কিছু কাজ মানুষের অনিচ্ছায় করিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু বলপূর্ব্বক সবাইকে সব কাজে বাধ্য করা যায় না। স্বাধীন দেশেরই হোক্ বা পরাধীন দেশেরই হোক্ কোনো দেশেই কোনো কালে সমগ্র জাতির ভিতরে সঞ্চিত সুসংস্কার বা কুসংস্কার গায়ের জোরে দূর করা যায় না, তা' দূর করার উপায় হচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে পদ্ধতিবদ্ধরূপে ক্রমানুযায়ী ও সুপরিকল্পিত শিক্ষা ও ভাবধারা অবিরাম অবিশ্রাম প্রচার ক'রে যাওয়া।

বলপূর্ব্বক জাত্যন্তর গ্রহণ করানোর কূটকৌশল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিম্নতর জাতীয় ধনী ব্যক্তিরা অনেক সময়ে দরিদ্র উচ্চজাতীয় লোকদিগকে ঋণে আবদ্ধ ক'রে সমগ্র বিষয়-সম্পত্তি নিলামে চড়িয়ে দিয়ে বিপৎ-ত্রাণের সর্ত্তে উচ্চজাতীয় লোকের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। ইহা এক প্রকারের বলপ্রয়োগ। নিম্নজাতীয়

বা ভিন্নজাতীয় ধনীরা দেশের সমস্ত শস্য গোপনে ক্রয় ক'রে গুদামে আবদ্ধ ক'রে দেশব্যাপী কৃত্রিম দারিদ্র্য সৃষ্টি ক'রে সেই দারিদ্র্যের তাণ্ডবের দ্বারা জনসাধারণের বুদ্ধিবিভ্রম ও শক্তিবিনাশ ঘটিয়ে এই দুর্য্যোগের দিনে অলভ্যা নারীদেরও নিজেদের বধূ ক'রে নিয়ে পাইকারি হারে জাতিভেদ বিলোপের চেষ্টা কত্তে পারে। কিন্তু এটাও প্রকৃত প্রস্তাবে বল প্রয়োগই বটে। জাতিভেদের প্রতি শ্রদ্ধা নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ এবং ভিন্ন জাতির প্রতি হীনত্ব-আরোপ-রূপী বৈষম্যবোধ থাকারই দরুণ। প্রথম বিচারে ওটা সমর্থন-যোগ্য হ'লেও দ্বিতীয় বিচারে ওটা নিন্দার্হ হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্কট-কালে দুশ্চরিত্র ইন্দ্রিয়পরায়ণেরা নানা অঘটন ঘটিয়ে হাজার হাজার নারীকে স্বপথচ্যুত ক'রে দিতে পারে এবং এরূপ ঘটনা জগতে নানা স্থানে এবং ভারতেও বহু স্থানে বহুবার ঘটেছে। এইরূপ ঘটনার পরে আস্তে আস্তে নূতন ক'রে সমাজ-বিন্যাস ঘটেছে কিন্তু জাতিতত্ত্ব-সম্পর্কিত পুরাতন প্রথাই যে আবার ফিরে ফিরে এসেছে, এটাই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কত ইহুদীর মেয়ে প্রসব করেছে মুসলমান, কত খ্রীষ্টানের মেয়ে প্রসব করেছে হিদেন, কত হিন্দুর মেয়ে প্রসব করেছে অন্ত্যজ নীচ জাতি অথবা একেবারেই বিধর্ম্মী। তারপরেও পুরাতন সমাজ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাতে মনে হয় যে, পুরাতনের ভিতরেও কোথাও একটা শাশ্বত সত্য প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এমন ঘটনা পুনরায় হয়ত ঘটতে

পারে যখন একদল উন্মত্ত কামুক তরবারি হস্তে দেশের সব পুরুষকে নিধন ক'রে তাদের কন্যা, ভগিনী, জায়াদিগকে পাইকারি-হারে ধর্ষণ কর্ব্বে শুধু এই কদর্য্য উদ্দেশ্য নিয়ে যে, দেশটার স্বজাতীয়ত্ব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাক্ এবং ভবিষ্যতের সন্তানেরা প্রত্যেকে ধর্ষণকারীদের স্বভাব, চরিত্র, জাতিগত বিশিষ্টতা ও দিগ্বিজয়ের পতাকা হাতে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হোক্।

পৃথিবীতে যতকাল যুদ্ধ নামক মহাদৈত্য থাক্‌বে, ততকাল এরূপ ঘটনা বারংবারই ঘটতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বহুবারই ঘটেছে কিন্তু কেউ তার বৃত্তান্ত লিখে রাখে নি, রাশিয়ার মানুষের কপাল-করোটির গঠনে এবং ভারতের মানুষের নানা প্রকারের নৃতাত্ত্বিক বিশেষত্বে সেই কথার প্রচ্ছন্ন প্রমাণ রয়ে গেছে।

স্থিতপ্রজ্ঞের দেশসেবা

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে বহু যুবকের সমাগম ঘটিয়াছে।

একজন প্রশ্ন করিল,—দেশের সেবা কত্তে চাই কিন্তু প্রাণে আনন্দ পাই না। দেশসেবা যে আমার মুখ্য কাজ, তা' আমি বুঝি। কিন্তু মনের আনন্দ আসে না কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশসেবাই তোমার মুখ্য কাজ এই জন্য যে, তুমি সমগ্র জগতেরও একজন একনিষ্ঠ সেবক। কেবল নিজের দেশের কুশলের জন্য যে সেবা করে, সে

যদি নিষ্কাম, নির্লোভ, হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ হয়, তাহ'লে তার প্রতিটি কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ। কিন্তু দেশকে ভালবাস ব'লে যদি বিদেশকে বিদ্বেষ কর, দেশকে সেবা দাও ব'লে যদি হিংসা-দ্বেষের চর্চ্চা কর, তবে ত' তোমার বিচার-বিবেক-বুদ্ধি সবই আস্তে আস্তে তমসাবৃত হবে, আত্মপ্রসাদ তোমার আস্‌বে না। ধন, মান, যশ, প্রতিপত্তি নয়, প্রকৃত দেশসেবার প্রধানতম পুরস্কার হচ্ছে আহ্লাদিত চিত্তের নির্ম্মল সন্তোষ। চরিত্রবান্ মানুষের পক্ষেই এই জিনিষটী সুলভ, অন্যের পক্ষে প্রাংশুলভ্য। ছল, চাতুরী, কপটতা, মিথ্যা, অন্যায়, জুলুম ও দৌরাত্ম্য আমার আচরণে বা মননশীলতায় থাক্‌বে না, তবে ত' আমি স্থিতপ্রজ্ঞ হ'য়ে কাজ কত্তে পার্ব্ব। ভারতীয় কর্ম্মযোগের আদর্শ নির্জ্জন অবসর-যাপনের নয়। শুচি চিত্তে, শুদ্ধ মনে, শুদ্ধ শরীরে, শুদ্ধ উপায়ে সৎকর্ম্মান্বিত থাকা চাই। স্থিতপ্রজ্ঞের দেশসেবাই প্রকৃত দেশসেবা। সে তার স্বদেশকে সেবা দিতে গিয়েই তার আচরণের বিশ্বজনীনতা ও অনুশীলনের উদারতা দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে নানা প্রকারে লাভবান্ করে। একজন অকৃত্রিম দেশসেবক সেই একটী মাত্র দেশ-বিশেষেরই অলঙ্কার নয়, সে সমগ্র বিশ্বের পক্ষে গৌরববর্দ্ধক এক সুদুর্লভ রত্ন!

প্রলোভন দমনের উপায়

একজন প্রশ্ন করিল,—নানা প্রলোভনে মন টলে যায়, লক্ষ্য স্থির রাখ্‌তে পারি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সতর্ক থাক, Alert থাক, Cautious থাক এবং Self-Confident থাক। প্রলোভন কখনো একদিনের আকর্ষণে মানুষকে কাবু কত্তে পারে না, সে সাপের বিষের মতন আস্তে আস্তে নিজেকে বিস্তারিত করে। প্রথমে শরীরের একটী অংশে দংশন দ্বারা এই বিষ সংক্রামিত হয়, তারপর রক্তের গতির সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্মতল দিয়ে বেয়ে বেয়ে ক্রমশঃ সমগ্র শরীরকে আচ্ছন্ন করে। সমগ্র দেহকে আচ্ছন্ন করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হস্তকৌশল বা চাপট-চিকিৎসা দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিষ নামানো যায়। প্রলোভনও প্রথম দিন একটু বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় চক্ষু একটু ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে তার দীপ্তি ততটা প্রখর নয়, ততটা ক্ষণস্থায়ীও নয়, সে একটু সময় বেশী নিল। সে একটু ঠাণ্ডা মেজাজের সৌন্দর্য্য দিয়ে আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। তৃতীয় দিন সে আরও সরল, আরও সহজ, আরও স্বাভাবিক হ'য়ে তোমার গায়ে একটু স্পর্শ বুলিয়ে গেল। চতুর্থ দিন সে তার নাসিকার সুরভি উষ্ণ নিঃশ্বাসটুকুর স্পর্শ তোমার বুকের পাজরের উপরে দিয়েই হঠাৎ অন্তর্হিত হ'ল। এতদিন যে এত কাণ্ড ক'রেও তোমাকে আকর্ষণ কত্তে পারে নি, সে আজ তার সহজ সারল্য দিয়ে তোমার কতকটা যেন অন্তরঙ্গ হ'য়েই হঠাৎ বিরহের সৃষ্টি ক'রে তোমার মনের উপরে সম্মোহন বিস্তার কর্ল্ল। পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে হঠাৎ সে এসে তোমার কৌপীন-বন্ধনে তার অঙ্গুলী-চালনা শুরু কর্ল্ল, তুমি লজ্জায়, সঙ্কোচে, অপ্রত্যাশিত এই ব্যাপারে

হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলে, এবং দু-চার দিন মধ্যেই কবে তুমি কোন্ অতলের তলে ডুবে গেলে, তার আর কোনো নিশানা রইল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তি কদাচ বিপদে আত্মরক্ষা কত্তে পারে না। তাই, তুমি অগাধ সলিলে ডুবে যেতে বাধ্য হ'লে। এই হ'ল প্রলোভনের প্রকৃতি। সুতরাং প্রলোভন দেখ্লে ভয় পেয়ে যেও না। বিন্দুমাত্রও ভীত না হ'য়ে সর্ব্বদা সজাগ থাক, আতঙ্কগ্রস্ত না হ'য়েও সতর্ক থাক, তুমি যে বীর, তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য চেষ্টিত থাক। তুমি যে বিশ্বের সমস্ত প্রলোভনকে জয় করার সামর্থ্য রাখ, এই আত্মবিশ্বাসটীকে অন্তরের ভিতরে অনির্ব্বাণ রাখ। এই বুঝি পড়লাম, এই বুঝি মরলাম, এই ভেবে দুশ্চিন্তা কত্তে লেগে গেলে নিজেই নিজেকে পঙ্গু ক'রে ফেলবে যে! আমার পতন নেই, আমার ব্রতচ্যুতি অসম্ভব, আমার মৃত্যু নেই, আমি চির-অবিনাশী বিশ্বাত্মার সঙ্গে এক ও অভেদ, কারো সংস্পর্শ আমাকে পতিতে পরিণত কত্তে পারে না, আমার সংস্পর্শে এসে সকল পতিতের অভ্যুদয় ঘটে এবং ঘটবে অতএব আমার ভয় করার কি আছে,—এই ভাবে মনকে শিক্ষা প্রদান কর্ব্বে। মনকে তোমার অধীন কর, মনের অধীন হ'য়ো না।

অবাস্তব কল্পনার কুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাকে তুমি প্রলোভন বা

প্রলোভনের কারণ ব'লে মনে কচ্ছ, অধিকাংশ সময়েই তার সম্পর্কে তোমার মানসিক অনুমান যথার্থ না হ'তে যে পারে, এই কথাটি মনে রেখ। একটি মেয়ে বিকেল বেলা সাড়ে চারটার সময় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আয়নার সম্মুখে নিজের চিকুর-বিন্যাস করে, আর তুমি ভাবতে বস্‌লে যে, সে তোমাকে তার নিরাবরণ সৌন্দর্য্য দেখাবার জন্য এই কাজটা করে,—এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা কেবল মাথা-পাগলের পক্ষেই স্বাভাবিক। একটি মেয়ে বেলা দশটার সময়ে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রত্যহ রাস্তায় চলমান লোকদের ভিড় দেখে এবং কখনো কখনো মৃদু হাস্য করে, এটা যে তোমাকে দেখাবার জন্যই করে বা তোমাকে দেখেই করে, এমন ধারণা ক'রে ক'রে নিজেকে ক্লান্ত করার মতন বোকামি আর কিছু হ'তে পারে না। একটী মেয়ে বিকেল পাঁচটায় একটী গোলাপ ফুলের তোড়া হাতে রোজ ইডেন উদ্যানে বেড়াতে যায়, সে যে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যই সারাদিন ছট্‌ফট্‌ করে এবং তার পরে বিকেল বেলা তোমার তল্লাসে ঐ স্থানে গিয়ে তোমাকে না পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আবার ঘরে ফিরে এসে তোমার জন্যই কতক্ষণ কাঁদে, এসব বাজে কল্পনার প্রশ্রয় দিয়েই ত' অধিকাংশ কিশোর নিজেদের জীবনকে মেঘাচ্ছন্ন এবং যৌবনকে কণ্টকাকীর্ণ করে। অবাস্তব কল্পনার রাস্তায় কখনও যেও না; কারণ,

এমন পণ্ডশ্রম আর ব্যর্থ অধ্যবসায় আর কিছু হ'তে পারে না। শুধু ছেলেরাই মেয়েদের সম্পর্কে এই রকম কল্পনার জাল বোনে আর মেয়েরা ছেলেদের সম্পর্কে এই রকম অকারণ কল্পনা করে না, তা নয়। এই রূপ কল্পনায় ডুবে যাওয়া যৌবনের একটী স্বভাব, যা' প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই দু-চার বার আসে এবং যায়। বুদ্ধিমানেরা দুচার দিন-মধ্যেই এসব বাজে কল্পনাকে কাণ পাক্‌ড়ে দূর ক'রে দেয়, নির্ব্বোধেরা এক একটী মিথ্যা কল্পনায় ম'জে গিয়ে জীবনের অনেক সর্ব্বনাশ ঘ'টে যাওয়ার পরে হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায়। কোনো কোনো হতভাগ্য চিরজীবন ঐ এক খোয়াবের পিছনে ঘুরে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে এই ত্রিকালের সকল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ ক'রে দেয়। সেই ভুল তোমরা ক'রো না। মনে মনে বিশ্বাস রাখ যে, জগতে কোনো প্রলোভনই তোমাদের দলন কত্তে পারবে না। তোমাদের লক্ষ্য দেশ-সেবা, সমাজ-সেবা, জগতের সেবা। তার মধ্যে জীবনের বা চিন্তার পঙ্কিলতার কোনো স্থান নেই। কেউ একজন তোমার প্রতি প্রেমানুরক্ত বা প্রেমানুরক্তা, এই কথাটী ভাববার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি চিন্তা মানুষের মনে আসেই আসে, যা' দৈহিক ভাবে ব্যভিচার না হ'লেও মনকে ব্যভিচারী ক'রে তোলে। কেউ একজন প্রেমানুরক্তা, মনে মনে এই চিন্তাটীকে প্রশ্রয় দিলে প্রেমের চূড়ান্ত পরিণামে কি ব্যাপার ঘটতে

পারে, তার চিত্রও মনের মধ্যে ইচ্ছার অনভিপ্রায়েই এসে যায়। প্রকৃত সাধু ব্যক্তি এতে শান্তি বা স্বস্তি বোধ কত্তে পারে না। তোমাকে তোমার গৃহীত সৎপথ থেকে বিচলিত করার কার কি দায় ঠেকেছে যে, তোমার প্রতি তাকে প্রেমানুরক্ত হ'তেই হবে? অনেক সময়ে অনেকের নিতান্ত নিরীহ নিষ্পাপ আচরণকে অভিসারের আমন্ত্রণ ভেবে কত বোকা মানুষ যে জীবনে চরম ঠকা ঠকেছে, তার সীমা-সংখ্যা নেই। কীটকুল যেমন ছোট্ট একটী পাত্রের মধ্যে সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে শেষটায় স্থানাভাবে নিজেদের উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে কেবল কিলিবিলি কত্তে থাকে, অগণিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই ছোট্ট পৃথিবীটার মধ্যে ঠিক সেই রকমই একটী কুদৃশ্য ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। এমন কিলিবিলি অবস্থার মধ্যে কে কার গায়ে একটু হাত ছোঁয়াল, কে কার আঁচল ধ'রে একটা টান মারল, তাই নিয়ে প্রত্যেকটী মানুষের প্রতিটি অসতর্ক আচরণের কামতত্ত্বানুযায়ী বিপুল ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কল্লে, দুর্লভ মানব-জীবনটা বৃথা ক্ষেপণের সুযোগ মিলতে পারে বটে, কিন্তু জীবনের সার্থকতার দিক দিয়ে একটী কাণাকড়িও সঞ্চিত হয় না। অশ্লীল সাহিত্যের সুনিপুণ রচয়িতাদের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষের যৌন মনস্তত্ত্ব পড়তে পড়তে তোমাদের মনের ভিতরে এমন কে ব্যাধির সঞ্চার হয়েছে যে, তোমরা

ভিন্নলিঙ্গী মানুষদের মনগুলিকে কামকদর্য্যতার কল্পলতা ব'লে জ্ঞান কর এবং যত লোকের সংস্পর্শে আস, সকলেরই মনের কথা আন্দাজে আঁচ ক'রে নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা কর। এর ফলেই তোমাদের প্রলোভন-দমনের ক্ষমতা দিনের পর দিন ক'মে যাচ্ছে। অন্য কাজ কর আর না কর, এই সব উপন্যাস পড়া তোমরা যতটা পার বন্ধ কর। মনুষ্য-জীবনের পৌরুষ ও বীর্য্যবত্তার একটা দিক আছে, যেটী উজ্জ্বল, উদার ও আত্মশক্তিপ্রবদ্ধক। তোমরা তার দিকে নজর দাও।

বই পড়া

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বইপড়া একটা ভাল কাজ। সুতরাং নিরক্ষরতা বিদূরণের জন্য যে যে সমিতি বা সঙ্ঘ কাজ কচ্ছেন, তাঁরা খুব ভাল কাজ কচ্ছেন। কিন্তু বই পড়তে শিখেই যদি নূতন পড়ুয়ারা কাম-কলঙ্কিত কুৎসিত সাহিত্য-সমূহ পড়তে অধ্যবসায়-সহযোগে লেগে যায়, তবে তার ফলে জাতীয় পৌরুষের উদ্দীপ্তি ঘটবে বা দেশের মানুষের মনের পাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হ'য়ে পুণ্যের প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হবে, এমন আশা ত' করা যায় না বাছারা! শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণ তাহ'লে আর মস্ত একটা ভাল কাজ হ'তে পারল না। নিরক্ষরকে সাক্ষর করার সাথে সাথে সৎসাহিত্যে তার রুচি বৃদ্ধির চেষ্টা কত্তে হবে। অনেকে

অনেক বই পড়ে। কিন্তু একটা ভাল কথাও মনে রাখতে পারে না। অনেকে দুচারখানা বই পড়ে কিন্তু পড়ার মত পড়ে এবং ভাল ভাল কথাগুলি মনে রাখে, দুটি চারটী ভালকথাকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার কল্পনা করে, চেষ্টা করে, সফলও হয়। সুতরাং বই পড়া খুব বড় কথা নয়, ভাল বই পড়া এবং ভাল ক'রে পড়া বড় কথা। অনেক গদ্য বই থাকে, যা' কবিতার চেয়েও মধুর এবং অমৃতের চেয়েও অধিকতর নবজীবন-বিধায়ক। অনেক পদ্য বই থাকে, যার পদ্য গদ্যের চেয়েও দুরূহ ও দুষ্পাচ্য। গদ্য-পদ্যের বিচার বিতর্ক ছেড়ে দিয়ে সেই বই মাত্র পড়া এবং পড়ান উচিত, যাতে দুর্ব্বল বল পায়, পতিত লাভ করে উত্থানের সামর্থ্য, হতাশ পায় আশা আর চরিত্রহীন ফিরে পায় চরিত্রধনের মত দুর্লভ রত্ন।

কাজকর্ম্ম ও ধ্যানজপ

একজন প্রশ্ন করিল,—কাজকর্ম্ম বেশী করলে ধ্যানজপের সময় পাই না, ধ্যানজপ বেশী করলে কাজকর্ম্মে আসে আলস্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাজকর্ম্মের সময়ে কাজকর্ম্ম কর্ব্বে, মনে মনে একটু খেয়াল রাখবে যে, সকল কাজকর্ম্মের চড়ান্ত উদ্দেশ্য জীবনকে সফলতার সঙ্গে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত

করা। ধ্যানজপের সময়ে ধ্যানজপ কর্ব্বে, কিন্তু একথা মনে রাখবে যে, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের দায়িত্বভার তুমি অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিস্তার পেতে চাও না। তুমি সারাদিন ধ্যানজপ কর্ব্বে ব'লে দুনিয়ার লোক চাঁদা তুলে তোমার সংসারের খরচ চালাবে, এটি হ'তে দিতে পার না। তুমি কাজকর্ম্ম করবে ব'লে ধ্যানজপে আদৌ বসবে না এবং নিজের আত্মাকে এইভাবে উপবাসী রেখে অনাহারে মেরে ফেলবে, এটাও হ'তে পারে না। তোমার জীবনে কর্ম্ম ও ধ্যান উভয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া চাই। কর্ম্ম কর্ব্বে অন্তরের ধ্যানদৃষ্টি অব্যাহত রেখে, ধ্যান কর্ব্বে প্রয়োজনমত কর্ম্মের দায়িত্ব নিজ পৌরুষে প্রতিপালন কত্তে কত্তে। সৈনিক যখন যুদ্ধক্ষেত্রে রণোন্মত্ত, তখনও কি সে ঈশ্বর-স্মরণ করে না? যোগী যখন যোগাভ্যাস-রত, তখনো তাঁকে ভৌম কর্ত্তব্যের দায়িত্ব পালন কত্তে কত্তেই যোগ-পথে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হবে। দুটীরই সামঞ্জস্য চাই। একটীকে বাদ দিয়ে অপরটী একা একা চলতে পারে না; কারণ, তাতে দেশের অর্থনৈতিক অমঙ্গল আসতে পারে।

কামোত্তেজনার প্রতীকার

একটি যুবক বলিল,—সারাটি দিন কামোত্তেজনায় কাটে। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি বাবামণি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুধু তুমি কেন, পৃথিবীর প্রায়

অধিকাংশ মানব-মানবীর সারাদিনের সারারাতের অধিকাংশ চিন্তাই কাম-সম্পর্কিত হ'য়ে থাকে। কারণ, মুখ্যত মানুষ একটি রক্তমাংসের গড়া চেতনাযুক্ত পাশবপিণ্ড। একটি মানুষের দেহের শতকোটি জীবকোষের প্রত্যেকে কেবল সুদৃঢ় সম্ভাবনা খুঁজে বেড়াচ্ছে যে, সে একটি আলাদা মানুষ-রূপে জন্মগ্রহণ ক'রে কবে নিজ বংশবিস্তারের কাজে লাগ্‌তে পারবে। প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার দেহের লক্ষকোটি জীবকোষের মধ্যে প্রত্যেকটির এই ক্ষমতা আছে যে, যদি কোনো প্রকারে উপযুক্ত অবস্থায় কোনও একটি মাতৃগর্ভের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দশ মাস দশ দিন কাটিয়ে দিতে পারে, তবে সে ঠিক তোমারই অধিকাংশ দোষ-গুণের অনুরূপ একটা দেহকে মত্ত হুঙ্কারে ধরণী কাঁপিয়ে চীৎকার ক'রে ঘোষণা কত্তে পারবে যে, সেও একটা মানুষ, সেও একটা বংশের আদি পিতামহ, সেও একটা সভ্যতার ধারক, বাহক ও প্রসারক। এই যে একটা অত্যদ্ভুত সম্ভাবনা প্রতিটি মানব-মানবীর দেহ-কোষগুলির প্রত্যেকটীতেই পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে, তোমার সারাদিনের ও সারারাতের যাবতীয় কামচিন্তার মূল উৎস সেখানে। এই কামাতুরতাকে দূর কত্তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তোমার স্পষ্ট ক'রে এই কথা উপলব্ধি করা যে, এসবই হচ্ছে পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় লীলা-প্রকাশের একটা অংশ মাত্র, যার পুরাটুকু তুমি দেখ্‌তে পাও নি ব'লে বুঝ্‌তেও পাচ্ছ না। সর্ব্বচিন্তার আকর-স্বরূপ সেই চিন্তামণির চিন্তায়

নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারলেই কাম রূপান্তরিত হ'য়ে গেল প্রেমে,—অকপট, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক প্রেমে,—যেই প্রেমে সব আছে কিন্তু দেহ নেই, দেহ থাকলেও থাকে না দেহ-ভোগ, ভোগ থাকলেও নাই তার প্রতিক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এলেও তার স্বরূপ বিশ্বালিঙ্গনকারী পরমা-প্রীতি, যা' হিংসা-দ্বেষ-লোভ-ক্রোধাদি অনর্থ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এই দুরূহ তত্ত্ব যুক্তি আর তথ্য দিয়ে বুঝাও যায় না, বুঝানও যায় না কিন্তু ভগবৎ-প্রেমের ভিতর দিয়ে যার বিশুদ্ধ বিকাশ এবং যার বিকাশে কামের দুর্গন্ধ দূর হ'য়ে গিয়ে প্রেমের সৌরভে জগৎ হয় আমোদিত। মোট কথাটি এই যে, ভগবৎ-চিন্তার মত কাম-প্রতিষেধক উপায় জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

স্বদেশ-প্রেমের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারপরেই স্থান হচ্ছে স্বদেশ-প্রেমের। স্বদেশ-প্রেম যদি কারো হয় প্রদীপ্ত প্রখর, তাহ'লে কামচিন্তা তার কাছেও ঘেঁষতে পারে না। স্বদেশপ্রেমও আছে, কামের চর্চ্চাও চল্‌ছে এই রকম দৃষ্টান্ত যদি কোথাও দেখ, এক কথায় বুঝে নেবে যে, স্বদেশ-প্রেমটার ভিতরে কিছু ঘাটতি আছে। স্বদেশপ্রেম মানুষকে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দেয়, আর আত্মোৎসর্গের প্রেরণা যৌন সুখভোগের কামনাকে একেবারে স্তব্ধ ক'রে দেয়। ফাঁসীর কাঠ যার ধ্যানময় বিগ্রহ, সে কামের খোয়াব আর প্রণয়ের স্বপ্ন দেখবে কেমন ক'রে?

খেলাধূলা ও কামদমন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারপরেই স্থান দিতে হয় খেলাধূলার প্রতি অনুরাগকে। খেলাধূলার সময়ে কারো কামচিন্তা থাকে না। কামচিন্তা হচ্ছে অলসের অবসর-যাপনের জিনিষ। কর্ম্মী ও কর্ম্মরত পুরুষের কামচিন্তার অবসর কোথায়?

অতিকামার্ত্ত নরনারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণতঃ ব্যায়াম-চর্চ্চায়, যৌগিক আসন-মুদ্রার অনুশীলনে, স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনায়, খেলাধূলার উৎসাহে, অধিকাংশ লোকেরই প্রদীপ্ত কাম নিমেষে নিষ্প্রভ হ'য়ে একেবারে নিরাপত্তা-সীমায় এসে যায়। কিন্তু কতকগুলি ছেলে এবং কতকগুলি মেয়ে জন্ম থেকেই ভোগেন্দ্রিয়ের গঠনে বা মস্তিষ্কের পরিণতিতে এমন সব অসম্পূর্ণতা বা বাহুল্য নিয়ে আসে, যার দরুণ তাদের কামকে কোনো সদুপায় দিয়েই স্তব্ধ করা যায় না। তাদের অনেকের জননাঙ্গে, কারো কারো মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার ক'রে আরোগ্যের ব্যবস্থার কথাও বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা ভেবে থাকেন। এমন সব ছেলেরা দুরন্ত কামের তাড়নায় হাজার হাজার মেয়েকে কুপথে পরিচালিত ক'রে তাদের সর্ব্বনাশ করে, এমন সব মেয়েরা দিগ্বিজয়িনীর মত গর্ব্বভরে পাদচারণ কত্তে কত্তে

জীবন ভ'রে যত পুরুষ-মুণ্ড পায়, সব চর্ব্বণ ক'রে ক'রে হর্ষে বিগলিত-তনু হয়। অনেক ক্ষেত্রে শরীরের যন্ত্রবিশেষের অপূর্ণতা বা অতিপূর্ণতার দরুণ এই মনোবিকার না জন্মে দেশের কথা-সাহিত্যিকদের কপোল-কল্পিত নানা কদর্য্য সাহিত্য পাঠের ফলেও জন্মে। কোনো দেশ অধঃপাতের দিকে যাচ্ছে কিনা, জান্‌তে হ'লে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করাই যথেষ্ট। একই নারী শত পুরুষেও তৃপ্তি পায় না, একই পুরুষ শত নারীতেও তুষ্ট নয়, এই অবস্থা একেবারে পশু-জীবনের দৈনন্দিনী। পশু থেকেই আমরা মানুষ হয়েছি কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর উচ্চাভিমুখে অভিব্যক্ত হ'য়ে তারপরে আবার পশুত্বের দিকে গতি ফেরান আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে কি?

গণ্ডী-লঙ্ঘন করিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতীব প্রবল কামের দুরতিক্রম্য উৎপাত কখনো যদি অন্তরে অনুভব কর, তাহ'লে কড়া দাওয়াই দিয়ে, কড়া-মিঠে দাওয়াই দিয়ে, কখনো বা সুমিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ ক'রে, অর্থাৎ যখন যে-ভাবে যতটুকু পারা যায়, তাকে দমন কর্ব্বার চেষ্টা ক'রে যেতেই হবে। কামচর্চ্চা ক'রেই কামকে দমন কত্তে যদি হয়, তবে নিজ নিজ বিবাহিত স্বামী বা নিজ নিজ বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে তার গবেষণা কর। গবেষণার জন্য এই গণ্ডীর বাইরে পদক্ষেপ কেউ কখনো ক'রো না। কথা-সাহিত্যিকদের লেখার ঢংয়ে প্রলুব্ধ হ'য়ে অনেক মূর্খ বিবাহ-গণ্ডীর বাইরে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা কত্তে

যায় কিন্তু তার ফল প্রতিটি ক্ষেত্রেই হয় বিষময়। বিজ্ঞান-চর্চ্চার নাম ক'রে ব্যভিচারকে কখনো প্রশ্রয় দিও না।

সদাপুষ্করিণী (রংপুর)
২৩শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৪২
(৫ই এপ্রিল, ১৯৩৬)

রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি সদাপুষ্করিণী গ্রামে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়াছেন। এখানে সাক্ষাৎকার হইল প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভক্তি-গদ্‌গদ বিনীত ভাব দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বড়ই প্রীত হইলেন। উভয়ের মধ্যে কলিকাতায় পরিচয় ছিল।

হিন্দু-সমাজের ভবিষ্যৎ

বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—আপনার মতে হিন্দু-সমাজের ভবিষ্যৎ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হিন্দু-সমাজের অতীত কি ছিল এবং বর্ত্তমান কি হচ্ছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ছাড়া ত' ভবিষ্যৎ বলা কখনও সম্ভব নয়। হিন্দু-সমাজ খণ্ড খণ্ড হ'য়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। সবাইকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধবার সূত্রটি কি, তারও ত' নির্ভুল তথ্য নির্ণয় প্রয়োজন। যাঁরা

হিন্দু-সমাজের পরিবর্ত্তন চান, তার মধ্যে একদল বলছেন,—"বহু জাতি তুলে দাও"। আর একদল বলছেন,—"বহু প্রতীক বর্জ্জন কর।" কারও বিশ্বাস, হিন্দুরা একটা জাতি হ'তে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। কেউ ভাবছেন,—বহু প্রতীক বর্জ্জন ক'রে এমন একটী প্রতীকের মধ্য দিয়ে যদি সকলের সর্ব্ব উপাসনা সুসম্পন্ন হ'তে পারে, যাতে সকলের শ্রদ্ধা বা যাতে সবকিছুই আছে, তাহ'লে জাতিভেদ দূর হোক্ আর না হোক্ ভেদবুদ্ধির অবসান হবেই হবে। ভেদবুদ্ধির অবসান হলো ত' সব জঞ্জাল মিটে গেল। দুটা মতই আপনাকে বললুম। এখন আপনি বেছে নিন, কোন্ পথটা গ্রহণের।

মুসলমানের কাছে শিক্ষণীয়

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আমরা পণ্ডিতেরা তর্ক করতে পারি কিন্তু মীমাংসা দিতে পারি না। আমাদের ক্ষমতা শাস্ত্র উল্টানো, শাস্ত্রবাক্য আওড়ান আর জ্বলন্ত ভাষায় নিজ নিজ যুক্তির সমর্থনে হাজার হাজার শ্লোকের উপস্থাপন। হিন্দু-সমাজের উপর আমাদের সেই প্রভাব নেই, যার ফলে নির্দ্দেশ দেওয়া মাত্র তা' প্রতিপালিত হবে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় হিন্দুমহাসভার মঞ্চ থেকে এক প্রকারের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন আর ভট্টপল্লী থেকে তাঁরই পরমাত্মীয় মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তার

বিপরীত কথা বলছেন। হিন্দু-সমাজ দুজনকেই মানে। তাঁরা কি শ্যাম রাখবে-না কূল রাখবে? মহম্মদীয় ধর্ম্মের একটা মস্ত বড় গুণ এই যে, মহম্মদের কথার উপরে কথা বলার আর কেউ নেই। সেই দুঃসাহস কেউ প্রদর্শন করবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহম্মদের প্রদত্ত শিক্ষার মাঝখান থেকে একটা জিনিষ আমরা নিশ্চয় নিতে পারি যে, জুম্মার নমাজে অর্থাৎ সপ্তাহের নির্দ্দিষ্ট দিনটিতে সকলকে একই জায়গায় ঠিক একই সময়ে প্রার্থনার জন্য সমবেত হতেই হবে। প্রাচীন ভারতে এটা ছিল,—সমিতিঃ সমানী। ব্রহ্মগায়ত্রীতেও আমরা বল্‌ছি ধীমহি,—বহুবচনটা লক্ষ্য করুন। সমবেত উপাসনাটা আমাদের ছিল কিন্তু আমরা ছেড়ে দিয়েছি। সমবেত উপাসনা ছেড়ে দেবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের বহু দেবতার প্রতীকের প্রয়োজন হ'তো না। দেবতাদের রূপ-রেখা ফুটে উঠত যার যার ধ্যানে,—চিত্রে নয়, অঙ্কনে নয়, প্রতিমূর্ত্তিতে নয়। প্রতিমা যখন আরম্ভ হল, তখন থেকে আমরা মিলিত হ'তে রুচিহীন হ'তে লাগলাম। কারণ এক একটি প্রতিমায় এক একজনের রুচি। বিচিত্র রুচির মানুষেরা বিচিত্র রূপের প্রতিমা তৈরী শুরু ক'রে দিল। কেবল মুখের কথায় রইল এই যে, "এক ব্রহ্ম", এই কথাটা কেউ ভোলে নি। "এক ব্রহ্ম" কথাটা ভুলে গেলে সোমনাথ, বিশ্বনাথ আদি ধ্বংসের পরে সারা হিন্দুস্থান আরব দেশ হ'য়ে যেতই যেত। মুখে মুখে যে বলেছি "এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাই", এই

মুখের কথাটাই আমাদিগকে রক্ষা করেছে। নানা বিষয়ের নিকৃষ্টতা সত্ত্বেও মুসলমানেরা যে জগজ্জয়ী হয়েছে, তার একমাত্র কারণও "এক আল্লা"। এই "এক আল্লাকে" ওরা সামাজিক ভাবে পেয়েছেন সমবেত প্রার্থনার ফলে।

জাতিভেদ কি থাকিবে

শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—আপনার কি মনে হয় বাবামণি? জাতিভেদটা কি ভাঙ্গা যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতিভেদ-প্রথাটা উঠে গেলে হিন্দুদের পরম কল্যাণ বা জগতের অশেষ লাভ হবে, একথা যদি সত্য হয়, তবে জাতিভেদ একদিন ভাঙ্গবেই ভাঙ্গবে। কিন্তু জাতিভেদ যাঁরা ভাঙ্গতে চাচ্ছেন, তাঁরা অধিকাংশই ত' কেবল বুলি কপচাচ্ছেন। অর্থাৎ দত্ত মশাই চাটুজ্জের মেয়ে বিয়ে করছেন কিন্তু নিজের মেয়েকে নমঃশূদ্রের হাতে বিয়ে দিচ্ছেন না। যোগী মশাই চক্রবর্ত্তীর মেয়ে বিয়ে করেছেন কিন্তু নিজের মেয়েকে মালী, ঢুলী বা বাগ্‌দীর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন না। জাতিভেদ-প্রথা যদি ভাঙ্গতেই হয়, তবে দুঃসাহস নিয়ে কাজ করতে হবে। আমি যেন একটা আদেশ দিয়ে দিলাম যে, সবাই ভিন্ন জাতিতে বিয়ে কর। কিন্তু সবাই চাইবে প্রমোশন। নিজের চাইতে নিম্নতর সমাজের লোকের ঘর থেকে মেয়ে তুলে আনবেন না, ছোট জাতের মেয়েকে নিজের ঘরে তুলবেন না। বিবাহ-যোগ্য বয়স্ক ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ব্যক্তিগত

পরিচয়ের ফলে যদি এইরূপ অসুবিধা-জনক বিবাহের প্রস্তাব পাকা হ'য়ে যায়, তবে কালকের সমাজ-সংস্কারক পিতা আজকে একেবারে দারুণ সনাতনী হ'য়ে পড়েন। এই যে একটা ভণ্ডামী চলেছে তথাকথিত সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে, সেটাই হচ্ছে জাতিভেদ-প্রথা বিলোপের পথে সর্ব্বপ্রধান বাধা। তারপর আরও একটা কথা আছে যে, জাতিভেদ লুপ্ত হ'য়ে হিন্দুরা যখন একটা জাতি হবে, তখন সেই একটা জাতির Standard টা কি হবে। তারা কি মানে, সম্ভ্রমে, ন্যায়ে, নীতিতে, আচারে, ব্যবহারে, কর্ম্মে অনুশীলনে, জীবিকায় ও ধনার্জ্জনে, শূদ্রের মত হবে, না, ব্রাহ্মণের মত হবে? শরাব যে বেচে, তাকে আমি ব্রাহ্মণ জ্ঞান করি না। চর্ম্মপাদুকা যে বেচে, আপনি হয়ত তাকে ব্রাহ্মণ জ্ঞান করবেন না। মদ্যপান যে করে, তাকে ব্রাহ্মণ ব'লে জ্ঞান করা অনুচিত! অনেক ঘৃত পুড়িয়ে উপনয়ন হ'লেও যে ব্যক্তি বেশ্যার দালালি করে, তাকে ব্রাহ্মণ বলা উচিত নয়। জাতিভেদ দূর হোল ব'লে ব্রাহ্মণাচার, বৈশ্যাচার, ক্ষত্রিয়াচার সব উঠে গিয়ে সবাই আমরা শূদ্রাচারী হব, এটা কাজের কথা নয়। মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, কিন্তু চামার থেকে শুরু ক'রে আমীর পর্য্যন্ত সবাই পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ে। আমি ত' আমার সব শিষ্যকে বলি, "চারবার উপাসনায় বসবে।" আপনারা ত' নিজ নিজ শিষ্য এবং যজমানদিগকে বলেন,—"প্রত্যেকে ত্রিসন্ধ্যা করো।" সবাই এই নির্দ্দেশ পালন করছে কি? জাতিভেদটা থাকায় কিছু লোক

জাত্যভিমান বশতঃ হ'লেও সন্ধ্যা-পূজাটা ক'রে থাকে অথবা পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্ত্যর্থে "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ত্রৈলোক্যং তৃপ্যতু" ব'লে জলতিলাঞ্জলি দেয়। জাতিভেদটা যাবার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি লোপ পাবে না ত'?

ঘটনাবলির অঙ্গুলী-সঙ্কেত

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঘটনাবলির অঙ্গুলী-সঙ্কেত নেতিবাচক। অর্থাৎ দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা দেখা যাচ্ছে "জাতিভেদ থাক্‌বে না।" আমরা হিন্দুরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সমুদ্রযাত্রায় আমাদের জাতি নষ্ট হয়, বেশ্যা-সংসর্গে জাতি যায় না। কিন্তু বেশ্যার হাতে জল খেলে জাতি যায়। কোনও বিধর্ম্মী দুর্ব্বৃত্ত স্নানকালীন সিক্ত-বসনা হিন্দু রমণীর আঁচল ধরে টানলে তার জাতি যায়। কিন্তু সিনেমা হলের ভীড়, কলেজ স্কোয়ারের রেস্তোরাঁ ও কাফেসমূহ, গড়ের মাঠের সান্ধ্য শিশিরকণা আর রেলের ষ্টিমারের খাদ্য পানীয়ের সেলুন কত ঘরে যে জাতিভ্রষ্টতা এনে দিচ্ছে, কে তার সীমা-সংখ্যা রাখে? বালিকাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তন অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হ'লেও দুটি বিপত্তিকে যুগপৎ আমন্ত্রণ করছে। প্রথমটি হচ্ছে অসম কুলে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে চাকুরীর বাজারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। কোনও আন্দোলন ক'রেই স্ত্রী-শিক্ষাকে রুদ্ধ করা যাবে না। সুতরাং ট্রামে বাসে স্ত্রী-পুরুষের

ঠেলাঠেলিকেও রোখা যাবে না। ফলং জাতিনাশঃ। তারপরে যদি রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা-সমূহের মধ্যে আবার অবাঞ্ছনীয় বিচিত্রতা আসে, তাহ'লে হাজার হাজার যুবতী মেয়ের বক্ষোদেশে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ হ'য়ে জাতিভেদ-প্রথার মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেবে। কিন্তু তার পরেও যদি জাতিভেদ-প্রথা বেঁচেই থাকে, তবে বুঝতে হবে, এই প্রথার ভিতর কোথাও কোনও সত্য আছে, যেটুকুর জন্য তাকে ভগবান্ বাঁচিয়ে রাখছেন।

আত্মগঠন কর

নিকটবর্ত্তী শ্যামপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ-দর্শনে আসিয়াছে। তাহারা উপদেশ-প্রার্থী হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— প্রাণপণ যত্নে আত্মগঠন কর। প্রত্যেকে আত্মসংযমে ব্রতী হও। তোমরা জানবে যে, তোমরা প্রতি জনে পরমেশ্বরের এক একটি প্রতিনিধি। দেশের প্রতিটি মানুষের পানে প্রেমপূর্ণ নয়নে তাকাও এবং জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রতিজনকে আপনার আপন জ্ঞান কর। ধর্ম্মগত পার্থক্য, জাতিগত পার্থক্য, সামাজিক অবস্থাগত পার্থক্য, অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য বা শিক্ষা ও অশিক্ষা সম্পর্কিত পার্থক্য যেন তোমাদের মনে পর-পর-বোধকে প্রশ্রয় না দিতে পারে। বিচিত্র এই বিরাট

দেশে স্বার্থে স্বার্থে বা মানসিক সংস্কার-সমূহের দরুণ সংঘর্ষ সুদীর্ঘকাল থাকতে পারে কিন্তু তোমাদের চাই কালাতীত দৃষ্টি দিয়ে সেই দিনের দিকে তাকান, যেই দিন সকল সংঘাত নিঃশেষে রূপান্তর পাবে নির্ভেজাল মানব-প্রেমে। সমস্ত পৃথিবীকে আপন করার চেষ্টাই তোমাদের প্রকৃত সাধনা এবং এই সাধনায় সিদ্ধ হবে তোমরা সুদীর্ঘ-কালের, বহু যুগের, বহু শতাব্দীর নিরবচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক অধ্যবসায়ে।

রংপুর

২৫শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৪২

(৭ই এপ্রিল, ১৯৩৬)

ডাঃ ডি, এন্, মল্লিক

প্রাতে সাত ঘটিকায় রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ডি, এন্, মল্লিক শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়াছেন। ডাঃ মল্লিক বলিলেন,—আমি রসকষহীন সাধারণ মানুষ কিন্তু আপনাকে দেখার পর থেকে আপনার প্রতি প্রাণের একটা প্রবল আকর্ষণ দূর কত্তে পাচ্ছি না। আমার মনে একটা দারুণ চিন্তা এসেছে যে, আপনার সহায়তায় সমগ্র ছাত্রকুলের জন্য জেলাব্যাপী একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করাই। কারণ, আপনার দর্শন পাওয়ার পর থেকে

আমাদের কলেজের ছাত্রদের নৈতিক এবং মানসিক উন্নতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকট দেখ্‌তে পেয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আদেশ করুন, যে কাজ কত্তে বল্‌বেন, তাই কর্ব্ব। শ্রমে আমার কাতরতা নেই, কর্ম্মের বিশাল আয়তনে আমার ভয় বা আতঙ্ক নেই। তবে হাতে সময় কম। সারাদিন চেষ্টা ক'রেও চব্বিশ ঘন্টার দিনটাকে পঁচিশ ঘন্টায় নিয়ে ঠেকাতে পাচ্ছি না।

ডাঃ মল্লিক হাসিয়া উঠিলেন,—তৎপরে অনেক কাজের বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল এবং রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে লইয়া বিস্তারিত পরামর্শ হইল। কথা হইল, সমগ্র রংপুর জেলাটী বক্তৃতা দিয়া চষিয়া ফেলিতে হইবে এবং সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুব্যবস্থা উল্লিখিত কয়েকজন করিয়া দিবেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন যে, হাতের জরুরী কাজগুলি সারিয়া পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে তিনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একাজে লাগিবেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিলেন যে, সমগ্র ঢাকা জেলা তথা বিক্রমপুর নিয়া অনুরূপ কাজ করিবার একটী পরিকল্পনা ঢাকা ব্রাহ্মণ-সমাজে শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রগ্রাম তখন হইবে, যখন জলে দেশ ডুবিবে এবং নৌকাযোগে সর্ব্বত্র নৌকায় গমনাগমন সহজতর হইবে।

দিনাজপুর
২৫শে চৈত্র, ১৩৪২

যোগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বেলা একটা পঁচিশ মিনিটের ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি দিনাজপুর রওনা হইলেন। যথাকালে দিনাজপুর পৌঁছিলে উত্তরবঙ্গের সর্ব্ববরিষ্ঠ জননেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। যোগেনবাবু বলিলেন,—যাঁকে দেখার জন্য আজ দশ বৎসর ধ'রে মন ব্যাকুল, কি মহাভাগ্য আমার যে, আমি তাঁকে আজ নিজ গৃহে পেয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি অতি নগণ্য সাধারণ একটী লোক। আমাকে দেখার জন্য কারো কোন তপস্যার প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই প্রাণের গরজে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাই। এতে আমার নিজস্ব কোনো মহিমা নেই।

আপনার জন

একটী যুবক বলিল,—শিক্ষাটা আমি কোনো ছাপানো বই বা কারো বক্তৃতা থেকে পাই নি। বহুপ্রতীক বর্জ্জন না কর্লে যে কিছুতেই ধর্ম্মপথে নিশ্চিন্তে অগ্রসর হওয়া যাবে না, এই কথাটি আমি একজন অজানা লোকের লেখা পত্র থেকে জেনেছি। সনটা হয়ত হবে বাংলা ১৩২৭ বা ১৩২৮।

আমাদের স্কুলের পাঁচ ছয় জন ছাত্রের কাছে "আপনার জন" নাম স্বাক্ষরকারী এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বড় বড় পত্র প্রায় প্রতি সপ্তাহে একখানা ক'রে আস্‌ত। প্রথম প্রথম স্কুলের প্রধান শিক্ষক মশায় ওসব পত্র আমাদের হাতে দিতেন না। পরে যখন দেখ্‌লেন, প্রত্যেকটী পত্রের বিষয়-বস্তু হচ্ছে নৈতিক উন্নতি আর আধ্যাত্মিক উজ্জীবন, তখন দিতে লাগ্‌লেন। তা' থেকেই জীবনে প্রথম শুন্‌লুম যে, আধ্যাত্ম-জীবনে উন্নতি কত্তে হ'লে চাই বহুপ্রতীক বর্জ্জন। আচ্ছা স্বামীজী, আপনিই কি সেই "আপনার জন"?

বহুপ্রতীক বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাস্যে দিগন্ত কম্পিত করিলেন। বলিলেন,—আমি তোমাদের আপনার জন হ'ব না, তবে কি পর হব? কিন্তু বলত' বাবা, তুমি বহু প্রতীক বর্জ্জন কত্তে পেরেছে কিনা এবং পেরে থাকলে তাতে লাভ হচ্ছে কি প্রকার?

যুবক বলিলেন,—চক্ষু বুজলে আর হাজার দেবতা দেখ্‌তে পাই না, ঘর থেকে বহিরে যাবার কালে প্রণামের সময়ে আর এটা, ওটা, সেটা ক'রে বহু বহু পূজ্য বিগ্রহের জন্য মন খুঁতখুঁত করে না, একজনের উদ্দেশ্যে প্রাণ উজাড় ক'রে ভক্তি দিয়ে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়ি। এর চেয়ে নিশ্চিন্ততা আর কিসে আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বহুপ্রতীক তোমার মন থেকে দূর হ'য়ে গেছে, এটা বড়ই লাভের কথা। অনেকেই এই লাভটার মূল্য বোঝে না। ভাবে, লক্ষ্মী প্রণাম কর্ল্লুম কিন্তু কালী প্রণামটা ত' আর হ'ল না। ভাবে, দুর্গাপূজা কর্ল্লাম কিন্তু কার্ত্তিক পূজাটা যে বাদ প'ড়ে গেল। কোনো সাধ্বী সতী যদি মনে মনে এই কথা ভাবে যে, স্বামীকে ত' খুব সেবা কর্ল্লুম, কিন্তু দেবর-ভাসুরকে তো সেবা করা হলো না, তবে সে কি নিশ্চিন্তে স্বামিসেবা কত্তে পারে? এক দেবতার পূজা কর্ল্লে এক রকমের পুণ্য হয়, অন্য দেবতার পূজা কর্ল্লে আবার অন্য রকমের পুণ্য হয়। সুতরাং এক পূজার পুণ্যে যার মন তুষ্ট নয়, সে অন্য পূজার পুণ্য ত' চাইবেই। গ্রাম্য ধর্ম্মনেতাদের বল্‌তে শুনেছি, নবগ্রহের পূজা ক'রে একটু ধর্ম্ম হ'ল, আবার শনিকে আলাদা ক'রে পূজা কর্ল্লে আরো একটু ধর্ম্ম হ'ল, তারপরে যদি আবার শীতলার পূজা কর, তবে আরো-একটু ধর্ম্ম হ'ল। যত বেশী দেবদেবীর পূজা কর্ব্বে, তত বেশী করে ধর্ম্ম হবে। সুতরাং পূজার সংখ্যা বাড়াও আর দেবতার সংখ্যা বাড়াও। অথচ এই ভারতেই একদা ইন্দ্রের আর বরুণের কি পূজাটাই না হ'ত। আজ এঁদের পূজার নামগন্ধও শোনা যায় না। ইন্দ্র আর বরুণ তবে গেলেন কোথায়? একজনকে পূজা, একজনের প্রতি আনুগত্য, একজনকেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ, এটাই হচ্ছে পূজার অন্তর্নিহিত কথা, এটাই হচ্ছে সকল পূজার তাৎপর্য্য এবং

পরাকাষ্ঠা। দশ জনকে যে ভুলতে পেরেছে, তার আরাধ্য ঐ একজন ঔজ্জ্বল্যে নিত্যকাল জল্‌জ্বল্‌ ক'রে জ্বলতে থাকেন, তাঁর আশে-পাশে আর অন্ধকার থাকে না।

বহুপ্রতীক বিদূরণের পন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তলোয়ার দিয়ে বা উৎপীড়ন ক'রে বহুপ্রতীক দূর করা যায় না। বাইরের মন্দির তুমি ভাঙ্গতে পার, কিন্তু মনের মন্দির কি ক'রে নাশ কর্ব্বে? বহুপ্রতীক বর্জ্জন করার বা করাবার একটী মাত্রই উপায়,— তার নাম ইষ্টনিষ্ঠা। একটী ইষ্টে লেগে থাকতে হ'লেই অন্তরভরা চাই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা। ইষ্টে যার অনুরাগ নেই, সে-ই পারে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে বহুপ্রতীকের প্রীণন কর্ত্তে। বহু-প্রীণন প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তির গণিকা-বৃত্তি। যখন যার কাছে যাই বা যাকে কাছে পাই, তখন তাকেই ভজনা করি, এটা বহু-প্রীণনের একটা সুপ্রকট লক্ষণ।

ধর্ম্মীয় সহনশীলতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু ইষ্ট সম্পর্কে আমার ধারণা আর তোমার ধারণা এক নাও হ'তে পারে। তখন করব কি? তখন পথ সহনশীলতা। তোমার ইষ্ট-চিন্তায় আমি বাধা দিব না, আমার ইষ্ট-চিন্তাতেও তুমি বাধা দিবে না, কিন্তু আমরা উভয়েই নিজ নিজ ইষ্টে লগ্ন হ'য়ে থাকব

অব্যভিচারিণী নিষ্ঠা নিয়ে। এর নামই ধর্ম্মীয় সহনশীলতা। এই সহনশীলতা সমাজের বর্ব্বর অবস্থার মধ্যে জন্মলাভ করে না, সমাজের সর্ব্ব অঙ্গে সুকুমার বৃত্তির লাবণ্য প্রকাশ পেলে তবে এই সহনশীলতা আসে। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মাচার্য্য নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে এসেছেন, আরও কোটি কোটি ধর্ম্মাচার্য্য এর পরেও শুভাগমন কর্ব্বেন, নিজ নিজ মতামতে আস্থা-বিশিষ্ট হ'য়েও তাঁরা পরস্পরে বিবদমান হবেন না, এই আশা করা চলে অতিশয় উন্নত সভ্যতা বিকাশেরই যুগে। আমরা সেই যুগেরই প্রত্যাশী।

কর্ম্মযোগে ঐক্য

অন্য একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঐক্য আসে অন্তরের প্রীতি থেকে। গায়ের জোরে ঐক্য আসে না। একই কাজে বারংবার প্রীতি সহকারে লগ্ন হ'তে হ'তে সহযোগী কর্ম্মীদের মধ্যে আপনা আপনি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অযোগ্যকে দক্ষ করা এবং অদক্ষকে যোগ্য ক'রে গড়ে তোলার উপায় হচ্ছে প্রত্যেককে আদর ক'রে কাজে ডাকা, কাজে যোগদানের সুযোগ দান করা এবং প্রাণভরা প্রেম ও আহূত ব্যক্তির সততায় বিশ্বাস নিয়ে ডাকা। তিরস্কার দিয়ে কাজ আদায় হয় না, শুধু মনকে তিক্ত করা হয়। নিন্দা বা সমালোচনার দ্বারাও কাজ আদায় হয় না। সর্ব্বত্রই প্রবীণেরা বয়সের ধর্ম্মেই কর্ম্মে অক্ষম হচ্ছেন।

এই অবস্থায় নূতনদের সদলবলে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের আয়োজন না থাকলে কাজ কি ক'রে চলতে পারে? নবীনে প্রবীণে যাতে বিরোধ না বাধে, তার জন্যই নবীনদের উচিত প্রবীণদের সম্মান করা, প্রবীণদের উচিত নবীনদের সমাদর করা। এই ব্যবস্থা যেখানে সার্বলীন নয়, সেইখানে যে নবীনে প্রবীণে শুধু সংঘর্ষই বেধে যায়, তা' নয়, সেখানে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মযজ্ঞ দক্ষযজ্ঞের রূপান্তর গ্রহণ করে। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে হাজার রকমের মতভেদ বা পথভেদ থাকলেও কর্ম্মযোগ-প্রসঙ্গে যে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারি, তার প্রমাণ দেখাবার জন্যই আমাদের বহুপ্রতীক বর্জ্জন করা উচিত। মনের ধ্যান যার যেমন হোক্, বাইরে মিলনের বাধা যতটা যে দূর কত্তে পারি, তার চেষ্টা দেখ্তে হবে। তারই জন্য নিজের অন্তর্মূলকে আগে একনিষ্ঠ ক'রে নিতে হয়।

নির্ভর নিয়া কাজ কর

আর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরিস্থিতি তোমার অনুকূল না প্রতিকূল, তার বিচারের নিশ্চয়ই আবশ্যকতা আছে। কেননা, অনুকূল পরিস্থিতি হ'লে তুমি কতকটা নিশ্চিন্তে নিজের জীবন-কর্ম্ম সাধন কত্তে পার। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হ'লেও ত' তোমাকে এগিয়েই যেতে হবে! ফিরে ত' আর আস্‌বে না! যে কাজ ধরেছ, তা' ত' আর ছেড়ে দেওয়া চলে না। কাজটা তোমার জীবন-গঠনের।

প্রশ্নটা তোমার স্বদেশ স্বজাতির উন্নতির। সমস্যাটা হচ্ছে এই নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সংগ্রাম ক'রে বেঁচে থাকার এবং মানুষের মত বাঁচার। আদর্শটা হচ্ছে কাজের ভিতরে জীবনের আনন্দকে আস্বাদন করার। এমন অবস্থায় পরিস্থিতি অনুকূল হ'লে ত' ভাল কথাই, প্রতিকূল হ'লেও তোমাকে সে কাজ ক'রে যেতেই হবে। যে কাজ তোমার, আমার, সকলের, যে কাজ বিশ্ববাসীর ও বিশ্বস্রষ্টার। সুনির্দ্দিষ্ট নির্ভর নিয়ে নিয়ত ভগবৎ-স্মরণ কর। তাঁর নামের মাধুর্য্য থেকে জীবনের যাবতীয় রস ও রসায়ন আহরণ কর। জিদ্ ক'রে যদি একাজ কত্তে থাক, তবে দেখবে, তোমার তরফ থেকে কোনো পৃথক্ চেষ্টা না থাকলেও পরিবেশের পরিবর্ত্তন আস্তে আস্তে ঘ'টে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নির্ভর নিয়ে কাজ ক'রে যেতে থাক্‌লে এ কথার সত্যতা স্পষ্ট উপলব্ধি ক'রে বিস্ময়ান্বিত হবে।

বিবাহ এক বৃহৎ সমস্যা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কি পুরুষের, কি নারীর, বিবাহ্ প্রায় প্রত্যেকের জীবনেরই এক বৃহৎ সমস্যা। বিবাহ্ করা ভাল হবে কি? বিবাহ্ ক'রে আবার মহতী বিনষ্টির পথে যাব কি? বিবাহ্ কি আমাকে আর দশটা প্রলোভন থেকে রক্ষা কর্ব্বে? না, বিবাহের ফলে আমি এখন যা' আছি, তার শতগুণ অধোগতি পাব? বিবাহ কি আমাকে সংযমের পথে টেনে আন্‌বে, না লাম্পট্যের

পথে ঠেলে দেবে? অপরের সৃষ্ট দুষ্ট চক্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিবাহ অনেক ক্ষেত্রে রণনীতি-হিসাবে একটী উৎকৃষ্ট কৌশল। মানে, হাজার ভ্রষ্টাচারী ও ব্যাভিচারিণীর ইতর সংসর্গ থেকে বাঁচলাম, কিন্তু একটী মানুষের কাছে বাঁধা পড়লাম বা কেনা গোলাম হলাম। অবশ্যম্ভাবী ভাবী বার্দ্ধক্য-দশায় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য পরিজন পাবার প্রয়োজনে বা প্রত্যাশায় বিবাহ করা গার্হস্থ্য-নীতি ও সামাজিক-জীবনের হিসাবে অত্যুত্তম। সুখী হবার প্রয়োজনে বিবাহ করা কখনো বা কাহারো কাহারো পক্ষে নিষ্ফল, কখনো বা কাহারো কাহারো পক্ষে সম্পূর্ণ সফল। কিন্তু কে যে সফল হবে, কে যে নিষ্ফল হবে, তা' কেউ জানে না। কুমারী মেয়েদের সারা জীবন অবিবাহিত থাকবার অনুকূল উৎকৃষ্ট পরিবেশ সব দেশে সমান থাকে না। সুতরাং হঠাৎ ক'রে কর্ত্তব্য-নির্ণয় সম্ভব নয়। আমাদের দেশের আশ্রম-নামধেয় প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকাংশই অপূর্ণ। এসব প্রতিষ্ঠান কোথাও কোথাও অর্থের অপ্রতুলতার মধ্য দিয়ে চল্‌ছে বা অনুপযুক্ত পরিচালনে চল্‌ছে। আর, আশ্রম মাত্রেই অন্তেবাসী বা অন্তেবাসিনীদের অনেক বিষয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব্ব বা ক্ষুণ্ণ করেই করে। এক গুরুর শিষ্যেরা অন্য গুরুর আশ্রমে সহজে স্থান পায় না, এই একটা ব্যাপারও অনেক ক্ষেত্রে আছে। আবার মেয়েদের আশ্রমে ভর্ত্তি হবার পরে এক গুরুর শিষ্যারাও ঝগড়া-কলহে তপোবনকে ফৌজদারী কাছারীতে পরিণত ক'রে ছাড়ে। এই

কারণেও অবিবাহিত মেয়েদের আজীবন কৌমার্য্য-ব্রত পালনের সুযোগ দানের যোগ্য আশ্রম কোথাও ঠিক ঠিক মত হয়ত গ'ড়ে উঠ্‌তে পাচ্ছে না। সুতরাং বিয়ে করা কি না করা, এই যে একটা সমস্যা, তার সমাধানের পথ রুদ্ধপ্রায়। তাই, আমি বলি কি, মনে সৎ থাকবার সঙ্কল্প নিয়ে প্রত্যেক অবিবাহিত পুরুষ বা নারী নিজ নিজ শক্তি-সাধ্য অনুযায়ী ভগবচ্চরণে নামযোগে অবিরাম আত্মসমর্পণ কত্তে থাকুক। নামের বলে, নামের মহিমায় যার পক্ষে যেমনটী ঘটা দরকার, তেমন যোগাযোগ আপনা আপনি ঘটে যাবে। কররেখা-বিশেষজ্ঞ বা কোষ্ঠী-পাঠে পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপরে নির্ভর না ক'রে নির্ভর করা উচিত ভগবানের উপরে। এই নির্ভরের আবার উপায় বা অবলম্বন হচ্ছে তাঁর পবিত্র নাম।

দিনাজপুর

২৬শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৪২

(৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬)

রংপুরে বক্তৃতাবলি চলিবার কালে এই শহরের কিছু যুবক এখান হইতে রংপুর শহরে গিয়া কেহ একটী, কেহ দুইটী, কেহ বা শ্রীশ্রীবাবামণির তিন চারিটী বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণির দিনাজপুর আগমনের সংবাদে তাঁহারা ধরিলেন যেন শ্রীশ্রীবাবামণি এখানেও দুই একটী বক্তৃতা দেন।

বক্তৃতার প্রভাব সীমাবদ্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বক্তৃতা জিনিষটার প্রভাব বা ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যখন শুনলে তখনই একটু সঞ্জীবনী শক্তির যেন সঞ্চার হ'ল। সভাস্থল থেকে বাড়ীতে ফিরতে ফিরতে পথমধ্যেই অর্দ্ধেক প্রেরণা বাতাসে উড়ে গেল। যিনি বক্তা, তাঁর চরিত্রের ভিতরে যদি বক্তব্য বিষয়কে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার তপস্যা না থাকে, তবে দুর্ভেদ্য যুক্তির ব্যূহও দুই চার দিন পরে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যায়। একই কথা বারংবার শুনতে শুনতে বক্তার বক্তব্য আস্তে আস্তে শ্রোতার মনে রেখা কাটে। এজন্যই আমি কোথাও গেলে দিনের পর দিন একই ভূমিতে নিত্য নূতন ক'রে লাঙ্গল চষি। একটা শহরকে নির্দ্দিষ্ট একটা খাতে নিয়ে পৌঁছাতে হ'লে বক্তৃতা প্রয়োজন হয় দশটা থেকে পনেরটা। কোথাও চার পাঁচটি দিয়ে সংক্ষেপে কাজ সারি, কোথাও ঊনিশ, কুড়ি, একুশ দিনও বলি। একই উদ্দেশ্যে একই কথা বলি কিন্তু শ্রোতার যাতে বিরক্তি না আসে, তার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন কত্তে হয়। সে কৌশল হচ্ছে নিত্য নূতন ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের। দিনাজপুরে আছি মাত্র একদিন, এই একদিনে আর কি বল্‌ব, বল। তার চেয়ে তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা যদি কিছু থাকে, খুলে বল, চেষ্টা কর্ব্ব যতটা পারি সমাধান দিতে।

যুবকদের অসুখ থাকিবে কেন

যুবকেরা জনে জনে এক একটা অসুখের কথা বলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অসুখ-বিসুখের কথা বল্‌বে ডাক্তার-কবিরাজদের কাছে। তাঁরা চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন ক'রে রোগ নিরাময়ে পটু হয়েছেন এবং লোকের রোগারোগ্য বিধানই তাঁদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। আমার কাছে তোমরা অসুখ-বিসুখ নিয়ে এস না। আমি যে কোথাও কোথাও দুটা একটা রোগী দেখি, তা' এই জন্য নয় যে, আমি একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক। এমন কতকগুলি রোগ আছে, যা' অতীব ক্লেশকর কিন্তু যার চিকিৎসা এখনো ডাক্তার কবিরাজদের পরিজ্ঞাত নয়। এমন ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের নাম ক'রে আন্দাজী ঔষধ দেই এবং ভাগ্যক্রমে বা আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে হ'লে, ভগবানের দয়ায় কেউ কেউ সারে। তোমরা যুবক, তোমাদের অসুখ থাক্‌বে কেন? যৌবনই জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, যৌবনই জীবনের বসন্তকাল। যৌবন শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর হবে। যৌবন হবে স্বাস্থ্যদীপ্ত, সুন্দর ও সবল। এ সময়ে কেন তোমরা নানা রোগে ভোগ, বল ত'! বল্‌তে পাচ্ছ না? চিন্তা ক'রে দেখ। যা' স্বাভাবিক জীবন, তার অনুশীলন না ক'রে তোমরা কি জীবনকে অস্বাভাবিক অভ্যাসের দাস করেছ? তোমরা কি নিজেরা নিজেদের আয়ুঃক্ষয় ক'রে তারপর আশা কচ্ছ ডাক্তার কবিরাজেরা বিনষ্ট আয়ু ফিরিয়ে

দিতে পার্বেন? যে যৌবনের অপব্যবহার করে, তার যৌবন আর কদাচ ফিরে আসে না। সে চিরকাল বার্দ্ধক্যের জীর্ণতার জ্বালা ভোগ কত্তে বাধ্য হয়।

প্রতিজ্ঞা কর, ব্রহ্মচর্য্য পালিবে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রতিজ্ঞা কর যে, প্রাণপণে প্রতিজনে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ব্বে, আত্মহনন থেকে নিজেরা নিজেদের রক্ষা কর্ব্বে, জগতের শ্রেষ্ঠ সংযমী পুরুষদিগকে নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ক'রে নেবে, ত্যাগ এবং সংযমে সিদ্ধি অর্জ্জনের জন্য আপ্রাণ অনুশীলন কর্ব্বে সদাচারের। ব্রহ্মচর্য্যই কৈশোর ও যৌবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, ব্রহ্মচর্য্যই অধঃপতিত জাতির অভ্যুদয় লাভের শ্রেষ্ঠ তপস্যা। কোনও প্রকারে বেঁচে থাকাটাই একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব নয়, জীবনের প্রতি কর্ম্মে বেঁচে থাকার আনন্দকে আস্বাদন করা চাই। তবে ত' জীবন সার্থক হল! এ আনন্দের সাগরসম গভীর, আকাশসম উদার, সূর্য্যমণ্ডলসম জ্যোতির্ম্ময় খনি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য।

কামদমনের উপায়

একজন প্রশ্ন করিল,—কামদমন কি ভাবে কর্ব্ব!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কামদমন তোমার লক্ষ্য নয়, কামদমন তোমার উপায় বা শ্রেষ্ঠ সত্যের উপলব্ধিতে পৌছুবার সিঁড়ির শ্রেণী মাত্র। মহামহীরুহের শীর্ষদেশে পৌছে যাবার মই। কামদমন কর্ব্ব, এই ব'লে সঙ্কল্প করার চেয়ে কাম যাতে আপনি ভীত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে তোমাকে ছেড়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে যায়, তাই তোমাকে কত্তে হবে। তা' হল নিরন্তর কর্ম্মশীলতা, সুদৃঢ় অনালস্য, সর্ব্বশক্তি দিয়ে আত্মোৎকর্ষ-বিধায়ক নানা কাজকর্ম্ম করা, সকলের যাতে হিত সাধিত হয়, এমন সৎকর্ম্মে যতটুকু সম্ভব নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মনিয়োগ করা আর বিশ্বজনের নিঃশ্রেয়স কল্যাণের কথা নিরন্তর চিন্তা করা। সদ্‌গ্রন্থ নিয়মিত পাঠ বা স্বাধ্যায় এই ব্যাপারে তোমার বিশেষ সহায়তা কর্ব্বে। কারণ, সৎসঙ্গ সকল সময়ে সুলভ নয় কিন্তু সৎলোকের সচ্চিন্তারাজি যে সকল পুণ্যমাখা পুস্তকে সংগ্রথিত আছে, ইচ্ছা করলে সেই সকল পবিত্র পুস্তককে তুমি তোমার নিত্য সাথী ক'রে নিতে পার।

কামদমন কি সত্যই সম্ভব

প্রশ্ন হইল, কামদমন কি সত্যই সম্ভব?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অধিকাংশ জীবের জন্ম তাদের পিতামাতার কামক্রিয়া থেকে। কামবুদ্ধি যদি এক কণাও না থাকে, তবে দেহ-বিশেষ ক'রে পুরুষের দেহটী, কামক্রিয়ার উপযুক্ততা পায় না। সুতরাং সন্তানলাভেচ্ছু ব্যক্তির ভিতরে

যৎকিঞ্চিৎ হ'লেও কামোদ্দীপনা আবশ্যক। জন্মের আগ থেকেই এভাবে আমাদের দেহের ভিতরে কামের অস্তিত্ব-সম্ভাবনা, প্রয়োজন-সম্ভাবনা, চর্চ্চার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সুতরাং কামকে একেবারে লুপ্ত করার চেষ্টা কখনো সর্ব্বজনীন হতেই পারে না। অধিকাংশ মানবের পক্ষে কাম অত্যাবশ্যক একটী বস্তু, যা' না থাক্‌লে তার বংশবৃদ্ধি হবে না। "কামকে লুপ্ত কর্ব্ব", এই জিদ ক'রো না। "কামকে তার যোগ্য কালে যোগ্য ভাবে ব্যবহারের শক্তি অর্জ্জন কর্ব্ব এবং সর্ব্বদা কামের প্রভু থাক্‌ব, দাস হব না",—এইরূপ জিদ কর'। কাম অশ্রদ্ধেয় বস্তু নয়, প্রয়োজন হচ্ছে শুধু তার প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার এবং আরও বেশী প্রয়োজন হচ্ছে তাকে ব্যবহার না ক'রেও শান্তিপূর্ণ ভাবে সুদীর্ঘকাল গৌরবময় মহাকর্ম্মান্বিত জীবন-যাপন করার দক্ষতা অর্জ্জন। কামজয়ী মানুষ বিশ্বজয়ী এবং কামকে জয় করা যায় ব'লেই তাঁরা কামজয়ীও হয়েছেন, বিশ্বজয়ীও হয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও হাজার হজার নরনারী নিজ নিজ জীবনের তপস্যার প্রভাবে কামকে হস্তধৃত ক্রীড়নকের মত অবহেলে পরিচালন ক'রে তার সদ্‌ব্যবহারের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পার্ব্বেন। মানুষ যখন ব্যাপক ভাবে কামজয়ের অনুশীলনে নেমে যাবে, সেদিন নব-মানব-জাতি বা দেবমানবজাতির আবির্ভাবের পটভূমিকা তৈরী হবে। তখন জন্মলাভ বা জন্মদান একটা দৈবাধীন ব্যাপার থাক্‌বে না, তখন সন্তানেরা পিতামাতার প্রবল ইচ্ছার উৎসকে

নিজেদের চরিত্রের মধ্যে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। বিশ্বাস কর যে, কামজয় মনুষ্য-সভ্যতার উন্নতির জন্য প্রয়োজন এবং এই জন্যই কামজয় নিশ্চয়ই সম্ভব।

কামজয়ের নাম করিয়া কামচর্চ্চা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"এস ভক্তগণ, কামজয়ের কৌশল শিক্ষা কর",—এই কথা ব'লে ভারতের অন্ধকার যুগের কিছু কিছু ধর্ম্মাচার্য্য শিষ্য শিষ্যাদের গুপ্ত জীবনকে কামচর্চ্চার রণক্ষেত্রে পরিণত যে করেছেন, একথা সত্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অগ্নি-ভক্ষণ ক'রেও হজম করার সামর্থ্য দেখিয়েছেন, অনুমান করি, একথাও অংশত সত্য। কিন্তু কামজয়ের চেষ্টা কত্তে গিয়ে কামেরই চর্চ্চা করা বাস্তবিকই একটা দোষণীয় ব্যাপার। দৃষ্টান্তের দিক থেকে এটা অমঙ্গলকর, প্রেরণার দিক্ দিয়ে এটা বিভ্রান্তিজনক। কামজয়ের যাবতীয় চেষ্টার একটী মাত্রই প্রশস্ত রাজপথ, তার নাম হচ্ছে নিষ্কলঙ্ক সদাচার। যে বিবাহ করে নি, সে স্ত্রীলোক সম্পর্কে একেবারে উদাসীন থেকে নিজ ব্রহ্মচর্য্যকে অটুট রেখে চলার চেষ্টা কর্ব্বে। যে পুরুষ বিবাহ করেছে, সে পুরুষ তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, আর যে নারী বিবাহিতা, সে নারী তার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে সদাচারের মধ্য দিয়ে অন্তরের আত্মীয়তা-বৃদ্ধির চেষ্টা কর্ব্বে। সদাচার ও সসম্ভ্রম

ভাব থাকবে তাদের প্রধান অবলম্বন। এর ফলে হাজার হাজার দুঃখদীর্ণ সংসারে শান্তির হিল্লোল বইতে শুরু কর্ব্বে। দাম্পত্য জীবনের প্রেম পরকীয়া প্রেম থেকে যে সহস্র গুণে গভীর হ'তে পারে, তা' এভাবে দম্পতীরা উপলব্ধি কত্তে পার্ব্বে। এই ভাবে চিন্তাশীল লোকেরা চিন্তা-ভাবনা পরিচালন করেন নি ব'লেই আমার বক্তব্যগুলি তোমাদের কাছে হয়ত একেবারে নূতন বা অত্যদ্ভুত, এমন কি আজগুবি ব'লে ঠেক্‌তে পারে। কিন্তু কথাগুলি সত্য।

দম্পতীর মধ্যে দুই জন দুই রকমের হইলে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দম্পতীর মধ্যে একজন যদি হয় অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত এবং অপর জন যদি হয় ইন্দ্রিয়সুখে উদাসীন, তাহ'লে দুজনের মধ্যে অকারণ মনোভঙ্গ ও কলহ ঘটতে পারে। ইন্দ্রিয়-সুখ প্রচুর পরিমাণে পেল না ব'লে যখন একজন অপর জনের প্রতি রুষ্ট হয়, তখন সে তার প্রকাশ্য রোষের গুপ্ত কারণটী খুলে বল্‌তে স্বভাবতই কুণ্ঠিত হয়। এর ফলে তাদের কলহ মিটে যাবার পথে নিত্য নূতন বিঘ্নই সৃষ্ট হ'তে থাকে। দৈহিক ইন্দ্রিয়-সুখ যখন দাবীর বস্তু হয়, তখন স্বাভাবিক লজ্জাহেতু স্বামী তা' স্ত্রীকে বা স্ত্রী তা' স্বামীকে খুলে বল্‌তে কুণ্ঠা বোধ করে। আমার মতে, এই

কুণ্ঠা দূর ক'রে ফেলে তাদের পরস্পরের প্রতি অকপট ও সরল হওয়া উচিত এবং দুজনের দুই রকমের মনোগতি থাকার দরুণ যে ব্যবধান মনে মনে সৃষ্ট হ'য়ে গেছে, আপোষ-রক্ষা ক'রে তা' দূর ক'রে দেওয়া উচিত। দুজন যদি দুজনের মনের আসল কথা বুঝতে পারে, তা' হ'লে একে অন্যকে নিজের মত ক'রে নিতে বা নিজে অন্যের মনের মত হ'তে চেষ্টা কত্তে পারে। দু দেশের দুটী ছেলেমেয়ে, যারা পরস্পরকে কদাচ চিনত না, বিবাহ-রূপ একটী ধর্ম্ম-সাক্ষী-করা ঘটনার দ্বারা এমন ভাবে একত্র হয়েছে যে, খুব সম্ভবতঃ আমৃত্যু তাদের নিকটত্ব ও আপনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তেই হবে। এমন স্থলে পরস্পর পরস্পরকে নিয়ত উন্নতিমুখিনী প্রেরণা দিয়ে সাহায্য কর্ব্বে, এটাই ত' সঙ্গত ব্যবস্থা। ভালবাসাটা অকৃত্রিম, এর মধ্যে ফাঁকি নেই, এই বোধ যদি দুজনের মধ্যে এসে যায়, তাহ'লে দৈহিক ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা একটু কম হ'ল ব'লে কেউ কখনো আফশোষ করে না, জানবে।

ভাণ এবং আত্মপ্রচার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দাম্পত্য জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এতদিন এই বিষয়ে তোমাদের কেউ কিছু বলেনি ব'লে তোমরা মনে কচ্ছ, এটা আজগুবি, এটা অসম্ভব। কিন্তু বারংবার যদি বিষয়টা নিয়ে মনে মনে

পর্য্যালোচনা কর, তাহ'লে দেখ্তে পাবে, দাম্পত্য জীবনেও ব্রহ্মচর্য্য পালনকে সহজ ব্যাপার ব'লে তোমরা অনেকেই বিশ্বাস কত্তে পার্ব্বে। বিশ্বাস এল ত' কাজ সত্যি সত্যি শুরু হ'য়ে গেল। বিশ্বাস তোমাদের নাই ব'লেই ত' পতন হচ্ছে। বিশ্বাস এলে আর পতন কোথায়? বিশ্বাস এক সুবিশাল স্তম্ভ। তাকে জোর ক'রে আবদ্ধ আলিঙ্গনে ধ'রে রাখতে পারলে পতনটা তোমার কি ক'রে হবে? তবে, এসব বিষয় নিয়ে বাইরে প্রচার বড়ই ক্ষতিকর। একবার লোক-প্রশংসা এলে ভাণ এবং ভণ্ডামি সেই সুযোগে ডিম পাড়তে শুরু করে। তুমি যতটুকু মহৎ হয়েছ, তোমার অনুকূলে প্রচারটা যদি তার চেয়ে একটু বেশী গুরুতর হয়, তা'হ'লে ঐ গুরুভারেই তোমাকে কুপোকাৎ হ'তে হবে, এইটী নিশ্চিত জেনো। মন্দ কাজের নিন্দা হোক্ এইটী ত' বাঞ্ছনীয় কিন্তু ভাল কাজের প্রশংসায় তোমার মারাত্মক ক্ষতি হ'য়ে যেতে পারে। অহঙ্কার তোমাকে আত্মগর্ব্বী এবং দাম্ভিক ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে, যার ফলে তোমার হিতকারী বান্ধবেরা প্রকৃত প্রস্তাবে শত্রু হ'য়ে যেতে পারে! ভাণ এবং আত্মপ্রচার থেকে শত যোজন দূরে থেকে বিবাহিত প্রতিজনে দাম্পত্য ব্রহ্মচর্য্য-পালনের চেষ্টা কর্ব্বে। বিশ্বাস নিয়ে, সাহস নিয়ে, দীর্ঘকাল ধ'রে অমিতবিক্রমে একই লক্ষ্যে জীবনকে পরিচালনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে চল্‌তে হবে।

বিবাহিতদের ধ্যান-নয়নের দৃষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দম্পতীর মধ্যে একজন খুবই ভোগসুখ-লিপ্সু, অপর জন ভোগবুদ্ধি-বর্জ্জিত সরল সাদাসিধা সৎ লোক,—এই পার্থক্যের দরুণ-ভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কিছু নেই। এটাকে বিরাট একটা সমস্যা ব'লে মনে ক'রো না। কেউ যখন নিজের সুখের জন্য ভোগ-চেষ্টায় নামে, মানুষ-হিসাবে তখন সে যা, সে যদি নিজের সুখ, নিজের তৃপ্তিকে গৌণ ক'রে নিয়ে নিজ সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সুখ-কামনার অধীন হয়, তবে তখন মানুষ-হিসাবে তার চেয়ে উচ্চ গ্রামের বাসিন্দা। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সুখলিপ্সার লক্ষ্য নিয়ে এই পার্থক্যের দরুণ একজন উৎকৃষ্ট মানুষ এবং অপর জন নিকৃষ্ট মানুষ ব'লে পরিগণিত হয়। নিকৃষ্টেরা সব সময়ে প্রকৃষ্ট হবার জন্য আগ্রহী হবে, প্রগতির প্রকৃত মানে ত' এই! উভয়ের ধ্যানের নয়নে ভাবী জগতের দেব-মানবদের আলেখ্য ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা কর। তার ফলে উভয়ের জীবনে আস্তে আস্তে যুগান্তর সৃষ্টি হ'য়ে যাবে। যে যত জীবন্ত, তার দিগন্তের পরিধি তত বিস্তৃত। গৃহীরা গৃহকোণের অন্ধকারে জীবন-যাপন করলেও ধ্যানদৃষ্টির অনুশীলনের ফলে প্রতিটি গৃহকে এক একটী এমন কর্ম্মশালায় পরিণত কত্তে পারে,

যার কাজই হচ্ছে ভাবী জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের আগমন-সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।

ঈশ্বর-স্মরণ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন—ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর-স্মরণের দ্বারা ভণ্ডামি করা ছাড়া আর কোনো লাভ নাই, গুরুরা, পুরোহিতরা পৃথিবীর সব দেশে কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঈশ্বর নামে কিম্ভূতকিমাকার একটা বস্তুর প্রচার করেছে,—এসব কথা ততকালের পুরাতন, যতকাল ধ'রে মানুষ ঈশ্বরের অনুগত হবার চেষ্টা কচ্ছে। সুতরাং এসব বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে তোমার ঢোকবার প্রয়োজন নেই। কুশাগ্রধী মহান্ তার্কিকেরা তর্কযুদ্ধ শেষ ক'রে যেদিন এই বিষয়ে একটী স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়ে রঙ্গমঞ্চটী পরিত্যাগ কর্ব্বেন, তার পরের দিন থেকে দরকার হ'লে আমরা বেচারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ কর্ব্ব। এখনই তাকে সন্দেহ-বশবর্ত্তী হ'য়ে কাণ পাকড়ে বিদায় দিতে পারি না। সুতরাং আমাকে বা তোমাকে দিনান্তে একবার হ'লেও ঈশ্বর-স্মরণে বস্‌তেই হবে। কারণ, উপায় নেই। বুকের ভিতর থেকে আওয়াজ উঠ্‌ছে। হরিওঁ, ঈশ্বর আছেন। এটাকে চেষ্টা ক'রেও থামানো যাচ্ছে না। পার যদি দিনে রাত্রে চার বার ঈশ্বর-স্মরণে বস্‌বে। না পার, অন্ততঃ দুবেলা দুবার। তাও না পার ত', একবার ত' বসবেই বস্‌বে। অন্যেরা দেখ্‌লে হয় প্রশংসা

ক'রে তোমার ক্ষতি করে, নয় নিন্দা ক'রে তোমাকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে। বেশ ত' সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে তুমি মশারির নীচে ব'সেই ঈশ্বর-স্মরণ কর কিন্তু অতিরিক্ত রাত্রি-জাগরণ ক'রো না। রাত্রি-জাগরণের ক্লেশ থেকে ভক্তদের অব্যাহতি দেবার জন্য আমি অষ্টপ্রহর-কীর্ত্তনকে ছোট ক'রে এনে উদয়াস্ত কীর্ত্তনে পরিণত করেছি, এই কথাটা হয়ত শুনেছ। অযথা রাত্রি-জাগরণের দ্বারা শরীরকে ক্লান্ত কর্লে দিনের বেলা তুমি সিংহের বিক্রমে অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজগুলি কর্ব্বে কি ক'রে? নিরিবিলি, একান্তে বা নির্জ্জনে বসার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর-স্মরণ, রাত্রি-জাগরণটা তোমার যেন উদ্দেশ্য হ'য়ে না দাঁড়ায়। লক্ষ্যকে ভুলে গিয়ে উপলক্ষ্যকে কখনো বড় ক'রে দিও না। এক এক বৈঠায় দশ মিনিট, বিশ মিনিট বা একঘন্টা ঈশ্বর-স্মরণ যথেষ্ট জান্‌বে। দিবারাত্রিতে যদি চার বার বসতে পার,—সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় আর শয়নকালে,—তা' হ'লে সংক্ষেপে কাজ সারার জন্য দুবার দশমিনিট ক'রে এবং দুবার বেশী সময় ক'রে ঈশ্বর-স্মরণ কর্ব্বে। দিনের কামাই পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অত্যধিক রাত্রিজাগরণ কোনো কাজের কথা নয়।

হাতে পায়ে ঝিঁঝি ধরিলে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বর-স্মরণে ব'সে থাক্‌তে

থাক্‌তে পায়ে ঝিঁঝি ধ'রে গেলে, আসন অর্থাৎ বসবার ভঙ্গী বদলে নেবে। পদ্মাসনে কাজ শুরু করেছিলে, কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল ত' সিদ্ধাশনে বস। বারংবার আসন মানে বসবার ঢং বদল কর্ল্লে কোনো দোষ হয় না। এ নিয়ে মন খারাপ করার কোনো সার্থকতা নেই। শরীরের কোনও স্থানের রক্ত-সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘট্‌লেই টন্‌টন করে বা ঝিঁঝি ধরে। শরীরে অত্যধিক আলস্য এসে গেলে উপযোগী দুই একটী মুদ্রাও ক'রে নিতে পার। ভাত খেতে খেতে পিপাসা পেলে যেমন মাঝে মাঝে এক এক চুমুক জল পান কর, এই ব্যাপারটাও তদ্রূপ।

সাহসের প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— কাজের চেয়ে প্রচার বেশী হ'লে সাধন-জীবন বড়ই বিঘ্নিত হয়। সুতরাং মশারির নীচে ব'সে জপ করা দোষের নয়। কিন্তু লজ্জা বা ভয় বশত যদি লুকিয়ে সাধন কর, তা' হ'লে এই লজ্জা আর এই ভয় তোমাকে সমস্ত জীবন নিজের কব্জায় ধ'রে রাখ্‌বে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন,—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়। সাহস ক'রে তোমরা যদি প্রতি জনে যার যার সাধন প্রকাশ্যেই কর, তবে সেই দৃষ্টান্তের সুফল অন্য অনেক ভীতিগ্রস্ত শঙ্কাতুর তরুণের মনে ক্রিয়া কর্ব্বে। সৎকাজও বহু লোকে যদি না করে, তবে লজ্জা-লজ্জা ভাব আসে। অসৎকাজ

যখন লোকেরা দলবদ্ধ হ'য়ে করে, তখন তারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়ান্যায় বিসর্জ্জন দিয়েও নির্লজ্জ হ'তে ভয় পায় না। হাজার লোক যখন নির্লজ্জ হ'য়ে প্রকাশ্য দিবালোকে পাইকারি হারে নারী-ধর্ষণ করে, তখন অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের তরুণরাও প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার উপরে নিজেদের পরিহিত লুঙ্গী খুলে ফেলে অতীব কুৎসিত ক্রিয়ায় মত্ত হ'তে কুণ্ঠা বোধ করে না। কয়েক বৎসর আগে পাবনা জেলার বহু গ্রামে ও গঞ্জে এইরূপ নির্লজ্জতার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল। সদ্দৃষ্টান্তের ফলে পশুও দেবতা হয়, কুদৃষ্টান্তের প্রভাবে দেবতাও পশু হয়। যে সব দুর্ঘটনা অতীতে ঘটে গেছে, অনুরূপ কারণ ঘটলে অনুরূপ পরিস্থিতিতে অনুরূপ ঘটনা জগতের সব স্থানেই বারংবার ঘট্‌তে পারে। মানুষের ভিতরের জন্তুকে খুঁচিয়ে জাগানোর দৃষ্টান্ত লজ্জাজনক ব'লে পরিগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। মানুষের ভিতরের দেবত্বকে ফুটিয়ে তোলার দৃষ্টান্তকে দেবমানব-যুগের ঊষা-প্রকাশের সহায়ক ব'লে মনে করা উচিত। প্রত্যেকে তোমরা একটু একটু ক'রে সাধন-বল সঞ্চয় কত্তে থাক। সমভাবের ভাবুকেরা ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হও। পরস্পরের প্রতি পরমা প্রীতি তোমাদের সম্বল হোক্‌। দেখ্‌বে, মুষ্টিমেয় হ'য়েও অক্ষম অপটু অনভিজ্ঞ হ'য়েও তোমরা অনায়াসে পর্ব্বত-লঙ্ঘন কর্ব্বার যোগ্যতা প্রদর্শন ক'রে চতুর্দ্দিকের কৌতূহলী চক্ষুগুলিকে চমৎকৃত ক'রে দিতে পাচ্ছ।

নারী ও পুরুষের সার্থকতা

অপর একজনের একটী বিরাট প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"নারী-জীবনের সার্থকতা তার মাতৃত্বে,"—এই কথাটার মানে হচ্ছে এই যে, মাতৃত্ব হওয়া চাই প্রকৃত মানুষের মত মানুষকে সন্তান রূপে জন্মদানে। "মা হওয়া নয় সোজা কথা, কেবল প্রসব কর্লেই হয় না মাতা,"—বলেছেন সাধক রামপ্রসাদ। সন্তানের মা হ'লেই মাতৃত্ব পেল ব'লে মনে ক'রো না। পুরুষের পিতৃত্ব-শক্তির ব্যবহার ব্যতীত মায়ের মাতৃত্ব-বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং বুঝতে হবে যে, মায়ের মাতৃত্বের দ্বারা সার্থকতা অর্জ্জন কত্তে হ'লে পিতার পিতৃত্বও সঙ্গে সঙ্গে সফল হওয়া প্রয়োজন। একটী সন্তান মাতৃগর্ভে প্রবেশ কর্ল্ল,—এর দ্বারাই পিতার পিতৃত্ব সার্থক হয় না। মাতার গর্ভে থেকে সন্তানটী ভূমিষ্ঠ হ'ল, এর দ্বারাই মাতার মাতৃত্ব সার্থক হয় না। প্রসূত সন্তান মানুষ হ'ল, না বানর হ'ল, পশু হ'ল, না দেবতা হ'ল, স্বার্থপর জানোয়ার হ'ল, না পরার্থপ্রেমী দেবদূত হ'ল, তার উপরে পিতার পিতৃত্বের ও মাতার মাতৃত্বের সার্থকতা নির্ভর করে। সব স্ত্রীলোকেরাই সন্তান প্রসব ক'রে মা হয় না, সব পুরুষেরাই সন্তানের জন্মদান ক'রে পিতা হয় না, অনেক পুরুষ ও নারী সমগ্র জগতের কাছে পিতার বা মাতার সম্মান পেয়েছেন, একটী সন্তানেরও জনক-জননী না হ'য়ে। মাতৃত্বের সার্থকতা

তার সন্তানের জীবনাদর্শের মধ্যে নিহিত। পিতৃত্বের গৌরবও সেই খানেই। "নারী-জীবনের সার্থকতা তার মাতৃত্বে"; বাক্যটুকুর মধ্যে "মাতৃত্ব" শব্দের একটা আলাদা ব্যঞ্জনা রয়েছে। "মাতৃত্ব" মানে "প্রসব-ক্ষমতা প্রদর্শনের যোগ্যতা" নয়, "মাতৃত্ব" মানে এখানে "বিশ্বের সকলের কাছে মা রূপে প্রতিভাত হবার অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক বৈভব-শালিতা।" জগতের প্রত্যেকটী নারীকে আমরা এই রকমের মা রূপে দেখ্‌তে চাই। তাই ত' আমি "কুমারীর পবিত্রতা" আর "সধবার সংযম" লিখেছি।

শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ

একজন প্রশ্ন করিলেন,— সাধুসন্তদের জীবনী বা উপদেশ পাঠ করে গেলেই একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর। এই কথাটার মানেই বা কি, শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ কত্তেই বা হয় কি প্রকারে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— কে কি ভাবে ভগবানের নামজপ কর্ব্বে, তার উপদেশটুকু তার গুরুর কাছ থেকেই আসা ভাল। কারণ, শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ অনেক ঢংয়ে হ'তে পারে এবং হ'য়েও থাকে। এক সময়ে এক সাধুদের বিরাট দঙ্গলে আমি পড়েছিলাম, যাতে সহস্রাধিক সাধু আমাকে সভাপতি বা মণ্ডলেশ্বর ক'রে বসিয়ে নিজ নিজ

অভ্যাস অনুযায়ী নাম-সাধন কত্তে নিমগ্ন হ'য়ে গেলেন। এঁদের অধিকাংশেরই ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশের ক্ষমতা এত সুতীক্ষ্ণ যে, অনেকেই দুই চার মিনিটের মধ্যে একেবারে ডুবে গেলেন যেন এক অতল সমুদ্রের নীচে। তখন নানা জনের নানা অস্ফুট শব্দ লক্ষ্য ক'রে ক'রে আমি চমৎকৃত হ'লাম যে, শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপের কত রকম ঢংই যে হ'তে পারে। কিন্তু সব ঢংই নির্ব্বিচারে সকলের পক্ষে গ্রহণীয় হ'তে পারে না। কেউ হয়ত আবাল্য সাধন ক'রে নিজের ফুসফুসকে এমন শিক্ষাই দিয়েছেন যে, তাঁর পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য হঠকর্ম্মও অবহেলে ও নিরাপদে সম্পাদন করা সম্ভব। অধিকাংশেই হয়ত সেই পথটী মাড়ান নি, সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন ক'রেই কাজ কচ্ছেন। আমার মতে শেষোক্তরাই বেশী চতুর। কারণ, তাঁরা স্বভাবের উপর নির্ভর কচ্ছেন, ভগবান্ যে ভাবে যখন শ্বাস-প্রশ্বাস-বায়ুকে চালাচ্ছেন, তাঁরা তারই সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম অবিচ্ছেদ নাম স্মরণ ক'রে যাচ্ছেন। কোথাও তাঁদের চেষ্টার মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছার উপরে নূতন কোনও খবরদারী নেই, ভগবান্ চালাচ্ছেন বায়ুকে আর তাঁরা আভ্যন্তর-গমনে ও বহির্নির্গমে কেবল নামটী স্মরণ ক'রে যাচ্ছেন প্রেম-সহকারে। একে স্বাভাবিক যোগও বলা যেতে পারে। জোর নাই, জবরদস্তি নাই, অথচ অবিরাম নামস্মরণ। যতক্ষণ জীবন আছে শ্বাসপ্রশ্বাসও আছে। জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মে এবং স্বাভাবিক

প্রয়োজনে শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন চলার, চলুক, সাধকের তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যতক্ষণ তার সংজ্ঞা আছে, ততক্ষণ সে ভুলবে না যে, প্রতি শ্বাসে প্রতি প্রশ্বাসে তাঁরই নাম চলছে, যিনি সর্ব্বজীবের প্রিয়তম, যাঁর কাছে সর্ব্বজীব পরমপ্রিয়।

নানা সম্প্রদায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে জপের প্রথা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে শ্বাস প্রশ্বাসে নামজপের প্রথা কারা প্রচলিত কর্ল্লেন, তা আমার জানা নেই। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সাধকপুরুষদের মুখে "Breath God—ঈশ্বরকে শ্বাসে প্রশ্বাসে গ্রহণ কর," এই উপদেশ হাজার দেড়েক বৎসর পূর্ব্বেই শোনা গিয়েছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু তাও যদি হয়, তবু খ্রীষ্টানরা এর আদি প্রবর্ত্তক নন। বৌদ্ধ সাধকদের অনেক গুহ্য সাধনার মধ্যে শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপের আভাষ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদেরও আবির্ভাবের কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু হঠযোগীরা শ্বাসকে নিয়ে দারুণ সাধনা ক'রে গেছেন। সুতরাং শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ কাদের আবিষ্কার, তা বলা শক্ত। তবে, একথা বল্‌লে হয়ত ভুল নাও হ'তে পারে যে, এই সাধনার আদি জন্মভূমি ভারতবর্ষ। কবীরপন্থী সাধকদের মধ্যে অনেকে শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ করেন। আধুনিক কালে নানকশাহী

সাধকদের কাছ থেকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশায় এই সাধন পান এবং সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচার করেন ব'লে একটা কথা খুব প্রসিদ্ধ। বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাবেরও অনেক আগে যে সকল গুরুদেব ও গোস্বামী মশায়রা বাংলার পল্লীগ্রামে নিজ নিজ সাধন-ধর্ম্ম গোপনে প্রচার ক'রে ব্যাপক বিস্তার দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের অবদানের নিদর্শন নিয়ে কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গৃহস্থ-যোগী এইভাবেই সাধন করেন। এই সাধনের ব্যাপকতার দিক চিন্তা কর্‌লে, বল্‌তেই হয় যে, এই সাধন নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত বস্তু নয়, এ হচ্ছে ভারতের পুরাকালের কোনও অজানা পন্থের কালজয়ী বাহুবিস্তার।

শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপের ক্লেশ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন— শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ কত্তে প্রথম প্রথম একটু ক্লেশ বোধ হয়। এই ক্লেশ শ্বাস-কষ্টের ক্লেশ নয়, শুষ্কতার ক্লেশ। হরিনাম কীর্ত্তন কত্তে বস্‌লে অতি দ্রুত যে প্রেমাবেশ আসে, হরিনাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ কত্তে বস্‌লে তত কাঁচা অবস্থায় তেমন মধুস্বাদ মালুম হয় না। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতায়াতের উপরে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না ক'রে যদি কেউ কিছুকাল শ্বাসে ও প্রশ্বাসে নাম

জ'পে যেতে থাকে, তবে কিছুকাল পরে সে এক দিব্য প্রশান্তি আস্বাদন করে। সেই আস্বাদনটুকু লাভ করার আগ পর্য্যন্ত প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যাশী ও অধ্যবসায়ী হ'য়ে কাজ ক'রে যাওয়া।

সর্ব্বাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম-স্মরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,— ট্রেণে চেপেছ, মোটরে চলেছ এমন অবস্থায় শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ সহজ কাজ। কিন্তু পথ চল্‌তে চল্‌তে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ কঠিন ত' বটেই। সমীচীনও নয়। হয়ত রেললাইন ক্রস্ কচ্ছ, ঐদিকে একটা ট্রেণ আবার আস্‌ছে। এমন বিভ্রমকর সময়ে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপের চেষ্টা বরং বর্জ্জনীয়। গৃহস্থ যোগীদের কাউকে কাউকে বল্‌তে শুনেছি, স্ত্রী-সঙ্গম-কালেও নাকি তাঁরা শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপের কৌশল অভ্যাস কত্তে চেষ্টা করেন। বিষয়টা গৃহস্থদের নিজস্ব অনুশীলনের বিষয়। সুতরাং এ বিষয়ে আমি বাক্‌স্ফূর্ত্তি কর্ব্ব না। তোমরা নিজ নিজ দাম্পত্য জীবনে প্রয়োজন-মত তার পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পার। ফল ভাল বোঝ ত' অনুশীলন চালিয়ে যেতে পার। ফল মন্দ বোঝ ত' অনুশীলন ছেড়ে দেবে। তবে সহজ কথা এই যে, শরীরের আকুঞ্চন কালেই নিঃশ্বাস টানা এবং প্রসারণ-কালেই

প্রশ্বাস ছাড়া বিধেয়। আরও একটা কথা স্পষ্ট ক'রে মনে রাখবে যে, গৃহীদের পক্ষেও এসব অনুশীলন একমাত্র বিবাহিতা স্ত্রীর সাহচর্য্যেই হ'তে হবে, মধ্যযুগের প্রথামত পরনারীর সংসর্গ একেবারেই বর্জ্জনীয়। গৃহীদের জীবনে এমন বহু বিষয় অনুশীলনের আছে, যা একমাত্র গৃহীদেরই অলোচ্য। এজন্য এসব বিষয়ে জ্ঞাপিতব্য অনেক কিছু থাক্‌লেও আমার মুখ বন্ধ থাক্‌তেই বাধ্য। সেই বিষয়ে বৃথা কৌতূহলী হ'য়ো না।

আমার গুপ্ত-চর্চ্চা নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— এসব উপদেশ বা সংবাদ গুরুদেবেরা তাঁদের শিষ্যদের কাছে পরিবেশন ক'রে থাকেন, অতীব গোপনে। কিন্তু আমি কারো গুরুদেবও হ'তে চাই না বা কোনও গুপ্ততাও পছন্দ করি না। তাই অনায়াসে এসব কথা তোমাদের কাছে এক নিঃশ্বাসে ব'লে দিলাম। তোমরা আমার কথায় নেচো না। উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে উপযুক্ত উপদেশ নিয়ে তারপরে কাজে লেগে যেও। অনেক গুরুদেবেরা ব্যস্ততা-বশতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস বিষয়ে সম্যক্ উপদেশ তাঁদের শিষ্যদের দিয়ে উঠ্‌তে অবসর পান না, তার ফলে শিষ্যরা ভুল ক'রে কাজ করে এবং দীর্ঘকাল পরে হয়ত ঐ ভুলটীর জন্যই মারাত্মক ক্লেশে পতিত হয়। সেই ক্লেশ সাধারণতঃ শারীরিক উদ্বেগ এবং অসাধারণ ক্ষেত্রে মানসিক অস্থিরতাও হতে পারে। এসব ভেবে চিন্তে প্রত্যেকের কাজ করা উচিত।

ব্রহ্মচর্য্য কর ও করাও

একজন প্রশ্ন করিল,— আপনার লেখা বইতে পড়েছি, "ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও।" আমার মনে হচ্ছে যে, আমি একটা বই লিখে তাতে প্রচার করি "স্বরূপানন্দের লেখা বই পড় এবং পড়াও।" এই বিষয়ে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রসন্ন হাসিতে কক্ষ মুখরিত করিয়া দিয়া বলিলেন,— স্বরূপানন্দ যশ চায় না, মান চায় না, ধনও চায় না। সে চায় যে, দেশ ও জাতি তথা জগতের সকল মানুষ মানুষের মত মানুষ হোক্। তারই জন্য সে সর্ব্বত্র ব'লে বেড়াচ্ছে, প্রতিটি পত্রে লিখে যাচ্ছে, সংযত হও, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, পবিত্রতার অনুশীলন কর, সকলকে পুণ্যময় ও পবিত্র করার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ কর। এসব কথা আমিই প্রথম বলি নি, আমার আগেও আরো শত শত জন শত শত স্থানে ব'লে থাক্‌বেন। এসব কথা বলার জন্য আমিই পৃথিবীর শেষ মনুষ্যটী নই, আমার পরেও কোটি কোটি বৎসর ধ'রে অসংখ্য জীবহিতকামীরা এই কথা ব'লে যাবেন। সুতরাং এসব লোকদের বাণী প্রত্যেকের কাণে গিয়ে পুনর্ঝঙ্কৃত কর, এত' ভাল কথাই। একা যা ব'লে শেষ কত্তে পাচ্ছি না, তা শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'লে জগতের মঙ্গলই হবে। "ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও," একথা সবে বলুক। "ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও," একথা সবাই পালন করুক। "ব্রহ্মচর্য্য কর এবং করাও," এই

কথাটি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হ'য়ে থাকুক। জাতিরই বল বা জগতেরই বল অবসাদগ্রস্ত জড়তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার এইটিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ। ব্রহ্মচর্য্যের বনিয়াদে যখন শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন এবং সাধনার ক্রমগুলি স্থাপিত হবে, তখনই মানুষের ধরণী দেবতার স্বর্গে পরিণত হবে।

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানের কি কোনও কুফল হইতে পারে

আর একজন প্রশ্ন করিলেন,— ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষাদান-কার্য্য কখন আরম্ভ করা উচিত? আপনার ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক প্রতিকূল মন্তব্য ক'রে থাকেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা নিশ্চয়ই কচি বয়সে শুরু হওয়া উচিত। যখন পর্য্যন্ত ছেলেরা বা মেয়েরা কোনও প্রকার কদর্য্য কাজের কুশিক্ষা পেয়ে ওঠেনি, তখন থেকেই ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাদান আরম্ভ করা উচিত। আমার ব্রহ্মচর্য্য প্রচার-প্রচেষ্টায় যারা বিরোধিতা ক'রে আসছেন, তাঁদের প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, আমার ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারের ফলে ছেলে-মেয়েরা এমন অনেক কথা শিখে যাচ্ছে, যৌন ব্যাপারে যে কথা শুনবার বা শিখবার তাদের এখনো

উপযুক্ত বয়স হয় নি। ফলে, যে পাপ থেকে তাদের রক্ষা করা আমার প্রকৃত অভিপ্রায়, আমি আমার প্রচারণার দ্বারা তাদের প্রত্যেকের মনকে সেই পাপের দিকেই ঠেলে দিচ্ছি। এই অভিযোগ একবারে মিথ্যা, একথা আমি বলব না। কিন্তু অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী যে অজ্ঞতারই ফলে দুষ্ট লোকের শিকার হয়, একথা যে তার চেয়ে হাজার গুণ সত্য। "দৌড়ে ছুটিস না, সামনেই গভীর গর্ত্ত আছে," এই কথা ব'লে কাউকে সতর্ক ক'রে দিলে যদি কেউ সেই খানা-খন্দেই কৌতূহলী হ'য়ে নেমে যায়, তবে সতর্কতা-জ্ঞাপন-কারী দোষী সাব্যস্ত কেন হবেন, বল ত'! একজন এসে সতর্কতা-বাণী শুনিয়ে যাবার ফলে হাজার জন বিপদের জায়গায় সাবধান হ'য়ে চল্‌বে এটাই ত' স্বাভাবিক। জগতে জননেন্দ্রিয়-গত পাপে যত লোক আকৃষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে হাজার-করা নয় শত নিরানব্বই জন পাপ-পঙ্কে ডুবেছে নিজ নিজ অজ্ঞানতার ফলে, অপর চতুর উপদেষ্টার কূটকৌশলে। সাবধান-বাণী শুনে পাপে লিপ্ত হয়েছে, এক লক্ষে হয়ত মাত্র একজন দুজন।

জন্ম-শাসনের প্রচারে লজ্জা কি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— বাইবেলে আছে, জ্ঞানবৃক্ষের

ফল খেয়ে আদম ও ইভা স্থায়ী পাপের অভিশাপ পেলেন এবং স্বর্গ থেকে চ্যুত হলেন। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ বিষয়ে উপদেশ শুনলেই মানুষ লম্পট হবে, পাপাবদ্ধ হবে, এরূপ একটা কুসংস্কার মানুষের মনে থাক্‌তে পারে। কিন্তু তা সর্ব্বৈব অমূলক। বরং জ্ঞানই মানুষকে পাপ থেকে, অধঃপতন থেকে রক্ষা কত্তে পারে। সুতরাং জ্ঞান-বিতরণের বিরুদ্ধে কেউ যুক্তিতর্ক বিস্তার কত্তে এলে, তার কথা মেনে নেওয়া সঙ্গত হয় না। জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই পাপঘ্নী অস্ত্র, জ্ঞানই মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিটি বিপদে আত্মরক্ষার নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। তবে, দেশ, কাল, পাত্র বুঝে কাজ কত্তে হয় এবং মাত্রাবিচারের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। একটা অবান্তর বিষয়ের আমি অবতারণা কত্তে চাই, শুনবে? আজকাল পাশ্চাত্য দেশ থেকে কোটি কোটি মুদ্রার এমন সামগ্রী ভারতে আমদানী হচ্ছে, যার ব্যবহার শুধু জন্ম-শাসনে। এই সব জিনিষের খরিদ্দার যাতে ভারতে বাড়তে পারে, তার জন্য বিভিন্ন কোম্পানী ধীমান্ ও বিদ্বান্ পুরুষ ও নারী প্রচারকদিগকে প্রচারকর্ম্ম করার জন্যও এদেশে পাঠাচ্ছেন। এত অর্থব্যয় তাঁরা কচ্ছেন কি শুধু ভারতের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে পরাহিত কত্তে? ব্যবসা কত্তেও কি নয়? যতদিন লোকের মনে এই ধারণা থাক্‌বে যে, পাশ্চাত্যেরা ভারতের ভাল একটা বাজার সৃষ্টি কত্তে চায়, ততদিন এদের পরিশ্রম খুব

সুফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু প্রচারণার ফলে ভারত যদি কখনো বুঝতে পারে যে, অপরিমিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের পক্ষে মঙ্গলকর নয় বরং বিপজ্জনক, তখন কি সমগ্র জাতি উঠে পড়ে লাগ্‌বে না এই কথা প্রচারে যে, "যে যেভাবে পারো, জন্মসংখ্যা হ্রাস কর"? যদিও তেমন সময়টী কিছু দূরে, তবু সেই সময় এসে গেল ব'লে আমি ভাবছি। আমরা মৃদু স্বরে বলছি, "সংযমের সাহায্যে সংসারকে সুষমা কর," কিন্তু ওঁরা সবাই তখন চীৎকার ক'রে বলবেন,— কৃত্রিম উপায়ে জন্মসংখ্যা কমাও"। ওঁরা তখন রেগে মেগে বলবেন,— "বাঁচতে চাও ত' নূতন সন্তানের আবির্ভাব-সম্ভাবনাকে রুখে দাও।" যখন হাজার হাজার লোক উত্তেজিত কণ্ঠে কেবল একটী কথাই বলতে থাক্‌বেন,— "জন্মশাসন কর, জন্মশাসন কর," তখন কি ছোট শিশুরা, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কথাটীর আসল মানে বুঝতে একেবারে অক্ষম হ'য়ে থাক্‌বে? তা মনে করো না। তখন নিতান্ত নাবালক বাচ্চারাও এসে মা-বাবার গলা জড়িয়ে ধ'রে অনুনয়ের স্বরে বল্‌বে,—"বলো না মা, বল না বাবা, কিভাবে জন্মশাসন কত্তে হয়। তোমরা যদি জন্মশাসন কর, তবে আমরাও তা কর্ব্ব। শিখিয়ে দাও না, কি ভাবে কি কত্তে হবে!"

ব্রহ্মচর্য্য বলের আকর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— আমাদের ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার-

চেষ্টার কুফল তার চেয়ে মাত্রায়ও বেশী হবে না। আকারেও না। কিন্তু কুফল যদি দু এক জনের জীবনে ঘটেই যায়, তবে তার জন্য শঙ্কিত না হ'য়ে নির্ভীক মনে প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ত্তব্য ক'রে যাওয়াই ভাল। রোজ রোজ প্রসূতি-নারীদের যোনিপ্রদেশ দেখ্‌তে হয় ব'লে ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসক যদি রোগিণী দেখা বন্ধ করেন, তা হ'লে অনেক রোগিণীর অকাল প্রয়াণ রুখ্‌বার আর উপায় থাকে না। ভালোর মধ্যে যদি মন্দ থাকে, তবে মন্দের মধ্যেও কিছুটুকু ভাল আছে কি না, তার বিচার করা আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাপক প্রচার দেশ, জাতি ও জগৎকে বলিষ্ঠ কর্ব্বে, দুর্ব্বল করবে না কখনো। ব্রহ্মচর্য্য হচ্ছে বলের আকর, শক্তির উৎস, সৎপ্রেরণার স্তম্ভ। যে-কোনও আন্দোলনের ভলমন্দ দুই দিকই থাক্‌তে পারে। মন্দটুকু কিছু কাল পরেই ধরা পড়ে যাবে। তখন আমরা মন্দের সম্ভাবনাকে দূরে রেখে কাজ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্ব এবং তা-ই করা উচিত। জনসমাজের হিতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে যে দিকে যিনি যা-ই আন্দোলন পরিচালনা করুন, গোড়া থেকেই ভেবে নেওয়ার প্রয়োজন কি যে, এর দ্বারা অহিত হবেই হবে। এখনো দেশমধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন তেমন ভাবে দানা বাঁধে নি। দু-এক জন মনস্বী পুরুষ বা মহাপুরুষ ক্ষীণ কণ্ঠে ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তার কথা মাঝে মাঝে বলেছেন, কিন্তু তারই প্রভাব যাদের উপর পড়েছে, আমরা ত' প্রত্যক্ষ করেছি যে, সে সব নরনারীরা অন্যান্য

নরনারীদের চেয়ে বেশী ভাগ্যবান, বেশী নিরুদ্বেগ, বেশী সুখী। অল্প কিছু লোকের পক্ষে যা সুখের আকর, অধিক সংখ্যক লোকের পক্ষেও তা ত' সুখের আকর ব'লে প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

গুরু-বাক্যে বিশ্বাস ও শিষ্য

একজন প্রশ্ন করিলেন,— আমি এক গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছি, তিনি মন্ত্রও একটী দান করেছেন, তারপরে পরপর আরও চার পাঁচটি মন্ত্র দিয়ে বলেছেন, উপর্য্যুপরি সবগুলিই জপ ক'রে যেতে হবে। আমার ত' এখন আর গুরুবাক্যে বিশ্বাস হচ্ছে না। এখন আমি কি করি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— গুরুবাক্যে যার বিশ্বাস নেই, সে আবার কিসের শিষ্য? গুরু ব'লে মানার পরে বা দীক্ষা নেবার পরে তাঁকে মান্য করা, তাঁর বাক্য বিশ্বাস ক'রে কাজ করাই শিষ্যের উচিত। শিষ্য হবার আগেই বিচার-বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল যে, এত সাত-তাড়াতাড়ি দীক্ষা নেওয়া সঙ্গত কি না। অধিকাংশ লোকেই ত' গুরুকে না জেনে, না চিনে, না বুঝে, ঝোঁকের বশে বা হুজুগে প'ড়ে দীক্ষা নেয়। তাই এই দোলাচল-চিত্ত অবস্থা। দীক্ষাই যদি নিলে, তবে তোমাকে গুরুদত্ত সাধন প্রাণপণ যত্নে কত্তেই হবে। তবেই তুমি সাধনের প্রকৃষ্ট ফল লাভ কত্তে পার্ব্বে। গুরুতে সন্দেহ, সংশয়, অবাধ্যতা ও দুর্ব্বিনয় এলে, মনের ভাব গোপন না

ক'রে সরল ভাবে সব কথা তাঁর কাছে নিবেদন করা ভাল। অধিকাংশ স্থলেই এই সরলতার ফল ভাল হওয়ার কথা। কারণ, দৈবযোগে যাঁরা লোকগুরু হন, তাঁদের অধিকাংশেরই চরিত্রের ভূষণ তাঁদের ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, শিষ্যের স্বাধীন চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা, শিষ্যের সত্যিকার কুশলের প্রতি দৃষ্টি এবং নিজের প্রভুত্ব বিস্তারের দিকে নিশ্চেষ্টতা।

একটী আলম্বনই আবশ্যক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— ঈশ্বর-সাধন কত্তে হ'লে প্রকৃত প্রস্তাবে একটী মাত্র আলম্বনই আবশ্যক। বহু আলম্বন, বহু মন্ত্র, বহু প্রতীক, বহু দেবতার নাম জপ কত্তে গেলে মনের একলক্ষ্যতা কমে যায়, কাজ করার সময় ও সুযোগ হ্রাস পায়, ব্যস্ততা বাড়ে এবং নানা অসুবিধার সৃষ্টি স্বভাবতই ঘটে। সুতরাং পাঁচটা দশটা মন্ত্রের বদলে একটী মাত্র মন্ত্রে মনোনিবেশ করবার অধিকার গুরুর কাছ থেকে চেয়ে নিলে, তাতেও এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। জগতের যত মন্ত্র, সব মন্ত্রই তোমাকে একটী সুনির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে, যার নাম বৌদ্ধ পরিভাষায় বোধি, তান্ত্রিক পরিভাষায় সিদ্ধি, বৈদান্তিক পরিভাষায় ব্রহ্মজ্ঞান, বৈষ্ণব পরিভাষায় ইষ্টচরণ লাভ। একটা সুনির্দ্দিষ্ট অবস্থারই এই এতগুলি নাম দেওয়া হয়েছে। জগতের যত মন্ত্র, সব মন্ত্রেরই পরিণামে এই স্থানে

পৌঁছে দেবার ক্ষমতা আছে, যদি তুমি একান্ত ভাবে, একাগ্র মনে, অব্যভিচারিণী নিষ্ঠায় একটাতেই লেগে থাক। একটুকু রাম-চিন্তা, একটুকু কৃষ্ণ-চিন্তা, একটুকু কালিকা-চিন্তা, একটুকু খ্রীষ্ট-চিন্তা, একটুকু বুদ্ধ-ভাবনা,— সব রকমের সব কিছু একটু একটু ক'রে মিলিয়ে দরবেশী পোষাক পরায় সেই পরম প্রাপ্তিকে দ্রুত পাওয়া সম্ভব নয়। এই জন্যই যোগী পুরুষেরা সাধকের মনকে একাভিমুখী করবার জনই সব চেয়ে বেশী সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। "যে যা ধরেছ, তাই নিয়ে লেগে থাক; যেটা ধরেছ, তার যেন আর ছাড়াছাড়ি না হয়",—এই হচ্ছে তাঁদের যাবতীয় অনুশাসনের মর্ম্মকথা। কোনও গুরু যদি শিষ্যকে অনেকগুলি মন্ত্র দেন, তবে শিষ্যের অধিকার আছে তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নেওয়ার যে, সবচেয়ে বেশী পছন্দের সাধনটী কোন্ মন্ত্রে হবে। প্রথমে ডজন-খানিক মন্ত্র জপ ক'রে ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে, শেষটায় আস্তে আস্তে মন্ত্রসংখ্যা আপনিই কমতে থাকবে এবং পরিণামে একটী মন্ত্রই সর্ব্বজয়ী হয়ে অন্তরের অন্তরে চিরজাগ্রৎ থাকবে। সাধন কত্তে কত্তে এই অবস্থাটী নিশ্চয়ই হয়। সদ্‌গুরুরা একথা জানেন।

ধর্ম্মের জয়

একজন প্রশ্ন করিলেন,—মহাভারতে আছে যতো ধর্ম্ম

ততো জয়ঃ—যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়। অর্থাৎ অধর্ম্মের কখনো জয় হ'তে পারে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদিগকে অধার্ম্মিক ও পাণ্ডবদিগকে ধার্ম্মিক ব'লে মনে করা হ'য়ে থাকে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত পাণ্ডবদের যে জয় হ'ল, এটাকে ধর্ম্মের জয় ব'লেই ব্যাখ্যা করা হল। এ ব্যাখ্যা কি সমীচীন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধারণতঃ আমরা যাকে ধর্ম্ম ব'লে মনে ক'রে থাকি, তার জয় সর্ব্বত্র হয় না। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষদের ধারণাগুলি ভ্রমবর্জ্জিত নয়। পাপ-কর্ম্মের ফলে জীবনে আসে দুঃখ, সৎকর্ম্ম আনয়ন করে সুখ,—কিন্তু পাপ আর পুণ্য সম্পর্কে, সৎকর্ম্ম আর অসৎ কর্ম্ম সম্পর্কে, আমাদের ধারণাগুলি কি সুস্পষ্ট? অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধির দ্বারা এবং পরমেশ্বর-প্রদত্ত বিমল প্রজ্ঞার দ্বারা মানুষ প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি কর্ল্লে তবে অধর্ম্ম আর ধর্ম্মের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং তদ্রূপ হ'লেই সে নির্ভুল ভাবে সৎকাজ কর্ত্তে পারে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় দলেই তৎতৎপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরেরা অনেক ভুল, ভ্রান্তি, অন্যায় করেছিলেন। সুতরাং সত্য কথা বলতে গেলে পূর্ণ-রূপে ধর্ম্ম রক্ষা উভয় পক্ষের কোনও পক্ষই হয়ত কর্ত্তে পারেন নি। তাই আমরা ফলাফলে দেখি, বিজিতেরা যেমন নির্ব্বংশ হ'য়ে গেল, বিজয়ীদের দশাও প্রায় তাই। পঞ্চপাণ্ডব যে

রাজ্য ছেড়ে মহাপ্রস্থানে যেতে রুচিমান্ হলেন, তাতেও লক্ষ্য করি সেই পরাজয়ের আর একটা চিত্র। সর্ব্বতোভাবে রিক্ত অবস্থায় হিমালয় পর্ব্বতের এক এক স্থানে এক এক জনে পতিত না হয়ে, যদি রাজধানীতে বিবেক-বৈরাগ্যমণ্ডিত জীবন যাপন কর্ত্তে কর্ত্তে তাঁরা মহাপ্রয়াণ কর্ত্তেন, তবে তা অনেক বেশী উপদেশ-মূলক হ'ত। শোক উভয় পক্ষে সমান, দুঃখ উভয় পক্ষে সমান, শুধু জয় কথাটা উচ্চারিত হয় নি কৌরবপক্ষে, আর সেই কথাটা উচ্চারিত হয়েছে পাণ্ডব-পক্ষে,—পার্থক্যের মধ্যে শুধু এইটুকুই ত' দেখতে পাই। অবশ্য, এ হ'ল শাদা চোখে দেখার বিচার। অন্তর্নিহিত অর্থ যদি অন্য কেউ ঠিক বিপরীত দেখতে পান, তবে তাতে আপত্তি কর্ব্বার কিছু নেই। অতীত ইতিহাস ত' আমাদিগকে শিক্ষা দেবার জন্য। যে যেভাবে পারি, লোকহিতকর জীবন যাপনের জন্য প্রেরণা লাভ কর্ব্বার প্রয়োজনে যা এখন আজ দেখতে পাচ্ছি না, তা একদিন হয় ত' দেখতে পাব এবং নূতন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে নূতন ইঙ্গিত লাভ ক'রে ধন্য হব। প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণের ব্যাখ্যা এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন রকম হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

সম্পদলাভের কল্পনার দোষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ যে নানা কর্ম্ম করে,

তার ত' প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ লাভ করা। যশ, কীর্ত্তি, গৌরব, বিদ্যার্জ্জন, ধনলাভ প্রভৃতি সবই ত' মানুষ করে সুখলাভের উদ্দেশ্যে। সুখলাভের এই সকল বিবিধ প্রয়াসের মধ্যে সম্পদ লাভের প্রয়াসই হচ্ছে সর্ব্বক্ষেত্রে সব চেয়ে বিশিষ্ট। সম্পদ যদি কেউ লাভ কত্তে পারে, তবে তার পক্ষে ইচ্ছা কর্লেই নাম, যশ, কীর্ত্তি, গৌরব, সম্মান এবং চেষ্টা থাক্লে বিদ্যাবত্তাও অর্জ্জন সহজ হ'য়ে পড়ে। সুতরাং মানবীয় চেষ্টা সমূহের মধ্যে সম্পদ লাভের চেষ্টারই অগ্রণী ভূমিকা থাকে। কিন্তু এই জিনিষটী লাভ কত্তে হলেই যে মানুষ অপরের ক্ষতি সাধন কত্তে কুণ্ঠাহীন হ'য়ে পড়ে, এই বিষয়েও ত' দ্বিমত নাই। এক শ্রেণীর লোক যদি অপর শ্রেণীর সম্পদ অন্যায় ভাবে টেনে আনতে চেষ্টা না করে, অপরের ন্যায্য পাওনা থেকে তাকে যদি সুকৌশলে বঞ্চিত না করে, অপরকে ভোগা দিয়ে তাকে প্রবঞ্চনা ক'রে যদি কেউ কাউকে না ঠকায়, তাহ'লে কেউ অতি দ্রুত সম্পদশালী হ'তে পারে না। সমগ্র জীবন কঠোর শ্রম ক'রে দুই চারিজন লোক পরিণামে বিত্তবান্ যে হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু ধন-পিপাসা এমনই এক তৃষ্ণা যে, সে সবুর সইতে রাজি হয় না। সে চায় তাড়াতাড়ি বড়লোক হতে। সুতরাং পরকে ঠকান ব্যতীত তার আর কোন্ গতি আছে? সুতরাং জগৎকে যদি ধর্ম্মময় কত্তে হয়, তবে মানুষের ধন-সম্পদের পিপাসা

কমাতে হবে। শুদ্ধ বিচারবুদ্ধি নিয়ে যদি কেউ আত্ম-সংশোধনের কাজ নিয়ত না করে, তা হ'লে সে এই রাক্ষসী পিপাসার হাত থেকে কদাচ পরিত্রাণ পায় না। এটাই মহাভারতের প্রকৃত শিক্ষা।

কুমিল্লা

৩১শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৪২
(১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৬)

কতকগুলি পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছে। সুতরাং দিনাজপুরের পরে এবং কুমিল্লার পূর্ব্বে যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ সম্ভব নহে।

৩০শে চৈত্র রবিবার রাত্রি ১১টায় শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা পৌছিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ১লা বৈশাখ (১৩৪৩) এর এক পত্রে (কুমারীর পবিত্রতা, চতুর্থ খণ্ড, ত্রয়োদশ পত্র, পৃষ্ঠা ৫৪) দেখা যাইতেছে।

"রংপুর হইতে শেষ রাত্রে রওনা হইয়া সেদিন সন্ধ্যায় পৌছিলাম যশোহর, মটর-বাস রিজার্ভ করিয়া রাত্র এগারটায় পৌছিলাম মাগুরা, রাত্রে একটায় রওনা হইয়া প্রাতে নয়টায় পৌছিলাম কামারখালি ঘাট, সাড়ে বারোটায় পৌছিলাম রাজবাড়ী, সমস্ত রাত্রি গোয়ালন্দ ঘাটে ষ্টীমারে যাপন করিয়া এবং পরের দিন সারাদিন ও অর্দ্ধেক রাত্রি ষ্টীমার ও রেলপথে কাটাইয়া তবে কুমিল্লা পৌছিয়াছি।"

আমি অলৌকিক নহি

মধ্যবর্ত্তী সময়ের কাগজপত্রে লেখা রহিয়াছে, শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— যে যেখানে যা ,পেয়েছ, তা নিয়ে নীরবে কাজ ক'রে যাও। শোরগোল ক'রো না। চিঠি দিয়ে না জানালেও যে গ্রামশুদ্ধ বা শহর শুদ্ধ সব লোকে শুধু স্বপ্নের দ্বারাই যার যার আবশ্যকীয় খবর ও নির্দ্দেশ পেতে পার, সেই শক্তি এবং সেই যোগ্যতা যে তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে রয়েছে, এইটুকু প্রত্যক্ষ ক'রেই কৃতজ্ঞ হও যে, পরমেশ্বর হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-নির্ব্বিশেষে সকলকে এই ক্ষমতা জন্ম থেকেই তোমাদের দিয়ে রেখেছেন। একযোগে বহু স্থানে বহু জনে যদি একই নির্দ্দেশ এবং একই উপদেশ পেয়ে থাক, তবে আরও চমৎকৃত হও যে, পরমেশ্বর ইচ্ছা কর্‌লে আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তা না নিয়েই তোমাদের অন্তরে তাঁর আদেশ এবং প্রত্যাদেশ জানাতে পারেন। সে আদেশ ও প্রত্যাদেশ তাঁরই মহিমাকে প্রচারিত কর্ব্বার জন্য, আমাকে প্রচার করার জন্য নয়। তোমরা আমাকে কখনো দেখনি, দুচার জনে নাম মাত্র শুনেছ, তবু আমার প্রাণের অন্তরঙ্গ সাধনা যে তোমাদের কাছে আপনা আপনি প্রকাশিত হ'য়ে গেল, তার উদ্দেশ্য এই যে, আমি যা নিয়ে বা যা দিয়ে পরম শান্তির আস্বাদন করেছি, তোমরাও প্রতিজনে তা' নিয়ে তা' দিয়ে প্রকৃত শান্তিকে আস্বাদন ক'রে ধন্য হও।

আমি অলৌকিক কিছু নই। আমি তোমাদেরই প্রতিজনের মত একেবারে সাধারণ, একেবারে লৌকিক। আমাতে অসাধারণত্ব আরোপ ক'রে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে পরমেশ্বরের দিক্ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে ঠকে যেও না। পরমেশ্বরই জগতে প্রত্যেকের আরাধ্য, আমি নই। বলবে, যীশু কি নিজেকে আর পরমেশ্বরকে অভেদ জ্ঞান করেন নি, তিনি কি বলেন নি,—I and My Father are one? মহম্মদ কি নিজেকে পরমেশ্বরের রসুল বা প্রেরিত পুরুষ ব'লে প্রচার করেন নি? শঙ্করাচার্য্য কি সোঽহং ব'লে উপলব্ধি না ক'রেই ব'লে বেড়িয়েছেন,— জীব ও ব্রহ্ম এক? আমিও উপলব্ধির বেলায় তা আস্বাদন করি। পরম সত্য উপলব্ধি সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত নই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কখনো নিজেকে শ্রীরাধা ব'লে জানছেন, কখনো নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ ব'লেই জান্‌ছেন, কখনো বা নিজেকে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ ব'লেও অনুভব কচ্ছেন। এগুলির একটাও মায়া নয়, একটাও মিথ্যা নয়। আমি নিজেকে অধিকাংশ সময়ে বা সুপ্ত ভাবে সর্ব্বক্ষণেই এমন এক সত্তার সঙ্গে অভেদ ব'লে জান্‌তে পাচ্ছি, যাঁর বিষয়ে মৌখিক স্বীকৃতি কদাচ আমি দিতে পারব না। অন্তরের উপলব্ধি অন্তরেই থাকুক। তোমরা জেনে নাও, আমি অলৌকিক নই, আমি তোমাদেরই প্রতি জনের মত; প্রতি জনের সমান, প্রতিজনের অনুরূপ সমান

সাধারণ, সমান লৌকিক। তোমাদের প্রতিজনের অন্তরে বিশ্বপ্রভুর অমিত শক্তি বিরাজিত, তারই জ্ঞানময় আলোকে তোমরা আমার বিনা তারের টেলিগ্রাফ পেয়ে এত রাত্রে আর এত ভোরে যশোহর, মাগুরা, কামারখালি ঘাট, রাজবাড়ী ষ্টেশানে এসে ভিড় জমিয়েছ। জনরবরটনাকারী রসনার চঞ্চলতাকে স্তব্ধ কর। কারো জানবার প্রয়োজন নেই যে, কেন তোমরা এতগুলি লোক দল বেঁধে এমন অসময়ে আমার মত অপরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছিলে, কি জেনে, কি শুনে এসেছিলে, কেনই বা হৃষ্টচিত্তে যার যার গৃহে ফিরে যাচ্ছ। তোমাদের জনে জনের বিভিন্ন ধর্ম্মের বেড়া ভাঙ্গতে একটু কষ্ট হ'ল না, সব ধর্ম্মই যে এক পরমেশ্বরকে নিয়ে, এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ কত্তে তোমাদের জন্য হাজার তর্ক হাজার বিচার উপস্থিত কত্তে হ'ল না, আপনা আপনি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে তোমরা জেনে নিলে যে সব মন্ত্র সত্য, সব তন্ত্র সত্য, সব মন্ত্র মিলে এসে একটা মন্ত্রই হয় এবং সেই একটী মাত্র মন্ত্রমূলে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নানা মতধারী নানা পথচারী আমরা প্রত্যেকে এক। যিনি জানাবার, তিনি জানিয়েছেন, আমি নই। আমার কণ্ঠ কথা বলে নাই, আমার মুখবায়ু তোমাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই, পরমেশ্বর তাঁর অশরীরী স্বরূপে তোমাদের কাছে এসে তাঁর করণীয় কাজ ক'রে গেছেন, ধন্যবাদ দাও তাঁকে, প্রণাম কর তাঁকে, বিশ্বাস কর তাঁকে। তাঁর দিকে অনিমেষ নয়নে দিবারাত্রি

তাকিয়ে থাক, তাঁর চরণে শীত গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ষা ব্যেপে অবিরাম প্রণাম নিবেদন কর। তিনিই একমাত্র উপাস্য, তিনিই একমাত্র ধ্যেয়, তিনিই একমাত্র আরাধনীয় পরমসুন্দর ও আনন্দময় প্রভু।

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—আমার ভিতরে যা আছে, তার সবগুলি গুণ তোমাদের প্রতিজনের ভিতরে আছে। আমার কাছে কিছু পেয়েছ ব'লেই আমার কাছে তোমরা আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হয়েছ, এমন কথা আমি মনে করি না। অন্যান্য গুরুদেব বা ধর্ম্মাচার্য্যদের সঙ্গে এই জায়গায় আমার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তোমাকে কিছু দেওয়ার হেতুভূত হয়েছি ব'লেই বিনিময়ে তোমার কাছে আবার কিছু দাবী কর্ব্ব বা মনে মনে প্রত্যাশা রাখ্‌ব, এটা আমার ধাতে সয় না। অবশ্য, এর ফলে তোমাদের অনেকের দুর্ব্বিনীত হবার সম্ভাবনা এসে যেতে পারে। এর ফলে তোমাদের অনেকের মধ্যে অকৃতজ্ঞতা-দোষের সমাবেশ ঘটতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বিনয় বা অকৃতজ্ঞতাকে ইন্ধন দেবার জন্য আমার এই অনাসক্তি নয়। আমার এই অনাসক্তি তোমাদিগকে সুবিনীত ও কৃতজ্ঞ কর্ল্লেও কত্তে পারে। আমি তোমাদের জীবন-কর্ম্মে কোনো বাধার সৃষ্টি কত্তে চাই না, এইটিই আমার বক্তব্য। কখনো আমার বিষয় চিন্তা কর্ল্লে যদি জীবনের উন্নতি সম্পর্কে প্রেরণা লাভ

কর, তবে আমার বিষয়ে নিশ্চিতই হিতকর। যদি আমার কথা মনে কর্‌লে তোমার পরমেশ্বরের কথা ভুল হ'য়ে যায়, তা'হলে আমাকে ছেঁড়া কাগজের ন্যায় রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিও। আমি ত' শুধুমাত্র তোমার ঈশ্বর-লাভের উপলক্ষ্য মাত্র, এর বেশী আমি নিজেকে কিছুই মনে করি না।

পূজা কর পরমেশ্বরকে

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,— একটা কথা শুনবে? হাসির কথা। কিন্তু হয়ত তা আংশিক সত্য। মিসেস ম্যাব্‌ল্ পটার (Mrs. Mabble Potter) নামে একটি আমেরিকান মহিলা একটা বই লিখেছেন। তার নাম হচ্ছে Hindu Invasion in America—হিন্দুদের আমেরিকা আক্রমণ। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, হিন্দুরা দলে দলে আমেরিকাতে এমন সব ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাচ্ছে, যারা ঈশ্বর-ভজন ছেড়ে দিয়ে রক্তমাংসের গড়া মানুষ-গুরুকেই ঈশ্বর ব'লে ভজনা কত্তে শিক্ষা দিচ্ছে। এর ফলে এমন সব অনাচার সেই দেশে কিছু কিছু দীক্ষাগুরুর দ্বারা হচ্ছে, যা অতিশয় ন্যক্কারজনক ও লজ্জাকর ত' বটেই, অধোগতি-বিধায়কও বটে। অবশ্য, এমনও হ'তে পারে যে, আমেরিকার ঐ লেখিকা মিথ্যা প্রচারই করেছেন। কারণ, ঐ দেশে মিথ্যাবাদী নেই, এমন কথা কে বল্‌তে পারে? এ ব্যাপারটা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সত্য সত্যই ঘটে থাকে! এই

জন্যই আমি তোমাদের বল্‌ছি, আমাকে নয়, পূজা কর পরমেশ্বরকে। পরমেশ্বরই প্রতিটি সাধকের সকল সাধনার মূল লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য হউন। ভগবানের চেয়ে যিনি এক কণাও ছোট, তার জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হবে না, হতে দেব না, এই জিদ্ থাকা চাই। সর্ব্বগুণাকর, সর্ব্বশক্তিধর, সর্ব্বসুখাগার, সর্ব্বপিপাসার পরম পরিতৃপ্তি-স্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ভজনা কর্ব্ব এবং তারই জন্য একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হব। এর মধ্যে এই বস্তুজগতের কাম, মোহ, আসক্তি ও আবিলতাকে ঢুকতে দেব না, এই জিদ্ চাই।

কোনও মানুষকে ঘৃণা করি না

কুমিল্লাতেও কয়েকজন আসিয়াছেন। তাঁহারা নাকি স্বপ্নে শ্রীশ্রীবাবামণির কাছে প্রণবমন্ত্রে দীক্ষা পাইয়াছেন। দুই একজনের দীক্ষার প্রসঙ্গটা মনে আছে, মন্ত্র মনে নাই। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাকেই যদি গুরু ব'লে মনে ক'রে থাক, তবে আমার ফটোখানার সামনে ব'সে প্রতীক্ষা কর। একদিন নিশ্চয়ই ওম্ এই পরমমন্ত্র আমার কণ্ঠেই শুনতে পাবে। এখনি আমার কাছ থেকে প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষা নেবার প্রয়োজন নেই। একদিন গুরু ছাড়াই লক্ষ লক্ষ লোকের প্রণব-দীক্ষা হবে আমার একখানা প্রতিচিত্র মাত্র সেদিন প্রয়োজন হবে। তবে দিনটা অনেক দূরে। তার আগে অনেক কাজ আমারও করবার আছে, তোমাদেরও করবার

আছে। ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় সব কিছু হবে, চালাকী ক'রে কৌশল দিয়ে, বা প্রচারণার ফলে কিছু হবে না। তোমরা আমাকে গুরুরূপে যদি পেয়েই থাক, তবে অন্তরে অন্তরে সে ভাব পোষণ কর। বাহিরে প্রচারের কোনো আবশ্যকতা নেই। কোনো মানুষের প্রতি আমার ঘৃণা নেই। জান্‌বে, সব মানুষের কাছেই আমি এভাবে যাব। আমি যাব তোমার শত জন্মের বন্ধনকে খুলে দেবার জন্য, নূতন ক'রে একটা দাসত্বের শৃঙ্খল তোমার কণ্ঠে পরিয়ে দেবার জন্য নয়। ক্রীতদাস দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই, বিশ্বভুবনের মঙ্গলকারী স্বাধীনচেতা সৎপুরুষ ও সৎমহিলাদের কর্ম্মোদ্যমকে উদ্দাম ক'রে দেওয়াই আমার লক্ষ্য। শিকল ভাঙ্গাই আমার কাজ, শিকল গড়া নয়। এজন্যই তুচ্ছতম মানুষটিকেও আমি ঘৃণা করি না।

ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকদের সম্ভাব্য কামচিন্তা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—স্বামীজী, আজ থেকে কয়েক দিন ধরেই নাকি কুমিল্লাতে আপনার বক্তৃতা হবে। বক্তৃতার বিষয় নাকি ব্রহ্মচর্য্য। আচ্ছা স্বামীজী, যাঁরা ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, তাঁদের মনে কি পরোক্ষ ভাবে কামচিন্তা আসে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেউ যদি অপরকে উপদেশ দিতে যায়, "চুরি ক'রো না," তাহ'লে চৌর্য্যক্রিয়াটা সম্পর্কে তার মনে নিশ্চয়ই একটা ছবি জেগে ওঠে। কোনো চিকিৎসক যদি তার রোগীকে উপদেশ দেয়, "মিঠাই-মণ্ডা খেয়ো না" তাহ'লে তৎকালে ডাক্তারের মনে মিঠাই ও মণ্ডার ছবি নিশ্চয়ই জাগে। ঠিক তেমনি কেউ যদি অপরকে উপদেশ দেয়, "ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ ক'রো না", তাহ'লে স্বভাবতই বক্তার মনে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের ছবি জাগে। কিন্তু ধাত্রী-বিদ্যা-বিশারদ নারীর প্রসব কার্য্যেও সহায়তা কর্ব্বেন, অথচ স্ত্রীযোনি দেখতে পাবেন না, এমন হ'তে পারে না। স্ত্রীযোনি যদিও কারোই দেখা উচিত নয় তবু পুরুষ ধাত্রী বিদ্যাবিশারদকে পরোপকারের জন্যই সেই নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখ্‌তে হয়, নতুবা প্রসূতির বিপদ ঘটতে পারে। ঠিক সেই রকমই ব্রহ্মচর্য্য-প্রচারকদের ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার-কালে এমন অনেক ছবি মনে মনে আঁকতে হয়, যা অন্য ক্ষেত্রে হ'লে তার পক্ষে সত্যই নিষিদ্ধ হ'ত। "পরস্ত্রী-সম্ভোগ ক'রো না",—এই একটী কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজ-স্ত্রী, পর-স্ত্রীর পার্থক্যবোধ, স্ত্রীসম্ভোগ ও স্ত্রীসম্ভোগে অনাগ্রহ, এই দুইটী পৃথক্ ছবি তার মনের ভিতরে আঁকতে হয়। এতে যে কোনো কোনো প্রচারকের মানসিক ক্ষতি হয় না, তা নয়, তবে তাকে এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবার জন্য ঈশ্বর-সাধন কত্তে হয়। অপরকে

কাম-চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত কত্তে গিয়ে নিবর্ত্তক ব্যক্তি যে-সকল চিন্তা এবং উপদেশের সহায়তা নেবে, সেগুলিও কাম-সম্বন্ধীয়ই ত' হবে। কিন্তু সে তার নিজ কামবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য এইগুলির সহায়তা নিচ্ছেনা, নিচ্ছে মহত্তর এবং উন্নততর এক সদুদ্দেশ্য। এই কারণে সাধারণ ঈশ্বর-স্মরণেই সে অনায়াসে আত্মরক্ষা কত্তে পারে। কিন্তু কোনো উপদেশদাতার পক্ষে এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতারও প্রয়োজন আছে। অন্যকে কাম-বিরত করার জন্য উপদেশ-দান কালে যদি উপদেষ্টার অন্তরে প্রচ্ছন্ন কামের উন্মেষ ঘটার সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহ'লে তার পক্ষে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকাই সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা।

প্রচ্ছন্ন-কামের প্রকৃতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— প্রচ্ছন্ন কামের রীতি ও প্রকৃতি, গতি ও ধারা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ধ'রে ওঠা অনেক সময়ে বড়ই শক্ত। হয়ত যেরূপ আচরণে এবং বাক্য-কথনে একটী স্বাভাবিক মানুষের (উপদেষ্টার) পক্ষে কোনও দোষ ঘটতে পারে না, প্রচ্ছন্ন কামের দ্বারা আক্রান্ত তেমন উপদেষ্টার পক্ষে কিন্তু তাতেও দোষের সৃষ্টি হ'য়ে যেতে পারে। এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্য-উপদেষ্টা মাত্রকেই আবেগবর্জ্জিত ভাবে কাজ ধরতে হবে এবং আবেগের স্রোতে

আধিক্য যাতে কদাচ না এসে যায়, তার দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কিন্তু সহস্র সহস্র স্থানে দেখা গিয়েছে যে, যিনি ব্রহ্মচর্য্য প্রচার কচ্ছেন, তিনি গোপনে গোপনে আবার দুচার জন মক্কেলের মস্তিষ্ক-চর্ব্বণও কচ্ছেন। এরূপ ক্ষেত্রে বাইরের লোকেরা এই দুষ্ট চক্রটী দেখতেও পায় না, আবিষ্কারও কত্তে পারে না। তাঁরা এই স্থির সিদ্ধান্তে ব'সে মনে মনে খুব স্বস্তি বোধ করেন,— "আমাদের ছেলেমেয়েগুলি খুব উন্নতির দিকে এগুচ্ছে,"—কিন্তু আসলে যে অনেক কাঁচা বাঁশ ঘুণে ধরার জন্য সকলের অজ্ঞাতসারে পেকে যাচ্ছে, সেই দিকে কল্পনা মাত্রও থাকে না। এইরূপ অবস্থা সমাজের পক্ষে অকল্পনীয় ভাবে মঙ্গল-ঘাতিকা। সাধুকথা ব'লে, সাধুত্বের ভাণ ক'রে, সাধু-প্রসঙ্গের মাধ্যমেও যদি এরূপ ব্যাপার নানা স্থানে গোপনে গোপনে চলতে পেরে থাকে, তাহ'লে নারী-নৃত্য-বিলাসের নামে এই ব্যাপারটা যে আরো অনেক বেশী উদ্দাম হ'তে পারে, তা বুঝতে হ'লে বেশী কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন হয় না। গীতাপাঠ আর ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ে কথোপনকে দিয়ে প্রচ্ছন্ন কামকে আড়াল দিয়েও যখন অনেক কুকাজ চলেছে এবং চলতে পারে, তখন নারীনৃত্যের মতন একটা লজ্জাহীন ব্যাপার যে আরো বেশী গলদ ঘটাতে পারে, এই বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ দেখি না। শুষ্ক নীরস কবিত্বহীন বেদান্ত-চর্চ্চাও যদি কোনো কোনো স্থলে কৌশলে মানুষের মন ও আচরণকে অধোগতি দিতে পারে, তাহ'লে

কাব্য, নাট্য, নৃত্য এবং সঙ্গীতকলা প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের সম্পর্কে সাবধান থাকা জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই অধিকতর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। সতর্কতা পাপ নয়, সতর্কতা প্রয়োজন।

নারী-নৃত্যের বিরোধিতা কেন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জাতি যখন বড় হয়, তখন সে শিল্পে, সাহিত্যে, অর্থনীতিতে, স্বাস্থ্যসম্পদে, দীর্ঘায়ুতে এবং অন্যান্য সহস্র রকমে যুগপৎ উন্নতি কর্ব্বার চেষ্টা করে। কিন্তু চরিত্র-বলই ত' আসল বল। এই বলটীকে না হারিয়ে যে-জাতি যত দিকে যতই উন্নতি কত্তে পারুক, তা-ই তার পক্ষে প্রশস্য। একটা জাতির চরিত্রের উন্নতি তার সৎসাহস, ধৈর্য্য, সততা এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের ক্ষমতা দিয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযমটা এমন একটা ব্যাপার, যাকে হাটে-বাজারে পরীক্ষা করা যায় না। আবার, চরিত্রহানি বা আদর্শ-স্খলনেরও প্রকাশ্য বিচারের রাস্তা প্রায় অবরুদ্ধ। তারই জন্য, যে-সব চর্চ্চায় বা অনুশীলনে, সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনায় বা অভ্যাস-করণে গোপনে গোপনে জাতির শক্তিক্ষয় হ'তে পারে, তার সম্পর্কে অতিরিক্ত সাবধানতা প্রয়োজন। নৃত্য একটা শিল্প। শিল্প-চর্চ্চা হিসাব তার অনুশীলন দোষের নয়। কিন্তু ঠিক যেই সময়টাতে জাতির যুবশক্তির যথার্থ প্রতীকেরা দেশমাতৃকার পরাধীনতার বন্ধন-মুক্তির ধ্যান করার অপরাধে

দলে দলে কারাগারে নিগৃহীত জীবন যাপন কচ্ছে, সেই সময়ে লাস্যলীলাময়ী সুন্দরী তন্বীদের দিয়ে মঞ্চে মঞ্চে নৃত্যলীলার অভিনয়, আর যাই হোক, স্বদেশ-সেবা নয়। খুব নামী লোকেরা, খুব ভালো লোকেরা, খুব জ্ঞানী, গুণী, প্রসিদ্ধ মানুষেরা এটাকে প্রবর্ত্তন কচ্ছেন ব'লেই যে এটা সময়োচিত বা সঙ্গত হ'ল, এমন মনে করা আর চিন্তার ক্ষেত্রে দাসত্ব স্বীকার করা এক কথা। শহরের হলগুলিতে টিকেট-ঘরে দামী দামী টিকিট বিক্রী হচ্ছে আর দেশের কাজের জন্য ইংরাজের কারাগারে অবরুদ্ধ থাকার সাহস যাদের নেই, সেই বাজে যুবকের দল হাততালি দিয়ে এই নৃত্য-বিলাস নয়নেন্দ্রিয় দিয়ে প্রাণপণে উপভোগ কচ্ছে, কুৎসিত মন্তব্য কচ্ছে, ফুলের তোড়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে ষ্টেজের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে চূড়ান্ত বেলাল্লাপনা দেখিয়ে,— চিন্তা ক'রে দেখ, এর প্রকৃত ফল কি হবে। বকসা, দেউলি, হিজলী আদি বন্দি-শিবিরে ব'সে ব'সে যারা দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা কচ্ছে, আর "হায় দুখিনী ভারতমাতা" ব'লে দিবানিশি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে, তারা যেদিন মুক্ত দিবালোকে এসে দাঁড়াবার অধিকার পাবে, তখন তারা দেশটাকে কি ভাবে দেখবে? সন্দ্বীপ, ককসবাজার, ময়নামতি, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, সোনামুখী আদি নানা স্থানে যারা স্বদেশকে ভালবাসার অপরাধে অন্তরীণের দুঃসহ জীবন-যাপন কচ্ছে, ভেবে দেখো,

তারা যদি একদা ফিরে এসে দেখ্‌তে পায়, দেশের যুবতীরা নাচ্‌ছে আর নাচ্‌ছে, যুবকেরা বিলাসের স্রোতে ভাস্‌ছে আর ডুব্‌ছে, সিনেমার দৃশ্যাবলীতে অশ্লীল থেকে অশ্লীলতর ব্যাপার সমূহের আড়ম্বর বেহিসাবী দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে, তখন তারা কি ভাব্‌বে, কি বল্‌বে, কি করবে? তারাও কি নাচিয়ে ধিঙ্গির দলে এসে যোগ দেবে, না, "ধরণী দ্বিধা হও" ব'লে সীতার ন্যায় পাতাল-প্রবেশ কত্তে চাইবে? শিল্প আর সাহিত্যের, কাব্য আর কবিত্বের নাম ক'রে দেশাত্মবোধের সমাধি নিশ্চয়ই আমরা কেউ কামনা কত্তে পারি না। ক্ষুদ্র একটী ছিদ্রকে আশ্রয় ক'রেই বন্যায় বাঁধ-ভাঙ্গা শুরু হয়, তারপরে ঘটে প্রলয়ঙ্কর প্লাবন, যা সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে অনশন, অনটন, বাস্তুত্যাগ, মড়ক এবং মৃত্যুকে। এখন কেউ ষ্টেজে উঠে মদ খায় না, একথা সত্য হ'তে পারে কিন্তু সেদিন এল ব'লে যেদিন দেখ্‌বে যে মদ্যপান না কর্ল্লে দেশসেবক হওয়া যায় না, মিথ্যার পূজা না করলে মানুষ ব'লে গণনীয় হওয়া যায় না, চরিত্রহীনতার নির্লজ্জতা না থাকলে সাহসী নেতৃত্ব প্রদর্শন অসম্ভব। জাতির চরিত্রচ্যুতি আস্তে আস্তেই হয় এবং যখন সে প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তা হয় অতীব ভয়ঙ্কর। "সঞ্জীবনীর" সম্পদ কৃষ্ণকুমার মিত্র এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তাই তিনি নারীনৃত্যের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে লেখনী ধারণ করেছেন। আমি অদূর

ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাই আমার কণ্ঠ নারী-নৃত্যের বিরুদ্ধে গর্জ্জন কচ্ছে। আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের গর্জ্জন হয়ত বৃথাই বাতাসে মিশে যাবে কিন্তু সবল-মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মানুষ যে অন্ততঃ দুইটা হ'লেও এই দেশে ছিল, আমরা দুজনে তারই প্রমাণ রেখে যাচ্ছি। যেখানে নৈতিক অধঃপাতের সম্ভাবনা, সেখানেই আমরা লড়াই দিব। এই বিষয়ে আমাদের আপোষ রফার প্রবৃত্তি নেই।

সৎ-জীবন ও সৎ-জীবিকা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সৎ-জীবন যাপন কত্তে হবে ব'লেই তুমি কোনো জীবিকাই গ্রহণ কর্ব্বে না, চাকরী-বাকরীও কর্ব্বে না, ব্যবসাও কর্ব্বে না, এ এক ভ্রান্ত মনোবৃত্তির কুফল। সৎ-জীবন যাপন করার জন্যই তোমাকে সৎ-জীবিকা নিতে হবে। যেরূপ জীবিকা গ্রহণ কর্ল্লে সৎ থাকা খুব কঠিন, সেইরূপ জীবিকার লোভ তুমি পরিহার কর কিন্তু তোমার পরিশ্রমের দ্বারা তুমি যদি সঙ্গত ভাবে অপরকে সাহায্য কত্তে পারো, উপকার দান কত্তে পার, তবে শ্রমের বিনিময়ে পয়সা নেবে না কেন? সৈনিকের জীবিকা কি সৎ? পুলিশের জীবিকা কি সৎ? গণিকার জীবিকা কি সৎ? মদ্য-বিক্রেতার জীবিকা কি সৎ? এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগে। হত্যা করা, ক্ষমতা হাতে থাকার দরুণ অপরের উপরে অন্যায় জুলুম করা,

মানুষকে সুরাপায়ী হ'তে, দুশ্চরিত্র হ'তে সাহায্য করা কি সৎ না অসৎ, এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগ্‌বে। স্থলবিশেষে যে কাজ সৎ, অপর স্থলে হয়ত সেই কাজটাই অসৎ,— এরূপ ঘটনা জগতে অহরহ ঘট্‌ছে। প্রতিটি মানুষ নিজের প্রতিটি কর্ম্মকে বিচার ক'রে দেখুক যে, সে সৎ পথে চলছে কিনা। নিজের কাজের সদসৎ-বিচারের ভার অন্যকে না দিয়ে নিজেরই নেওয়া উচিত।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ ও ঈশ্বর-প্রণিধান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— পরমেশ্বর তোমাকে বিচার-শক্তি দিয়েছেন, দিয়েছেন ভালমন্দের বোধ, দিয়েছেন আত্মপরীক্ষার সামর্থ্য। এই শক্তি, বোধ বা সামর্থ্য বর্ত্তমানে অবিকশিত রয়েছে। এই বোধ বা শক্তির চর্চ্চা কত্তে কত্তে ক্রমে তা বিকশিত হবে। ঈশ্বরে নিয়ত আত্মসমর্পণ কত্তে কত্তে তোমার ভালমন্দের বোধ প্রখরতর হবে। কোন্‌টা ভাল কাজ কচ্ছ, কোন্‌টা বা মন্দ কাজ হচ্ছে, তা নিয়ে বিচার-বিতর্কের বা হিসাব-নিকাশের আর প্রয়োজন হবে না। তোমার মনই তোমাকে ব'লে দেবে যে, এইটা ভাল, ওটা মন্দ। জগতে যত রকমের জীবিকার্জ্জনের পন্থা আছে, প্রত্যেকটীরই মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে পাপলিপ্ত হওয়ার, আবার প্রত্যেকটীরই পক্ষে সম্ভাবনা আছে পাপমুক্ত থেকে কাজ

ক'রে যাওয়ার। কি করলে পাপমুক্ত থেকে কাজ করা যায়, কি না করলে পাপে লিপ্ত হ'তেই হয়, তার নির্দ্দেশ যাতে তুমি তোমার মনের কাছেই পেতে পার, তারই জন্য তোমার ঈশ্বর-প্রণিধান প্রয়োজন। প্রত্যহ যারা মাল ওজন করে, তারা পরে বিনা তুলাদণ্ডেও মালের ঠিক ওজন ধরতে পারে। প্রতিটি কার্য্য বিচার ক'রে ক'রে ক'রে যেতে চেষ্টা কর। তার ফলে নিখুঁত কর্ত্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা তোমাতে আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে।

অল্পাহার, অত্যাহার ও অনশন

একজন প্রশ্ন করিলেন,— আচ্ছা বাবামণি, এত বড় ক্লেশকর একটা ভ্রমণের পরে কুমিল্লা এসে পৌছিবার পরেও আপনি এক কণা দুগ্ধ পান করেন নি, অথচ কাজ ক'রে যাচ্ছেন। এই স্বল্পাহার কি অত্যাচার নয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— স্বল্পাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের দ্রুত মৃত্যুর কারণ হয় না। বিচার ক'রে স্বল্পাহার করতে পারলে বরং দীর্ঘায়ুই লাভ হয়। অতিরিক্ত আহার বা ভোজন-বিলাসিতাই মানুষের স্বাস্থ্য-হানির সবচেয়ে বড় কারণ। যত কম খেয়ে যত বেশী কাজ করতে পার, ততই ভাল। তার মানে এই নয় যে, শরীরকে ক্লেশ দেবে, উদরের

পিত্তকে চড়িয়ে দেবে অথবা কতকগুলি অপুষ্টিকর খাদ্য খাবে। স্বল্পাহারের প্রথম সর্ত্ত হ'ল এই যে, সেই অল্প খাদ্য-পানীয় পুষ্টিকর হওয়া চাই।

চরিত্র-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— পরাধীন দেশে দারিদ্র্য মানুষের নিত্য-সহচর। অত্যধিক হারে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির দেশে খাদ্য-উৎপাদকেরা উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য বাজারে সরবরাহ দিতে পারে না ব'লেও দারিদ্র্য বিকট মূর্ত্তি ধারণ করে। উৎপাদকেরা খাদ্য-সম্ভার বড় বড় বাজারে নিতে পারে না ব'লে ফড়িয়ারা সে কাজটা করে এবং মুনাফার লোভে বাজারের দর চড়িয়ে দেয়। এভাবেও দেশের খাদ্যাল্পতা বাড়ে, অভাব বাড়ে, দুঃখ বাড়ে। স্বাধীন দেশেও দেখা যাচ্ছে, যারা খাদ্য উৎপাদন করে না, অথচ খাদ্য-বস্তুর সম্ভার নিয়ে কারবার করে, তাদের বিত্ত যত বাড়ে, দেশবাসীর খাদ্যাভাবও তত বাড়ে। একটা জাতি যদি সুদীর্ঘকাল অনুপযুক্ত পরিমাণ আহার্য্যের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে বাধ্য হয় বা আহারের অযোগ্য বস্তু খেয়ে প্রাণ ধারণ করে, তাহ'লে তারা হয় মহামারীর শিকার হয়, নয় অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে। সুতরাং আমার তোমার প্রত্যেকের আহার-

কালে বসে এই চিন্তাটা করা উচিত যে, আজ না জানি কত লক্ষ লোক এক মুঠা খাবারও পায় নি। একটা দেশে যখন ব্যাপক অনশন চলে, তখন বুঝতে হবে যে, দেশের সর্ব্বনাশ অতি নিকটে, অনশনের ক্লেশ থেকে সর্ব্বসাধারণকে বাঁচাবার জন্য শত শত সাহসী লোকদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিকার-চেষ্টায় লেগে যাওয়া প্রয়োজন। আর, সৎকাজে সাহস যাতে প্রচুর থাকে, তারই জন্য দেশব্যাপী চরিত্র-আন্দোলনের প্রয়োজন।

একজন বলিলেন,—সে আন্দোলন ত' আপনি অনেক কাল ধ'রেই কচ্ছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একা একা কি একটা আন্দোলন চলে, না সফল হয়? হাজার হাজার লোককে নেমে যেতে হবে দেশব্যাপী সচ্চরিত্রতা-প্রজননের কাজে। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণে চরিত্রবত্তার প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগিয়ে দিতে হবে যে! একদিন দেশবাসীর দরিদ্রতা হয়ত দূর হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু তখনও চরিত্র-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না। দরিদ্রতা চরিত্রহীনতা বাড়ায়, একথা যেমন সত্য, চরিত্রহীনতা দারিদ্র্য বাড়ায়, একথাও তেমন সত্য। কিন্তু দারিদ্র্য মানুষকে দুশ্চরিত্র করে বাধ্যকর ভাবে, আর সম্পদ মানুষকে দুশ্চরিত্র করে বিলাসিতার মোহে। দরিদ্র মদ খায় দারিদ্র্যের দুঃখ ভুলে থাকার জন্য।

দরিদ্রা রমণী সতীত্ব বিক্রয় করে দুমুঠো অন্নের জন্য। কিন্তু ধনপতি কুবের মদ খায়, পাপ করে ত' কেবল ইন্দ্রিয়ের পরাধীনতার দরুণ। লক্ষপতির সংসারেও নারী অসতী হয় কোন্ দারিদ্র্যের চাপে? রোম যখন সব চেয়ে বেশী ধনী, রোমক সাম্রাজ্য যখন তিনটা মহাদেশকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, সমস্ত পৃথিবীময় যখন রোমের জয়জয়কার, তখন তার সব চেয়ে দামী, নামী ও সম্পদশালী লোকগুলি দুশ্চরিত্র হয়েছিল কোন্ দারিদ্র্যের পীড়নে? তখন রোমক রমণীরা অসতী হয়েছিল কোন্ অন্নাভাবের কশাঘাতে? কৈশোরে আর যৌবনে তাদের জীবন-তরণীতে হাল ধরার কোনও কর্ণধার ছিল না, যে একবারটীও ব'লে দেয় যে, ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য জীবনের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। সুতরাং সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় চরিত্র-গঠন-আন্দোলন পরিচালনের প্রয়োজন আছে। দেশে দেশে যুগে যুগে যাঁরা এই আন্দোলন পরিচালন কচ্ছেন এবং অভ্রান্ত নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আমার মতে তত্তদ্দেশের তাঁরাই নমস্যতম দেশসেবক।

কাহাকেও উপেক্ষা করিব না

স্বাধীন ত্রিপুরার সোনামুড়া হইতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়াছেন, শ্রীশ্রীবাবামণিকে স্বাধীন ত্রিপুরার সোনামুড়াতে

যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে। শ্রীশ্রীবাবামণি ডাইরি দেখিয়া বলিলেন,—প্রোগ্রাম ত' হ'য়েই আছে। আমি আগামী ৬ই আষাঢ় সোনামুড়া যাব। জঙ্গলের প্রতি আমার চিরকালের এক আকর্ষণ। জংলীরা চিরকাল জঙ্গলে থাকবে না, অশিক্ষিতেরা চিরকাল অশিক্ষিত হ'য়ে প'ড়ে রইবে না। তাদের মধ্যেও শত শত শিক্ষিত ও সুসংস্কৃত মানুষের আবির্ভাব ঘটবে, যারা নিজ নিজ ত্যাগ, তপস্যা ও উৎকর্ষের বলে ভারতের সকল উচ্চবংশীয় শিক্ষিত লোকদেরও কিছু না কিছু সৎশিক্ষা প্রদান কর্ব্বে। সময় এসে গেছে, যখন কাউকে ছোট না ভেবে, কাউকে বর্জ্জন না ক'রে, কাউকে উপেক্ষায় উপহাস না ক'রে প্রাণভরা প্রেম নিয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন করা আবশ্যক এবং নিম্নমানের জীবন-যাপনের গ্লানি থেকে উদ্ধার ক'রে তাদের প্রতিজনকে উচ্চাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিকে আমরা যদি অন্ধ হ'য়ে থাকি, তবে তার প্রতিদান অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে আমাদের পেতে হবে।

পার্থক্য বিদূরণ আবশ্যক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— উন্নত ও অবনত এই দুইটী শ্রেণীতে যদি দেশের সমস্ত মানুষকে বিভক্ত করা হয়, তাহ'লে দেখা যাবে যে মধ্যবর্ত্তী আর একটা শ্রেণী আপনা আপনিই

হ'য়ে যাচ্ছে। নিম্নবর্ত্তীরা যদি মধ্যবর্ত্তী হবার চেষ্টা করে এবং মধ্যবর্ত্তীরা যদি উচ্চবর্ত্তী হবার চেষ্টায় অনলস থাকে, অন্য দিকে যদি মধ্যবর্ত্তী ও উচ্চবর্ত্তীরা যুগপৎ যদি নিম্নবর্ত্তীদের উন্নতি-সাধনে আত্মনিয়োগ করে, তাহ'লে ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে মানব-জাতির সামগ্রিক উন্নতি একদিন না একদিন আশা করা যেতে পারে। উন্নতি বলতে আমি এখানে গুণগত উৎকর্ষকে বোঝাচ্ছি। ধনগত সাম্য নিশ্চয়ই আবশ্যক কিন্তু চরিত্রগত উৎকর্ষ যদি সকলের সমান না হয়, তাহ'লে ধনসাম্যের দেশেও মানুষের উপরে মানুষের উৎপীড়ন বন্ধ হবে না। ধনগত সাম্য, শিক্ষাগত সাম্য, সুযোগ-সুবিধার সমতা নিশ্চয়ই কাম্য কিন্তু ছোট, মাঝারি, বড় সকলেরই মধ্যে গুণগত উৎকর্ষ বা চরিত্রগত উন্নতির প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। এজন্যই, কে ছোট, কে বড়, এই সবের বিচার না ক'রে যাকে যখন সামনে পাই, তখনি তার চরিত্রগত উন্নতি সাধনের প্রয়াসকে সন্ধুক্ষিত করার চেষ্টা আমাদের কত্তে হবে এবং কখনো বিদ্বজ্জন-পরিমণ্ডলে, কখনো অজ্ঞান অশিক্ষিত চিরমূর্খ অতিদীন জনসাধারণের মধ্যে কাজ কত্তে হবে। আমি সকলের মধ্যে কাজ ক'রে যেতে প্রস্তুত, তবে সুযোগটা দিতে হবে। যেখানে দাঁড়াই, সেখানেই তাকাই, দেখি কেবল কাজ, কাজের অন্ত নাই। একই সঙ্গে ত' আমি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াতে পার্ব্ব না। এটা যে মানুষের শরীর, যা হচ্ছে রক্তমাংসে গড়া এবং ক্ষমতায় একান্তই সীমাবদ্ধ।

ঐক্য, সাহস ও বল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— এজন্যই ত বারংবার বলি, তোমরা আমার বাহু হও এবং সকলের সকল বাহু একলক্ষ্য হ'য়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় কাজ শুরু করুক। ঐক্য সাহস বাড়ায়, বলও বাড়ায়। সাহসের প্রয়োজনে ঐক্য চাই, বলের প্রয়োজনেও ঐক্য চাই। ঐক্যবিহীন ধীমান্ জাতি দারুণ প্রয়োজনের সময়েও নিজ বুদ্ধিকে যোগ্যভাবে পরিচালিত কত্তে সমর্থ হয় না। ঐক্যবিহীন কুস্তিগীর পালোয়ানের দল কয়েকটা তুচ্ছ বলের ঐক্যবদ্ধ ছোকরাদের কাছে পরাজিত হ'য়ে যেতে পারে। জগতে যদি সত্যিকারের কাজ কিছু কত্তে চাও, তাহ'লে সর্ব্বাগ্রে ঐক্যের অনুশীলন কর। বল থাকলে ঐক্য হ'তেও পারে, নাও পারে কিন্তু ঐক্য এলে বল আস্‌বেই আস্‌বে। কারণ, ঐক্যই বলের উৎস।

ঐক্য এবং আদর্শ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, তথাকথিত ঐক্যের অনুরোধে তুমি আদর্শ বিসর্জ্জন দিতে পার কিনা, এই প্রশ্নটা আপনিই আসে। তোমাদের সমাজের সবাই মদ খায়, সুতরাং তুমি ঐক্যের অনুরোধে মদ্যপান কর্ব্বে, এটা হ'তে পারে না। কোনো কোনো সমাজে স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ মাত্রই একটী

কি দুটী রক্ষিতা পালন করেন। ঐক্যের অনুরোধে তুমিও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর্ব্বে, এমনটা হ'তে পারে না।

শেষ রক্ষা

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় ঈশ্বর-পাঠশালার প্রাঙ্গণে বক্তৃতারম্ভ হইল। সভাস্থল জনাকীর্ণ হইয়াছিল এক ঘন্টা পূর্ব্বেই। কিন্তু কেহই প্রত্যাশা করেন নাই যে, সভার কাজ ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আরম্ভ হইবে। সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেও অধিকাংশই শ্রীশ্রীবাবামণির ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বক্তৃতারম্ভের অভ্যাসের কথা জানিতেন। সভাস্থলে শহরের প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা এবং স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম সুদীর্ঘ অলঙ্কৃত বাক্যটী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক অধ্যাপক অপর অধ্যাপকের কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন,—আরম্ভটা ত' বড়ই চমৎকার হ'ল, কিন্তু বক্তা শেষ রক্ষা কত্তে পার্ব্বেন ত'? কথাটা শ্রীশ্রীবাবামণিরও কাণে আসিল। তিনি একটু মুচকি হাসিয়া বক্তৃতা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কুমিল্লার সেই দিনের এবং পরবর্ত্তী আরও একাদশ দিনের প্রতিটি সভার প্রতিটি শ্রোতা কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে, স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস কেবল শেষ রক্ষাই করেন নাই, তিনি আদিরক্ষা, মধ্যরক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বস্থানের সর্ব্বপ্রকার রক্ষাকবচ আঁটিয়াই বক্তৃতাদানে নামিয়াছিলেন।

অদ্যকার বক্তৃতা শেষ হইলেই ঈশ্বর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জানকী নাথ সরকার বলিলেন,—স্বামীজী, কৈশোরে স্কুল জীবনে তুমি চাঁদপুর স্কুলে পড়িবার কালে আমার ছাত্র ছিলে। সেই দিনই তোমাকে চিনিয়াছিলাম, যেদিন ক্লাসের টাস্ক হিসাবে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কবিতা দিলাম বঙ্গানুবাদ করিতে, আর তুমি বাংলা কবিতায় তাঁর ভাবার্থ নিমেষের মধ্যে তৈরী করিয়া দিলে। আমরা অবাক্ হই নাই কিন্তু প্রত্যাশায় ছিলাম যে তুমি আরও কত কি জানি দেশকে দিবে। আজ তোমার একটী মাত্র বক্তৃতার ভিতরে বিশ্বের সমস্ত দেশের সমস্ত কালের উৎকর্ষ ও উদ্বর্ত্তনের ইতিহাসে ভারতের আত্মোৎকর্ষের বিশেষত্ব তুমি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছ, তাহা একেবারেই অভাবনীয় ছিল। কলেজের প্রতিটি অধ্যাপক তোমার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছেন এবং বলিতেছেন, ধন্য, সুধন্য এই বক্তা, এমন ভাষণ আর কখনও শুনি নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া করজোড়ে বলিলেন,—আশীর্ব্বাদ করুন, শেষ রক্ষা যেন হয়। যেন নিষ্কাম চিত্তে কাজ করিতে করিতে তনুত্যাগ করিতে পারি।

অদ্ভুত ব্যাপার

শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতান্তে বিশ্রামস্থানে আসিলে রহিমপুরের একজন যুবক শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র পোদ্দার আসিয়া বলিলেন,—

একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি হঠাৎ ছুটে এলাম। সত্যই কি আপনি একই সময়ে দুই জায়গায় থাক্‌তে পারেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যাপারটা ঠিক্ বুঝলাম না।

দেবেন্দ্র বলিলেন,—রামচন্দ্রপুরের নগরবাসী সাহা বৃদ্ধ লোক। তিনি একদিন বেলা আট নটায় রামচন্দ্রপুর বাজারে আপনাকে দেখ্‌তে পেয়ে পিছনে ছুটতে ছুটতে বাঙ্গরা গ্রামে গিয়ে দেখেন যে, আপনি রায় বাহাদুর রূপেন্দ্র লোচন মজুমদারের বাড়ীতে ব'সে কথাবার্ত্তা বল্‌ছেন এবং অনুসন্ধানে জানেন যে, আপনি দুদিন ধ'রে ওখানেই আছেন, অন্য গ্রামে যান নি। কথাটা কি সত্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমি রামচন্দ্রপুর বাজারে যাইনি, এটাও সত্য। দুদিন ধ'রে বাঙ্গরা ছিলাম, এটাও সত্য।

দেবেন্দ্র বলিলেন,—নগরবাসী সাহা মশায় আপনাকে রামচন্দ্রপুরে দেখেছেন, এটা সত্য কি? তিনি আপনারই পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে বাঙ্গরা পর্য্যন্ত পৌঁছেছেন, এটা কি সত্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সে পৌঁছেছে, এটা সত্য। সে সত্যই আমাকে দেখেছে কিনা, তা সত্য না মিথ্যা, আমি বল্‌ব কি ক'রে? জানবই বা কি ক'রে? তবে নগরবাসীকে সবাই সৎলোক ও সত্যবাদী পুরুষ ব'লে জানে। তাই তার

কথা বিশ্বাস কত্তে হয়। আমি কিন্তু ব্যাপারটার কিছুই জানি না। আমার ভিতরে কোনও অলৌকিক শক্তি নেই। আমি তোমাদের মতই একটা সাধারণ মানুষ, যার কিছু দোষ আছে, গুণও আছে, যে নিয়ত নিজের অপূর্ণতা দূর করার জন্য তোমাদেরই মত শ্রম কত্তে বাধ্য।

দেবেন্দ্র বলিলেন,—কিন্তু আশ্চর্য্য খবর আছে। কাল রাত্রি দুটার সময়ে আপনি রহিমপুরে গিরিশ চক্রবর্ত্তীর দুয়ারে আঘাত করেছিলেন, বলেছিলেন,—দরজা খোল্, কথা আছে। কাল ঐ একই সময়ে আপনি শশাঙ্ক রায়কে বলেছিলেন,—দরজা খোল্, কথা আছে। কাল রাত্রে ঐ একই সময়ে নবীপুরের হরিমোহন পোদ্দার আর গুরুচরণ পণ্ডিত এই দুই জনের আলাদা আলাদা বাড়ীতে দুয়ারে করাঘাত ক'রে বলেছিলেন,—দরজা খোল্, কথা আছে। ত্রিশের সুরেন্দ্র দে, আকুবপুরের কৃপাদাস (ধীরেন্দ্র) চক্রবর্ত্তী, নবীনগরের সদয় সাহা প্রভৃতি অনেকের ঘরেই ঐ একই সময়ে একই ঘটনা ঘটেছে। আপনি বলেছিলেন,—সময় থাক্‌তে পূবের পাহাড়ে চ'লে যা। এদেশে আর থাকা কেন? সবাই এই ব্যাপারে শঙ্কিত।

পূবের পাহাড়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শঙ্কার কোনো কারণ নেই।

যত জনে পার পূবের পাহাড়ে অর্থাৎ আগরতলা রাজ্যে যাও এবং জঙ্গল কিনে আবাদ ক'রে নিজেদের জীবিকার স্বচ্ছল ব্যবস্থা কর এবং পাহাড়ী অশিক্ষিত দরিদ্র নরনারীদের শিক্ষাগত, চরিত্রগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি-বিধানের চেষ্টা কর। অনুন্নত পাহাড়ী জাতির লোকগুলিকে বৈবাহিক আদান-প্রদানের দ্বারা আপন কর, তাদের ভালবেসে ভগবানকে ভালবাসা শিক্ষা কর। একথা আমি ত' তোমাদের গোড়া থেকেই ব'লে আস্‌ছি। আমার হাতে তরবারি থাক্‌লে আমি জোর ক'রে তোমাদের সকলকে ঘরছাড়া ক'রে পূবের পাহাড়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য যেতে বাধ্য কত্তাম। কথাটা আমি কত কত বার কত কত জনসভাতে বলেছি, তোমরা কেউ শোনো নাই। তাই আমার বাণীগুলি মূর্ত্তি ধ'রে তোমাদের কারো কারো ঘরে গিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে এসেছে। আমাকে এখন যেমন জীবন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছ, বিশ্বাস করো, আমার বাণীগুলিও তেমন জীবন্ত। এরা সুদীর্ঘ কাল ধ'রে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে বল্‌বে,— দুয়ার খোল, কথা আছে। আজ তোমরা আমার কথায় কাণ দিচ্ছ না, কিন্তু একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলতে হ'তে পারে যে, বাবামণির বাক্য-লঙ্ঘন ক'রে ভাল করিনি। আগামী ৬ই বৈশাখ শ্রীশ্রীবাবামণি রহিমপুরে থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কুমিল্লা
১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩
(১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৬)

সমাজসেবার সদুপায়

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সুনামগঞ্জ-নিবাসী শ্রীবিজয় মাধব গোস্বামী নামক একটী যুবক কিছু উপদেশের জন্য আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্তরের সহজ, সরল, স্বচ্ছ ও সুন্দর ভাবগুলিকে সহস্র সহস্র নরনারীর ভিতরে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়ার যে স্বাভাবিক চেষ্টা, সেইটাই হচ্ছে সমাজসেবার সব চেয়ে কার্য্যকর সদুপায়। অপরের ভিতরে ভাব-সঞ্চার কত্তে হ'লে নিজের কিছু সাধন-বলও প্রয়োজন। কেবল ভাষার চাতুরীতে আর কথার বাঁধুনিতে কাব্য বা কবিতা চল্‌তে পারে, মানবাত্মার ত্রাণ বা উদ্ধার সম্ভব হয় না। কথার বাহারে দুনিয়া উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা যৎসামান্য সাহিত্যিক প্রয়াসের দ্বারাই আয়ত্ত করা যায় কিন্তু মানুষের প্রাণমনকে বিনা চেষ্টায় এবং স্বভাবত আকর্ষণ করার বিদ্যা আয়ত্ত কত্তে হ'লে সাধন-নিমগ্ন হ'তে হয়। সমাজের কাজ যে-ই যতটুকু কর, নিজের আধ্যাত্মিক সাধনের দ্বারা লব্ধ বলের উপরেই সেই বিষয়ে বেশী নির্ভর ক'রো। ভালবাসার ভাণ ক'রে কাউকে জয় করা যায় না। সত্যিকারের ভালবাসা লালসাহীন নিষ্কাম অন্তরেই জাগে। সেই নির্ম্মলতা ও নিষ্কামতা

সাধনবৃক্ষেরই দুইটী অমৃতময় ফল, জানবে। প্রকৃত সাধক ব্যক্তিকে অন্তরের অন্তরে সম্মান করবে কিন্তু কাউকে সম্মান দেখাতে গিয়ে একেবারে ভেড়া ব'নে যেও না। সাধক নামে সুপরিচিত অনেক ব্যক্তি লোকপ্রতিষ্ঠা লাভের পরে জনসাধারণের অনেককে কল্যাণঘাতী কুকর্ম্মে প্ররোচিত করেছেন ব'লে জানা যায়। সে সব কথা মিথ্যাও হ'তে পারে, গুজবও হ'তে পারে কিন্তু তেমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের সাবধান থাকা প্রয়োজন। কারণ, পাপ ও ব্যাভিচার যখন ধর্ম্মের নামে প্রচারিত হয়, তখন সাধারণ বুদ্ধির মানুষেরা ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পারে না যে, তারা ঠিকই চল্‌ছে না ভুলই কচ্ছে। সাধন-পথে চলতে গেলে নানা মতের নানা পথিক বা নানা পথ-প্রদর্শকের দেখা হবেই হবে। তাঁদের প্রতিজনকে সসম্মান ব্যবহার দেবে, কারো অসম্মান বা অনাদর কর্ব্বে না কিন্তু নিজের পথের প্রকৃত সিদ্ধান্তের বাইরের ব্যাপারে সায় দিও না। ধর্ম্মকে নিয়ে চিরকালই অধর্ম্মের এই ছল ও ছায়ার খেলা কিছু না কিছু চলেছে, অদূর ভবিষ্যৎ কালেও তা অবশ্যই চলবে বা চলতে পারে। আত্মগঠনেচ্ছু মানুষের কর্ত্তব্য হচ্ছে, পথ চল্‌তে গিয়ে অত্যুৎসাহের ফলে খানা-খন্দে প'ড়ে হাত-পা যাতে না ভাঙ্গে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা। নিজেকে এই ভাবে অনিন্দনীয় পদ্ধতিতে চালিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ও সমাজে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে সচ্চিন্তা ও সদবুদ্ধি বিতরণ ক'রে

বেড়াবে। তোমার মনে যদি স্বার্থবুদ্ধি না থাকে, তাহ'লে তোমার কথা লোকে আগ্রহ ক'রে শুনবে এবং আদর ক'রে পালন কর্ব্বে। সে কথাই সার্থক, যে কথা বক্তা ও শ্রোতার উভয়েরই কল্যাণ করে। সে কথাই সার্থক, যে কথা কেউ না কেউ শ্রদ্ধা সহকারে পালন করে।

একটী সমাজ-সেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একাকী সমাজ-সেবা কঠিন ব্যাপার। কারণ, সমাজটা একটা বড় জিনিষ। ব্যক্তিগত ভাবে একাকী মানুষটা তুমি অতি ক্ষুদ্র। তাই বহু মানুষের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যদি সেবা কত্তে পার, তবে সমাজের কতকাংশে তোমাদের শ্রমের প্রভাবকে উপলব্ধ করাতে সমর্থ হবার আশা কত্তে পার। একাকী আমি বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি। হয়ত বক্তৃতা আমি ভালই দিচ্ছি, হয়ত ভাষণ শুনে হাজার হাজার লোক মুগ্ধও হচ্ছে, কিন্তু একটা লোক একা কথা ব'লে কোটি কোটি লোকের এই দেশটার কতটুকু অংশে কাজ কত্তে পারে? আমি যে কাজটা কচ্ছি, সে কাজটা একেবারেই নিঃস্বার্থ ভাবে করছি ব'লে সঙ্গী সাথী পাওয়া ভার হয়েছে। কিছু প্রাপ্তির ব্যবস্থা কত্তে পারলে আরো দু দশজন বক্তাকে মঞ্চে দাঁড় করান যেত। কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য থাক্‌লেও লোক আকৃষ্ট হবে না। যেখানে সুপ্ত বা গুপ্ত এককণাও স্বার্থ লুকিয়ে আছে, সেখানে মানুষ কারো

ভাল কথাতেও সহজ কর্ণপাত করে না। যে কাজ আমি বিনা বেতনে অল্প অল্প ক'রে ক'রে যাচ্ছি, একাজ আরো হাজার হাজার লোকের করা দরকার। তুমিও যদি সমাজ-সেবা কত্তে যাও, একাকী কাজ কত্তে গিয়ে ঠিক এই অসুবিধাটায়ই প'ড়ে যাবে। গ্রাহকরা আসবার আগেই যদি হাট ভেঙ্গে যায়, তবে আর কি লাভ হ'ল? সুতরাং গ্রামে গিয়ে সমভাবের ভাবুক তরুণ কিশোরদের ডেকে এনে সঙ্ঘ গড় এবং সকলে মিলে একত্র হ'য়ে কাজ করার চেষ্টা কর। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা রেখো। পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা ক'রো। একে অপরের সম্মান রেখে চ'লো। সকলে এই বিষয়ে ক্ষমাহীন হবে যে, নিজের আচরণে যেন কদাচ দোষ ত্রুটি, অপরাধ ব অপবাদযোগ্য কিছু যাতে প্রবেশ না কত্তে পারে। ফুলের মত সুন্দর হও আর মালার মত এক সূত্রে গ্রথিত হও। আর্থিক সহযোগ কয় জনে পারে কয় জনকে দিতে? কিন্তু আত্মিক সহযোগ প্রত্যেকেই প্রত্যেককে দিতে পারে।

আত্মিক সহযোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একে অন্যকে আত্মিক সহযোগ দিতে চাইলে, তাদের উভয়কে সমভাবে অনিন্দক, অদোষদর্শী এবং প্রকৃত হিতকামী হ'তে হবে। একের লোক-সম্মানে অপরের মনে ঈর্ষ্যা বা তাচ্ছিল্য-বোধ এলে জান্‌বে যে,

তোমাদের সহযোগের সম্ভাবনা কর্পূরের মতই বাতাসে উড়ে গেল। সৎকর্ম্মে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগ কত্তে কত্তে প্রত্যেকে সৎ হও, সাধু হও, সত্যবাদী হও, জিতেন্দ্রিয় হও।

সকলের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন

একটী কৈবর্ত্তের ছেলে খুব কুণ্ঠিত ভাবে আসিয়া ঘরের এক কোণে মাটির উপরে বসিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজের লোক তোমাকে মৎস্যজীবীর সন্তান ব'লে অবজ্ঞা কত্তে পারে। কিন্তু আমি কাউকে তার জন্ম বা জীবিকার জন্য ঘৃণা করি না। এই কাছেই ছেলেটী ব'সে আছে, সে এক খ্যাতনামা গোস্বামী প্রভুর পুত্র। আমি তার পাশে এনে তোমাকে বসাব। সবাই ঈশ্বরানুগত হও। তাহ'লেই সব জাতি মিলে এক জাতি হ'য়ে যাবে। তোমাদের প্রতিজনের ভিতরে ব্রহ্ম বিরাজমান। তোমরা প্রত্যেকেই এক একটী ব্রহ্ম-প্রতীক। হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগদি, মালি, ঢুলি প্রভৃতি ব'লে নানা জনকে আমরা নানা নামে অভিহিত করলেও তাদের প্রত্যেকের প্রকৃত নাম ব্রহ্ম, প্রকৃত পরিচয় ব্রহ্ম, প্রকৃত জন্ম ব্রহ্ম থেকে, প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মত্ব। আমি সবাইকে এক ব'লে দেখ্‌তে পাচ্ছি, বুঝতে পাচ্ছি। যতক্ষণ তুমি পরানিষ্টে প্রবৃত্ত না হও, ততক্ষণ তুমি আমার পূজ্য। যতক্ষণ তুমি পরনিন্দায় না প্রবৃত্ত হও, ততক্ষণ তুমি আদরণীয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তুমি মিথ্যা, অনাচার, ব্যভিচার ও পাপাচারে

আসক্ত হচ্ছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি আমার মাথার মণি। কিন্তু তুমি যদি কুরুচি বশতঃ অধঃপাতে যাও, তবু আমি তোমাকে ঘৃণা কর্ব্ব না, আমি তোমাকে কোল দিয়ে আপন কত্তে চেষ্টা কর্ব্ব, আমি তোমাকে নরককুণ্ড থেকে টেনে তুলতে আপ্রাণ প্রয়াসী হব। তুমি আমার দৃষ্টিতে সর্ব্বাবস্থায়ই ব্রহ্ম, সুতরাং সর্ব্বাবস্থাতেই আমি তোমার একান্ত হিতৈষী দীন-সেবক। ভয় কি? কুণ্ঠা কেন? এগিয়ে এসে উচ্চাসনে ব'স। কাছে এস।

কাজের ফাঁকে নাম

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু অবসর কত্তে পার, সেই সময়েই নাম করো। যাদের চাকরী-বাক্‌রির ঝামেলায় নাম করার সুযোগ কম, তাদের পক্ষে এইরূপ অভ্যাস খুবই হিতকর। নামের জন্য সংসারকে যেমন অবহেলা কত্তে পার না, সংসারের জন্যও তেমন নামকে অবহেলা করা চল্‌বে না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নাম করার অভ্যাস থাক্‌লে আস্তে আস্তে মনের এমন একটা স্বভাব হ'য়ে যায় যে, অন্যান্য কর্ত্তব্য কাজ কর্ব্বার সময়েও মনের ভিতরে নামের একটা স্নিগ্ধ রাগিণী যেন ধীরগতিতে একটা মধুর সুরের রেশের মত বাজতে থাকে। সেই সুর চলে অবিরাম ও অবিশ্রাম, সেই রাগিণী চলে নিরন্তর এবং অন্য কোনও কর্ত্তব্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি না ক'রে একেবারে সাবলীল ভাবে। ভগবানের নাম-

সেবা এবং ভগবানের দেওয়া সংসার এই দুইটিকেই এভাবে মিলিয়ে নিয়ে সমতালে চলার কৌশল আস্তে আস্তে আপনা আপনি আয়ত্তে এসে যাবে। নামটী যাঁর, তিনি যে তোমার পরমপ্রিয় পরমাত্মীয়, এই কথাটিতে খেয়াল রাখতে হবে। তাঁকে কখনো দেখ নি, তবু তিনি তোমার পরম আত্মীয়। তাঁর বিষয়ে জ্ঞান বা অনুমানও তোমার অতি অল্প, তবু তিনি তোমার আপনার আপন। এই কথাটি মনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিতে হবে।

নাস্তিকের নামজপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— যে প্রিয় নয়, তার নাম দিবানিশি জপ কত্তে রুচি বা আগ্রহ আস্‌বে কেন? যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তারাও অনেক সময়ে তাঁর নাম কত্তে কত্তে অনির্ব্বচনীয় সুধারসের আস্বাদন পায়। এটা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই জন্যই আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক লোকদিগকে ঘৃণা করি না বা বিদ্বেষের চোখে দেখি না। ঈশ্বর তার পক্ষে বরং নাই থাকুন, কিন্তু ঈশ্বরের নামে তারও অধিকার আছে। সে যদি অবিশ্বাস ক'রেও ঈশ্বরের নাম করে, তবে নাম করার ফল একদিন না একদিন সে পাবেই পাবে। নাস্তিকরা ঈশ্বর মানে না ত' ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পায় নি ব'লে! এটা কোনো দোষের কথা নয়। প্রমাণ একদিন পেয়ে গেলেই সে চুপ মেরে যাবে।

ততদিন আমাদের প্রতীক্ষা ক'রে বসে থাক্‌তে হবে। সে সত্যকে জানতে চায়, এটা নাস্তিকের অপরাধ নয়। তুমি ভগবানকে না জেনেও তাঁতে বিশ্বাস কর, এটাও তোমার অপরাধ নয়। বিশ্বাস করার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনে শান্তি আসে। শান্তিটা তোমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শান্তিই যদি পেলে, তবে ভগবান্ দুদিন দেরী ক'রে এসে তোমাকে দেখা দিলে তাতে তোমার ক্ষতিটা কি?

ভগবানে অবিশ্বাসের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে ভগবানকে নস্যাৎ ক'রে দেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। ভগবান যদি থাকবেনই, তবে জগজ্জোড়া এত দুঃখ কেন? তিনি ত' এক তুড়িতে সকলের সকল দুঃখ একটী নিমেষে দূর ক'রে দিতে পারেন! কিন্তু তা করেন না কেন? এই প্রশ্নের সোজা উত্তর হচ্ছে এই যে, তিনি নেই। যিনি নেই, তিনি আবার কার কি দুঃখ দূর কর্ব্বেন? ভগবান্ যদি থাকবেন, তবে দুনিয়া ভ'রে এত অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, হিংসা এবং কলহ কেন? তিনি কেন এসব দূর করে দেন না? এই প্রশ্নের সহজ ও সরল উত্তর এই যে, তিনি ত' নেই। যিনি সত্য সত্য থাক্‌বেন, তিনিই প্রতীকার কর্ব্বেন। যিনি নেই, তাঁর কাছে আবার প্রতীকারের আশা ত' অসঙ্গত। এই জবাবের পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। এই

জগতের বিপুল-বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টি কি উদ্দেশ্যবিহীন? উদ্দেশ্যবিহীন যদি হবে, তবে নিকৃষ্ট জীব থেকে উৎকৃষ্ট জীবে উত্তরণ, বন্য মানুষ থেকে সভ্য মানবে উদ্বর্ত্তন এবং অনাগত ভবিষ্যতে কল্পনাতীত উন্নতির সম্ভাবনার আলোক-সম্পাত কেন, কি জন্য, কি ক'রে? এত বড় সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই থাক্‌বে। কি সেই উদ্দেশ্য?

প্রণব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কার সেই উদ্দেশ্য? কে সেই মহতী প্রজ্ঞার অধীশ্বর, যাঁর কল্পনা আস্তে আস্তে রূপ থেকে রূপান্তর, রূপান্তর থেকে নবরূপায়ণে এসে পৌঁছুচ্ছে এবং সত্য সত্য সেই রূপকারের প্রকৃত তত্ত্ব কি? এই প্রশ্নের হাত থেকে কোনো ধীমান্ পুরুষের নিস্তার নেই। এত বড় বিশাল ও জটিল অঙ্কের ফল বের কর্ত্তে হ'লে অজানা একটা এক্‌স (X) চাই। সেই X টাকে নিয়েই সাধকদের গণিত শুরু। ওরা বলেন X এক্‌স্, আমি বলি, ওম্, অনাহত নাদ। ওম্ এই ধ্বনিটির এখন কোনো মানে নেই, কিন্তু অবিরাম ওমের সঙ্গে ওম্, তার সঙ্গে ওম্ যোগ কর্ত্তে কর্ত্তে, অর্থাৎ অবিরাম প্রণব জপ কর্ত্তে কর্ত্তে আস্তে আস্তে তার মানে বা প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'তে থাকে এবং জ্ঞাত আর অজ্ঞাত সব তত্ত্বকে, সব ধ্বনিকে, সব সত্যকে, সব নিয়মকে এরই মধ্যে আস্বাদন কর্ত্তে কর্ত্তে উপলব্ধির বৈচিত্র্যময় অনন্ত পথ-পরিক্রমা চল্‌তে থাকে।

অখণ্ড-মন্ত্র প্রণবে ও খণ্ডমন্ত্রে পার্থক্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—খণ্ড মন্ত্র হ্রীং, ক্লীং, শ্রীং, ঐং, হুং, রাং ইত্যাদি প্রত্যেকটার এক একটা সুনির্দ্দিষ্ট জ্ঞাপন বা indication থাকে। হ্রীং বল্লে যার ধ্যান আসবে বা আসা উচিত, ক্লীং বল্লে তা আসবে না, আসার কথা নয়। ক্রীং বল্লেও তা আসবে না বা আসবার কথা নয়। কারণ, এই সকল পরম শ্রদ্ধেয় মন্ত্রের অভিলষিত ইঙ্গিত বা indication টা যার যার পক্ষে সুনির্দ্দিষ্ট। অখণ্ডমন্ত্র প্রণবে তা নয়। তার অভিলষিত ইঙ্গিত বা indication হচ্ছে "হ্যাঁ", "Yes", "মঞ্জুর"। মানে,—"আছে।" প্রণব জপতে জপতে বিভিন্ন অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি মন্ত্রের indication বা ইঙ্গিত বা সাক্ষাৎকার তাতে হ'তে পারে এবং হবে, কিন্তু তারপরেও এর অনুভূতির নূতন নূতন বিচিত্রতা আস্বাদনে আসবে। এই কারণেই একে বলি অখণ্ড-মন্ত্র। নির্দ্দিষ্ট একটা গণ্ডীবদ্ধ ধারণার সীমারেখা এতে নেই, কারণ, এর ভিতরে সবকিছুর উপস্থিতি একদা উপলব্ধিতে আস্‌বেই আস্‌বে। পরম সত্যকে প্রকৃষ্ট রূপে এবং প্রকৃত রূপে জান্‌বার জন্য এই যে সাঙ্কেতিক X (এক্‌স্) রূপী প্রণব, তাতে আমাদের মনকে মজিয়ে রাখবার চেষ্টার মধ্যে উদ্দীপক হেতুটুকু এই। ঈশ্বর মানো আর না মানো, আজীবন ধৈর্য্য-সহকারে প্রণবকে তোমার স্মৃতিতে

জাগরূক রাখার চেষ্টা ক'রে যাও,— পরম সত্য একদিন তোমার কাছে করামলকবৎ আয়ত্ত ও বোধগম্য হবে। তুমি ঈশ্বর না মান্‌লে আমার কোনো ক্ষতি নেই।

নাস্তিক্য ও অপরাধ-প্রবণতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আর এক দল লোক আছে, যারা ঈশ্বর মানে না নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে। ব্যভিচার কর্ল্লে, নরহত্যা কর্ল্লে, পরুষ কর্ম্ম দ্বারা মানুষ বা অন্য প্রাণীকে ক্লেশ দিলে, হিংস্র, নিষ্ঠুর ও নির্ম্মম জীবন-যাপন কর্ল্লে প্রায় প্রতিজনেরই মনে বিবেক এসে দংশন করে। এই বিবেক বলে, কাজ ত' কচ্ছ অন্যায়। এর প্রতিফল তোমাকে পেতে হবে। কারণ, একজন দণ্ডদাতা বা কর্ম্মফলবিধাতা ঈশ্বর আছেন, যিনি আজ না হোক্ কাল তোমার প্রাপ্য তোমাকে দেবেনই দেবেন। সামান্য পাপের ক্ষেত্রে এসব লোকেরা একটু আধটু অনুতাপ ক'রে মনকে হাল্‌কা করে বা নিজেদের কুকার্য্যের সমর্থনে নানা যুক্তি দাঁড় করিয়ে সান্ত্বনা নেবার চেষ্টা করে। ব্যভিচার কর্ল্লে দোষ কি? পশু-পক্ষীরা যে সম্বন্ধের বিচার রাখে না, তাতে তাদের কোন্ অন্যায়টা হচ্ছে? চুরি বা ডাকাতি কর্ল্লে দোষ কি? দুষ্ট লোকেরা মানুষ ঠকিয়ে যে পয়সা সঞ্চয় করেছে, তা চুরি ক'রে হ'ক্, ডাকাতি ক'রে হ'ক্, নিয়ে যাবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে, যার অর্থ দিয়ে একান্তই প্রয়োজন। একজন

সোণার মোহরের স্তূপের উপরে ব'সে দিবানিদ্রা দেবে আর অন্যেরা না খেতে পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় অলিগলিতে ম'রে প'ড়ে থাক্‌বে, এটা কোন্ দেশী বিচার? কিন্তু বড় বড় পাপ কত্তে হ'লে বা ব্যাপক ভাবে হত্যালীলা চালাতে হ'লে কিম্বা পাইকারী হারে নারীধর্ষণ কত্তে হ'লে এসব ওজুহাতে মনকে শান্ত করা যায় না। তখন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা ছাড়া বিবেক-দংশন থেকে বাঁচবার আর কোনো পথ থাকে না। সুতরাং তখন মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় নাস্তিক হবার অভিনয় করে। অবশ্য, আত্মগ্লানি এদের রেহাই দেয় না, তবে সেটা হয় অনেক দেরীতে। যারা দলবদ্ধ হ'য়ে মানুষের গৃহদাহ করে, দলবদ্ধ হ'য়ে নারীর সতীত্ব নাশ করে, দলবদ্ধ হ'য়ে স্ত্রীপুরুষ ও শিশু-নির্ব্বিশেষে নরহত্যা করে, "ঈশ্বর আছেন" একথা ভাবতে তাদের হৃৎকম্প হয়। এই হৃৎকম্প থেকে বাঁচবার জন্য অনেককে অনেকবার ঈশ্বরের নামের দোহাই দিয়ে এই পাপ কার্য্যগুলি কত্তে হয়েছে। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার তথা সমবায়-সমিতি

একজন আসিয়া সমবায়-সমিতির আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা নয়টী

ভাই একত্র একই সংসারে বাস কচ্ছ, এক হাঁড়ির রান্না খাচ্ছ, এই দৃষ্টান্ত এই যুগে বিস্ময়কর। দেশের অর্থনৈতিক অবনতি বর্ত্তমানে যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত দেখতে হবে যে, বাপ আর ছেলে একসঙ্গে থাক্‌তে পাচ্ছে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এতই বেড়ে যাচ্ছে যে, দুই ভাই এক পরিবারে বাস কত্তে পাচ্ছে না। দুই বধূ দুই দেশ থেকে দুই বংশ থেকে এসেছে, পরস্পর মিলতে পাচ্ছে না এবং নিজ নিজ স্বামীদিগকে ভাইদের কাছ থেকে আলাদা থাকার প্ররোচনা যোগাচ্ছে। সেই অবস্থাতেও তোমাদের এত বড় পরিবার এখনো একান্নবর্ত্তী, এটা খুবই শ্লাঘা ও আনন্দের কথা। পরস্পরে প্রীতি নিয়ে চল। পণ কর যে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য কদাচ একান্নবর্ত্তিতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটীকে লুপ্ত হ'তে দেবে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার আমাদের প্রাচীন যুগের গৌরব। আর্থিক কারণে আর ব্যক্তিগত ভোগস্পৃহার বৃদ্ধি ঘটাতে এই সুন্দর জিনিষটী আজ ধ্বংসোন্মুখ। কত দিন একে বাঁচিয়ে রাখা যাবে, বলা কঠিন কিন্তু যেখানে যেখানে সম্ভব, সেখানে চেষ্টা করা খুবই প্রয়োজন। আজকাল নানা স্থানে সমবায়-সমিতির কথা হচ্ছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার হচ্ছে এই সমবায়ের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ভাইয়ে ভাইয়ে প্রীতি রাখ, বধূতে বধূতে আন্তরিক প্রেম-সঞ্জননে যত্নবান্ হও। সকলের শিশুগুলিকে সমযত্নে মানুষ কর, সমভাবে দেখ এবং ভিন্ন

পরিবারের দুই একটী নিরাশ্রয় শিশুকে নিজেদের শিশুদের সমান জ্ঞান ক'রে পালন কর, শিক্ষা দাও। এভাবে কাজ চল্‌লে প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞার সঙ্গের আধুনিক জগতের ঋদ্ধির প্রকৃত সমন্বয় হবে।

বংশ ও সংসর্গ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি বড় বংশে জন্মেছ ব'লে তোমাকে নিশ্চয়ই তোমার সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দিত কর্ব্ব। কারণ, বড় বংশে কতকগুলি মহৎ গুণের অনুশীলন হয়েছে ব'লেই বংশটার এত সম্মান। সেই সকল গুণ যাতে তোমাতে ষোলকলায় বিকশিত হ'তে পারে, তার দিকে তাকিয়ে তোমাকে চলতে হবে। বড় বংশে জন্মালেই হ'ল না, বংশের মর্য্যাদা অনুযায়ী সৎকর্ম্মও তোমাকে কত্তে হবে। পূর্ব্বপুরুষেরা সৎকর্ম্ম ক'রে ত্রিলোক-পূজিত হয়েছেন, তুমি ত' এখনো সৎকর্ম্মে হস্তক্ষেপ কর নি। তোমাকে সে কাজটী কত্তে হবে। আর একটী অতি বড় কাজ তোমার জন্য এই যে, অসৎ-সংসর্গ তোমাকে বর্জ্জন কত্তে হবে।

মানুষের খোঁজ কর

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের ঐ অঞ্চলে তোমার গুরুভাইবোন্ কেউ না থাক্‌লেই

বা ক্ষতি কি? ওখানে মানুষ ত' নিশ্চয়ই আছে। তাদের মধ্যে সৎলোক বা সাধু স্বভাবের মানুষ কিছু না কিছু থাকবেনই। তুমি আস্তে আস্তে খোঁজ ক'রে তাঁদের বের ক'রে নাও। যাঁরা পরস্বাপহরণ করেন না, যাঁরা সত্যশীল থাকবার চেষ্টা করেন, যাঁরা নিজেদের স্বার্থকে কতকটা ক্ষুণ্ণ ক'রেও দশজনের স্বার্থকে সেবা দেবার চেষ্টা করেন, যাঁরা পরোপকারী, যাঁরা ইন্দ্রিয়-সংযমে চেষ্টিত, এমন মানুষদের সঙ্গে যদি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে নাও পার, তবু তাঁদের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনেই তোমার অনেক উপকার হবে। কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ সাধু আসেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জনসমাজের শ্রেষ্ঠ উপকারটী করেন শুধু দর্শন দানের দ্বারা। তাঁরা উপদেশ-দান বা দীক্ষা-প্রদানের জন্যও হয়ত চেষ্টা করেন না। সৎ মানুষকে খোঁজ এবং তাঁকে দর্শন কর। এতেই অনেক লাভ।

কুমিল্লার দ্বিতীয় বক্তৃতা

অদ্য সভাস্থলে জনতার এত ভীড় হইল যে, সভার স্থান বদল করিতে হইল। মহেশ-প্রাঙ্গণের বিরাট অঙ্গন হইতে সরিয়া দক্ষিণ দিকের সংলগ্ন ময়দানে আসিতে হইল। এই ব্যাপার সম্পর্কে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"হিতোপদেশমূলক নৈতিক বক্তৃতা শুনিবার জন্য জনতার এত ভীড় ও আগ্রহ

সত্যই অভাবনীয়। শহরের লোক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে বিরাট বিরাট জনসভা হইত, তাহার তুলনায় এই সভায় জনসমাগম অল্প বলিতে পারি না। মানুষ এত মন দিয়া কথা শোনে আর এমন নিঃশব্দ সভাস্থলে বক্তা পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল বিনা বাধায় ভাষণ দিয়া যান, তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আমার জানা নাই।"

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রথম সার কথা হচ্ছে, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি। পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব,—এই বনিয়াদের উপরে দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মচর্য্যের মহীরুহ। সেই ব্রহ্মচর্য্য বুকের উপর ধারণ ক'রে রাখবে গার্হস্থ্যকে আর গার্হস্থ্য দুইটি বাহু বিস্তার ক'রে ছড়িয়ে দেবে আত্মানুশীলনের বানপ্রস্থকে এবং সর্ব্বজনহিতদায়ী সন্ন্যাসকে। একটা আর একটাকে রক্ষা করছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য জগদ্ধিত। জগৎ-কল্যাণের জন্যই মানবতনু ধারণ, জগন্মঙ্গলসাধনে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। এই তত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধিতে ও আচরণে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষের ব্রহ্মসাধনা।

পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব

বক্তৃতান্তে কিছু লোক দর্শনার্থী হইলে, শ্রীশ্রীবাবামণি তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—"কেবল পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত হ'লেই চলবে না। পিতৃমাতৃভক্ত মানুষকে শ্রদ্ধা দিতে হবে,

সম্মান দিতে হবে, পূজা দিতে হবে। অতীতকে সম্মান করার যে বহু-প্রশংসিত একটি সুপ্রথা কোনো কোনো দেশে ও কোনো কোনো সমাজে প্রচলিত আছে, সেটা অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে অনন্ত ভবিষ্যতের প্রতি অন্তরের অমিশ্রিত আস্থা স্থাপন। আজ যা বর্ত্তমান, কাল তা অতীতে পরিণত হবে। এখন যেটা ভবিষ্যৎ, কাল সেটাই ত' হবে বর্ত্তমান। অতীতকে শ্রদ্ধা করলে তার ফলটা ভবিষ্যতেও নির্দিষ্ট হ'য়ে থাকে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীনেরা যে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে, তা অনেক সময়ে উন্মার্গগামী হয়। একটা বিরাট ও গৌরবজনক ভবিষ্যৎ আমাদের আসছে ব'লেই ত' আমরা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবিহান্ হব। অতীতে কলঙ্ক থেকে থাকলে তার কর্ম্ম সংশোধন আমাদের বর্ত্তমান তপস্যা দিয়ে আর অতীতে গৌরব থেকে থাকলে তাকে ভবিষ্যতের মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান ও চিরস্থায়ী করার জন্য আমরা বর্ত্তমানে তপস্যা কর্ব্ব। গুরুকে মান আর না মান, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। গুরুর মত গুরু হ'লে তোমাকে একদিন না একদিন মানতেই হবে কিন্তু ভাল হোক্, মন্দ হোক্, পিতা ও মাতাকে তোমার মানতেই হবে। কারণ, অনুভূতিশীল মন, বিচার-পরায়ণ যুক্তিশক্তি, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান দর্শনের আগ্রহ-সম্পন্ন কৃষ্টি, নবসৃষ্টির সম্ভাবনাপূর্ণ সভ্যতা ত' ঐ দুটী মানুষের সাহায্যে জন্মগ্রহণ করেছ ব'লেই তোমার লভ্য হয়েছে। তাঁদের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকা পাপ।

কুমিল্লা
২রা বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৩
(১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৬)

আশ্রম গড়ার ঝামেলা

প্রাতে সাতটাতেই কাপড়িয়াপট্টির শ্রীযুক্ত শশিমোহন পাল আসিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার কিছু বক্তব্য শুনিতেই হইবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সারাদিন যদি কেবল আপনাদের কথাই শুনি আর তদুত্তরে কেবল কথাই বলি, তবে আমার অন্যান্য কাজগুলি হবে কি ক'রে? অনেক টানাটানি ক'রেও ত' চব্বিশ ঘন্টার দিনটাকে পঁচিশ ঘন্টা কত্তে পাচ্ছি না। আর, সারাদিন লোকের এই প্রশ্নের আর সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লে বিকেল বেলায় সভাস্থলে বক্তৃতা দেবার সময়ে আমি কথা যোগাব কোথা থেকে? আমি ত' আর বাগ্‌দেবীর সর্ব্ববিদ্যার ভাণ্ডার নই!

শশিবাবু বলিলেন,—সে কথা আমরা চিন্তা কত্তে রাজি নই। এসেছেন যখন, ছাড়ব না। আমার কিছু জঙ্গলাকীর্ণ জমি আছে পূবের পাহাড়ে, মানে, পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় সোনামুড়াতে কাঁঠালিয়া মৌজায়। সেখানে আপনাকে আশ্রম কত্তে হবে। ঐ জায়গাগুলি আপনাকে দান কত্তে চাই নতুবা বিক্রী ক'রে দিতে চাই। জায়গা দেখ্‌লে আপনি পছন্দ নিশ্চয়ই কর্ব্বেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্রম করা সহজ কথা নয়। শুধু জায়গা পেলেই আশ্রম হয় না। জায়গার সঙ্গে সঙ্গে অনেক আপদ আসে, যার সঙ্গে যুদ্ধ দিতে দিতে জান্ কাবার হবার জোগাড় হয়। তারপরের প্রশ্নটা হচ্ছে, যোগ্য কর্ম্মীর। কর্ম্মী কোথায় পাবেন? সমাজসেবার জন্য জীবন-সমর্পণে আগ্রহী যুবকদের দিনের পর দিন সংখ্যা-হ্রাস ঘট্‌ছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যতই অবনতি ঘট্‌বে তার সঙ্গে সঙ্গে এদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে আরও কমতেই থাক্‌বে। গত সাতটা বৎসরে পুপুন্‌কী আশ্রমকেই সামাল দিতে পারলাম না। জলেরই ব্যবস্থা কত্তে পারি নি। একটা মাত্র কূয়া সম্বল। চারিদিকের সব মাটির অরণ্যরাজি এখনও উচ্ছেদ কত্তে পারি নি। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য হচ্ছে একেবারে খাঁটি মরুভূমির। কর্ম্মী নাই, তাই কত কষ্ট ক'রে কম লোক দিয়ে বেশী কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। এতে আমাদের প্রতিজনের পরমায়ু অকারণে এবং অকালে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে। তারপরের সমস্যা হচ্ছে অর্থ। ভিক্ষা ত' কর্ব্ব না, চাঁদা ত' চাইব না, অর্থাগম হবে কোথা থেকে? সুতরাং আপনার পরিকল্পিত স্থানে আশ্রম করার বুদ্ধি ত্যাগ করুন বা আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে দিয়ে আশ্রম করাবার চেষ্টা দেখুন।

শশিবাবু বলিলেন,—পার্ব্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্ন টিলার মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলিতে জমির উর্ব্বরতা অসাধারণ এবং তিন চারি ফুট মৃত্তিকা খুঁড়িলেই জলের উৎস খুলিয়া যায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তা আমি জানি। পাহাড়-অঞ্চলে বেশ কয়েকবার আমি নানা কারণে ঘুরেছি। আমি এই লোভনীয় মৃত্তিকার সদ্‌গুণগুলির পরিচয় রাখি। কিন্তু নূতন একটী আশ্রম করার প্রস্তাবে আমি রাজি নই। আশ্রম গড়া আমার পক্ষে এক মস্ত ঝামেলা। সারা জীবন জুড়ে হয়ত আশ্রমই গড়ব, কিন্তু মৃত্যুকালে দেখে যাব যে, কিছুই করা হয় নি। এইটাই স্বাভাবিক ভবিতব্য। যে কাজের শেষ নেই, সে কাজে হাত দিতে দশবার বিশবার চিন্তা করা উচিত।

সারাটি দ্বিপ্রহর শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিলেন।

ত্যাগের কৌলীন্য কেন

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বরদিয়া-নিবাসিনী জনৈকা মহিলাকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার ইচ্ছা করে, সারাটা পৃথিবী আমার কর্ম্মীদের দ্বারা আকীর্ণ করিয়া রাখি। ইচ্ছা করে, তাহারা জনে জনে সে কথা বলুক, যাহা বলিতে আমি ভালবাসি, তাহারা জনে জনে সে কাজটী করুক, যাহা করিতে পারিলে আমি কৃতকৃতার্থ হই। মান, যশ, প্রতিপত্তি, কীর্ত্তি বা নেতৃত্ব আমার কামনীয় নহে। আমি চাহি সমগ্র মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ অভ্যুদয়, সর্ব্বাঙ্গীণ অগ্রগতি, সর্ব্বতোভদ্র আত্মবিকাশ। ত্যাগের ভিত্তি ছাড়া অন্য কোনও নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে এমন জিনিষ

গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাই আমি ত্যাগের পূজারী। জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, আয়ু অস্থির, অনিশ্চিত ও চিরচঞ্চল বলিয়াই আমি ত্যাগকে বরণীয় জ্ঞান করি নাই,—মনুষ্য-জীবনের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ক্রমাগত উৎকর্ষ-সাধনের মধ্য দিয়া এই সাধারণ মানব-জাতি যে দেবমানব হইতে পারে, তাহাতে আস্থা আছে বলিয়াই আমি ত্যাগকে প্রকৃত পন্থা বলিয়া চিনিয়াছি।"

একটী সুবিনীত প্রার্থনা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত মাণিকরাজ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"চাঁদপুরের একটী বিদ্যালয়ে তুমি আমার ভাষণ শুনিয়াছিলে। তাহাতে তোমার কি এই কথাই মনে হইয়াছে যে, আমি ভাষণ দিয়াই নিজেকে দায়মুক্ত জ্ঞান করিতেছি? তাহা কিন্তু নহে। আমার কণ্ঠস্বর যাহারই কর্ণে প্রবেশ করিল, সে আমৃত্যু আমার কাছে শোনা কথাগুলি বারংবার মনে মনে আবৃত্তি করুক এবং এই আবৃত্তির ফলে সকল কথার রহস্যঘন প্রকৃত অর্থ তাহার হৃদয়ঙ্গম হউক, ইহাই আমার কাম্য ছিল। কখনও কখনও আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, আমার প্রার্থনা ভগবান্ অপূর্ণ রাখেন নাই। কিন্তু ঐটুকুতেই ত' চলিবে না, আরও কিছু চাই। তাহা হইতেছে এই যে, তোমাদের কণ্ঠ আমার কণ্ঠ হইয়া নির্ভয়ে কথা বলুক,

তোমাদের বাহু আমার বাহু হইয়া বীরবিক্রমে কাজ করুক। ইহা কাহারও নিকটে আমার দাবী নহে, ইহা ভগবানের চরণে আমার সুবিনীত প্রার্থনা।"

কর্ম্মের কোলাহল চাই

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত চুন্টা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কল্পনা-বিলাসের আড্ডা নহে, গল্প-গুজবের আসর নহে, আমি চাহি কর্ম্মের কোলাহল আর কর্ম্মি-সমাবেশের সমারোহ। আমি চাহি শরতের মেঘমুক্ত আকাশের নীচে আত্মাহুতির শিউলিগুলির সার্থকতা। আমি চাহি প্রাবৃটের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বজ্রগর্জ্জন-তুচ্ছকারী আত্মবিশ্বাসের অনুপম অগ্রগতি। আমি চাহি, তোমরা কাজ করিবে এবং কাজ করাইবে। আমি চাহি, একটী প্রাণীকেও তোমরা অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। পরমায়ুর অধিকাংশ দিনগুলি সকলে মিলিয়া বৃথাই নষ্ট করিয়া দিতেছি। তাহাদিগকে প্রকৃত সার্থকতায় আসিতে দিতেছি না। আমি চাহি, ইহা বন্ধ হউক। পরমায়ুর অপব্যয় আর সহ্য করা উচিত নহে।"

ছড়াইয়া পড়

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত পাইকপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একাকী কাজ করা শক্ত বলিয়াই যে শত শত সহকর্ম্মীর

সহিত মিলিত হইতে বলিতেছি, তাহা নহে। বড় কাজ, কাজের মত কাজ নিমেষে সমাপ্ত হয় না, তাহার প্রারম্ভেও সময় লাগে, পরি-সমাপ্তি ঘটিতেও সময় লাগে। সময় লাগে বলিয়াই মনে মনে বুঝিয়া নিতে হয় যে, হয়ত এক দুই তিন শতাব্দী কালও কাজকে চালু রাখিতে হইতে পারে। তুমি যদি একাই সব কাজ করিয়া ফেলিতে চাহ, তবে তোমার পরমায়ুর সুনির্দ্দিষ্ট কালটুকুর অতিরিক্ত সময়ের জন্য কাজ চালু রাখিবার ব্যবস্থার কোনও প্রয়োজনই হইবে না। কিন্তু একটা লোকের পরিমিত পরমায়ুর মধ্যে কতটুকু কাজ করা যায়? একাকী বড় কাজ অতীতে অসাধ্য ছিল না, কিন্তু এখন অসাধ্য। সুতরাং কর্ম্মীরা আগে মিলিত হও এবং সম্মিলিত-ভাবে কিছুকাল কাজ করিয়া পরামর্শ অনুযায়ী সকলে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়। Radiate yourselves to the whole length of eternal distance. অনন্ত দূরত্বের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তোমাদের সংগঠন কর্ম্মের পরিধি-বিস্তার কর।"

খুঁজিয়া লইতে হয়

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত রূপসা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একটুখানি খুঁজিলেই দেখিয়া অবাক্ হইবে যে, চারিদিকে তোমাদের সমভাবের ভাবুক, সমসাধনার সাধকের অন্ত নাই।

কিন্তু তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। বহুলোক একই ভাবের ভাবুক হইলে একদা তাহাদিগকে এক পথের পথিক করিয়া নেওয়া সম্ভব হয়। বহুলোক একমন একপ্রাণ হইয়া এক পথের পথিক হইলেই জগতে নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি শুরু হয়। পৃথিবীতে নূতন ইতিহাস সৃষ্টির যোগ্যতা তোমাদের আছে বলিয়াই সেই দায়িত্ব তোমাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়িতেছে। জেলার প্রতিটি প্রান্তে কে কোথায় আছে তোমার সমভাবের ভাবুক, তোমার সহ-পথিক, তাহাদের খুঁজিয়া বাহির কর এবং মাঝে মাঝে একত্র হও। একত্র মিলিয়া তোমরা পরস্পর পরস্পরের উন্নতি-সাধনে কে কি করিতে পার, তাহার হিসাব বা এষ্টিমেট গ্রহণ কর। তারপরেই ধরিবে কাজ''।

কাজ কি ভাবে ধরিতে হয়

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ভেলানগর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অনেক কাজ এক সঙ্গে ধরিও না। একটা একটা করিয়াই কাজ ধরিতে হয়। একটা খুব বড় কাজের সঙ্গে ছোট ছোট আরও দু একটা কাজও ধরা চলে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন কাজ ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিতে না হয়। স্বল্প-মেয়াদী কাজগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ হইয়া

গেলে তবে তুমি আশা করিতে পার যে দীর্ঘমেয়াদী কাজগুলিও সময়মত নামিবে। তোমার কর্ম্মকাণ্ড যেন উদ্দেশ্যবর্জ্জিত না হয়। সে উদ্দেশ্য লোক-প্রবঞ্চনা নহে, লোকসেবা-সাধন। জনসাধারণকে নারায়ণের মূর্ত্তি ভাবিয়া ভক্তিভরে তাহার অভাব-মোচনের চেষ্টাই হইবে তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজ করিতে গেলে নিজেরও বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং সদুপায়ে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার অধিকারটুকু তোমার আছে। জীবনধারণই হইবে তোমার পরার্থ-সাধনের জন্য, এই একটী কথা প্রত্যেকে মনে রাখিবে। পরার্থসাধন একার চেষ্টায় সকল সময়ে সম্ভব নহে বলিয়াই সংঘবদ্ধ হইবার কৌশল মানুষের কাছে আসিয়াছে। প্রকৃত কৌশলী মানুষ অল্প শ্রমে বেশী কাজ আদায় করে, অল্প খরচে বেশী আয় করে, অল্প কথায় বেশী কাজ সমাপ্ত করে। এই জন্য তোমাদের মধ্যে কথা কমাইবার চেষ্টা থাকা যেমন উচিত তেমন আবার উচিত পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সহযোগ। নেতৃত্ব-কর্ত্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও বোধ সহযোগ-বুদ্ধিকে ম্লান করে বলিয়াই ইহা বর্জ্জনীয়। নেতা ছাড়া দলবদ্ধ কাজ হয় না। সুতরাং কেহ না কেহ কখনও না কখনও নেতা হইবেই হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কেহই নেতার দাস নহে। নেতাও কাহারও প্রভু নহে। পরস্পর পরস্পরের সহোদর ভাই বা সহোদরা ভগিনী, এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে।"

গোপন পদ-সঞ্চারে

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত তরপুরচণ্ডী-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের সকলের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আমি গোপন পদসঞ্চারে তোমাদের অনেকের গ্রাম, অনেকের পাড়া, অনেকের গৃহ ঘুরিয়া আসিয়াছি। আমি জানিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, অরুণোদয়ের প্রাক্কালে সূর্য্যদেব কি অবস্থায় আছেন। তোমাদের অনেকের নাড়ীনক্ষত্রের অলক্ষ্য পরিচয় আমি অলক্ষিতে থাকিয়া লাভ করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং তোমার পক্ষে আমার নিকটে এই বিষয় ব্যাখ্যা না করিলেও হইবে যে, তুমি কাজ করিতে গিয়া কি কি বাধা পাইতেছ। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত মানুষদের মনের গঠন অতীব সঙ্গোপনে এমন একটা বৈষম্যের ব্যাসকূট রচিত হইয়া আছে, যাহা সম্ভবত আলেকজাণ্ডারের গর্ডিয়ান নট ছিন্ন করার মতন কোনও একটা আকস্মিক অঘটন ছাড়া প্রতিষেধিত হইবে না। তাহা কবে হইবে এবং কি ভাবে হইবে, তাহা আমি কল্পনা করিয়াও বলিতে পারিতেছি না। তবু আমাদিগকে এই সত্যে নির্ভর করিতে হইবে যে, ধর্ম্মের ভেদ, আচারের ভেদ বা রুচির ভেদ যাহার সহিত যতই থাকুক, আমরা সকলেই কিন্তু পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানুষ একদা মানুষকে চিনিবেই, না চিনিলে সে মানুষ রহিল কি করিয়া? মানুষের পরিচয় পাইবার জন্য আমি বহুবার

তোমাদের ঘরে ঘরে গিয়া খবর নিয়াছি, আমরা সকলেই সত্য সত্য মানুষ কিনা। মানুষ মানুষকে আগে প্রাণ-বিনিময়ে আপন করুক, প্রকাশ্য একত্ব কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইবে। জগতে একটী মানুষও ঘৃণ্য নহে, বর্জ্জনীয় নহে।"

বেদ, ব্রাহ্মণ, মানুষ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ভেলানগর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীর্ঘকাল কারাকক্ষের অন্তরালে অদৃশ্য জীবন-যাপন করিয়া ঘরে আসিয়া উপলব্ধি করিতেছ যে, বেদ সত্য, ব্রাহ্মণ সত্য, মানুষ সত্য। এই তিনটী সত্যের সহিত চতুর্থ সত্য যোগ করিবার প্রয়োজন যে, সেবাই সত্য। সকল সত্যের পরম লক্ষ্য সেবা,—সেবা মানুষের, সেবা ঈশ্বরের, সেবা স্বদেশের, সেবা জগদ্বাসী সকলের এবং সেবা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ও অন্যান্যদের। একটা সত্যকে জীবনের উপলব্ধিতে পাইলেই লক্ষ লক্ষ সত্য আপনা আপনি অগণিত তারকারাজির ন্যায় হৃদয়-গগনে হাসিমুখে ফুটিয়া ওঠে।"

বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত বাঘাদি গ্রাম-নিবাসিনী জনৈকা পত্র-লেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পত্নীরা জান্তব প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনে পুরুষের নিত্যসহচরী, এই একটী অসম্পূর্ণ ধারনারই বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষেরা পত্নীদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সহবাস-কর্ম্মে রত হইয়া বাধ্য করে। স্ত্রীরা সংযমে ইচ্ছুকা হইলে তাহারও অপব্যাখ্যা করিতে ইহাদের আটকায় না। কিন্তু বুদ্ধিমতী পত্নী তাহার স্বামীকে অবশ্যই আস্তে আস্তে সংযম পালনের উপকারিতার বিষয়ে অবহিত করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীদের একটু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়। বোকা মেয়েরা স্বামীকে রাগাইয়া দিয়া অনেক সময়ে পরনারীর দিকেই ঠেলিয়া দেয়। বিবাহিতের ঘনিষ্ঠ জীবনটুকু এমনই একটা জীবন যে, ইহার ভিতরে বাহিরের মানুষকে প্রবেশ করিতে দেওয়া মারাত্মক ব্যাপার। স্বামী ও স্ত্রীর ব্যাপার স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা চাই, নতুবা দারুণ মানসিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইতে পারে। স্ত্রীর সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, পুরুষেরা যখন নারীতে উপরত হয়, তখন সব সময়েই তাহারা সম্ভোগ-লালসার দ্বারা বা ভোগ-প্রয়োজনেই যে তাহা করে, তাহা নহে। অনেক সময়ে তাহারা চিরাচরিত অভ্যাসেরই মাত্র পুনরাবৃত্তি করে এবং সম্ভোগক্রিয়া শেষ হইয়া যাইবার পরে মনে মনে অনুতাপ করে যে, প্রকৃত সম্ভোগ-সুখ কিছুই উপলব্ধ হইল না অথচ সত্তাশক্তির অপচয় ঘটিল। অভ্যাস এমনই একটা মারাত্মক জিনিষ যে, নারী না পাইলে একটা গাছ বা পাথর অবলম্বন

করিয়াও কতক্ষণ তাহার দাসত্ব করিয়া লইতেই হইবে। স্বামীকে অভ্যাসের এই অতি কদর্য্য দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন অতীব বুদ্ধিমত্তা সহকারে কাজ করিয়া যাওয়া। কি কাজ কেমন করিয়া করিতে হইবে, তাহাও তাহাকেই আবিষ্কার করিতে হইবে। স্বামীর দীর্ঘায়ু লাভের প্রয়োজনে তাহাকে প্রীতিপূর্ণ মধুভাষণ এবং হিতবচন দ্বারা অনেক সময়েই নিবৃত্ত করা যাইতে পারে। কোন্ স্বামীর কেমন ধাত, তাহা তাহার স্ত্রী ব্যতীত অপর কেহ কি করিয়া বুঝিবে বা অনুমান করিতে পারিবে? একদা স্বামীকে হয়ত বিপত্নীক হইতে যে হইবে না, একথা কে বলিতে পারে? যে পত্নীকে এত আদরণীয় ও আবশ্যকীয় বলিয়া মনে হইতেছে, সেই পত্নী যেদিন ইহজগতে থাকিবে না সেদিন স্বামী বেচারী কি করিবে, কোথায় যাইবে? এই জাতীয় বৈরাগ্যমূলক চিন্তা কখনো কখনো কাজ দিয়া থাকে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, প্রকৃত সৎলোকের সঙ্গ, মহাপুরুষদের সদুপদেশ-সমূহের আলোচনা প্রভৃতিও গৌণ ভাবে বিশেষ সহায়ক হইতে পারে। সৎসঙ্গীতের প্রভাব ত' বিশেষ ভাবেই স্বীকার করিতে হইবে। কুৎসিত সঙ্গীত-সমূহ ইন্দ্রিয়ের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতাকে ইন্ধন যোগাইয়া থাকে, উত্তেজনার যোগান দেয়। সৎসঙ্গীতের সাহায্যে গোটা একটা জাতির পুনরভ্যুদয় সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি।

কেমন যুবক চাই

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত চেলিখোলা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"৬ই বৈশাখ আমি রহিমপুর আশ্রমে থাকিতেছি। সেখানে সদলবলে দেখা করিও। সঙ্গী আনিতে এমন যুবকদের নিয়া আসিও, যাহাদের অন্তরে সংযত জীবন-যাপনের আগ্রহ জন্মিয়াছে। যাহাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিতে হয় না, অল্প কথায় যাহারা তুষ্ট হয় এবং ব্যক্তিগত চেষ্টা, অভিনিবেশ ও অধ্যবসার দ্বারা প্রাপ্ত উপদেশের আংশিক হইলেও সার্থকতা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে, মাত্র এমন যুবকদেরই সঙ্গে করিয়া আনিবে। লোক বাড়াইয়া ভিড় জমাইবার ভিতরে কোনও লাভ নাই। অল্প লোকই আসুক কিন্তু তাহারা যেন খাঁটি সোণা হয়। যে সোণা হইতে পারে নাই, তার অন্ততঃ রূপা হইবার আকাঙ্ক্ষাটাও জাগ্রত থাকা চাই। উপদেশ দিতে দিতে আমি নিজে ত' একেবারে ফতুর হইয়া গেলাম। তাই আর উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না। আমাকে দেখিবামাত্র যাহার অন্তরে দিব্য-কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি জাগিবে, এমন ছেলেদের আগমনের আমি প্রত্যাশায় আছি। তবে, আমি ত' কোনও সাধক-পুরুষ নহি, আমি একেবারে সাধারণ একটী মানুষ মাত্র। এই জন্যই খুব বেশী আশাও পোষণ করি না। ভাগ্যক্রমে তাহাদের সঙ্গে যদি দেখা হয়, যাহারা বিনা

উপদেশেই মর্ম্মকথা বুঝিয়া নিতে পারে, তবে ত' আমি হাতে হাতে স্বর্গ পাইয়া যাইব। ইহা দুরাশা হইলেও অসঙ্গত' আশা নহে। আর, আশাই যখন করিতে হইবে, তখন ছোট ছোট আশা আর ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষা করিতে যাইব কোন্ দুঃখে? আজ কেন, চিরকালই দেশমাতৃকার আত্মত্যাগী সন্তানের প্রয়োজন। স্বার্থপর, ক্ষীণদৃষ্টি, ভোগাতুর কোটি কোটি সন্তান লাভের সুফল যে কি, তাহা ত' দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনেই বুঝা যাইতেছে। ত্যাগী, কর্ম্মক্ষম, নিরলস ও অকুতোভয় কর্ম্মীদের আজ চাহি এবং তাহাদের আগমন-সম্ভাবনাকে দ্রুতায়িত করার চেষ্টাই আজিকার দিনে দেশসেবার সব চেয়ে বড় ফরমুলা।"

মানুষের সম্ভাবনা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত চৌবেপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একদিন মানুষ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে বায়বীয় যান লইয়া সপরিবারে ভ্রমণ করিবে, এমন দিন খুব দূরে নয়। কিন্তু তাহাতে মানুষের কৃতিত্বের আর কতটুকু থাকিবে প্রশংসনীয়? তাহারা কি তাহাদের লুব্ধ, ক্রুদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ, কামোন্মত্ত, দুর্ব্বল চরিত্রকে সেই দিন সংশোধিত করিয়া চলিতে পারিবে? যদি পারে, তবেই ত' মানুষ বাহাদুর! নতুবা, 'বিষমসমরবিজয়ী'

বলিয়া প্রশংসাসূচক উপাধি বিতরণ করিলেই তাহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে না। মানুষ মানুষের সহিত যে পরিমাণ শত্রুতা করিতেছে, তাহার যেমন ইয়ত্তা নাই, তেমনই আবার তাহার দেবত্ব লাভের সম্ভাবনা এত অধিক যে, আত্মোন্নতির সাধনা করিতে করিতে সে তাহার উৎকর্ষকে কোন্ উচ্চতম স্তরে নিয়া যে ঠেলিয়া তুলিতে পারিবে, সেই কথাও অঙ্কের হিসাবে কদাচ আনা সম্ভব হইবে না। জড়বিজ্ঞানের উন্নতিই মানুষের শেষ কৃতিত্ব নহে। আত্মবিজ্ঞানের উন্নতিতেই মানুষের সকল সম্ভাবনার পূর্ণ সার্থকতা এবং প্রকৃত কৃতিত্ব। তোমরা সেই দিকে লক্ষ্য দাও।"

একমাত্র ধ্যান

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত চালিতাতলি-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মানুষ কল্পনা করে এক, ঘটনা ঘটিবার কালে ঘটিয়া যায় আরেক। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপরে তোমার আমার হাত অতি অল্পই আছে। সুতরাং জীবনে বারংবার আশাভঙ্গ ঘটিবার কারণ ঐখানেই নিহিত রহিয়াছে। তথাপি কাজ করিতে হইবে, কাজের পরিকল্পনা করিতে হইবে এবং কাজের আয়োজনে প্রয়োজনীয় মানুষগুলিকে যোগদানের জন্য ডাকিতে হইবে। যাহাদের লইয়া তুমি তোমার প্রথম সমিতিটী গড়িয়া তুলিলে, হয়ত তিন সপ্তাহ পার হইবার পূর্ব্বেই তন্মধ্যে

অধিকাংশ সভ্য অন্য দিকে ধাবমান হইবে। কেহ চলিয়া যাইবে ভয় বশতঃ, কেহ শারীরিক দুর্ব্বলতা-বশতঃ, কেহ স্বাস্থ্যভঙ্গ-হেতু, কেহ বা ইহার চাহিতে অধিকতর দুঃসাহসিক কর্ম্মের প্রবল আকর্ষণে। একটী মাত্র কাজে একটী মাত্র লক্ষ্যে দীর্ঘকাল বিশ্বস্ত ভাবে লাগিয়া থাকিবার তপস্যা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। মানুষের চরিত্রের এই বিচিত্রতা মানিয়া লইতেই হইবে। কেহ চলিয়া গেলে বিষন্ন হইও না, কেহ নূতন আসিয়া পড়িলেও উল্লসিত হইও না। তোমার কর্ত্তব্য শুধু এইটুকু দেখা যে, তুমি যেন অটুট নিষ্ঠায় স্বেচ্ছাগৃহীত পুণ্যপথে আমৃত্যু লাগিয়া থাকিতে পার। আমি এই ব্যাপারে অতীব সতর্ক বলিয়াই হাজার সুযোগ বা দুর্য্যোগ সত্ত্বেও রাজনীতির পথে কদাচ পা বাড়াই নাই। জাতির চরিত্র-গঠনই আমার একমাত্র কাজ, একমাত্র ধ্যান।"

শান্তি চাই

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত কঠিয়াদি-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দূরদূরান্তর হইতে হাতছানি দিয়া তোমাকে শত শত অজ্ঞাতপূর্ব্ব মানব-মানবী ডাকিতেছে,— তাহারা মোহের পাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহে। ভোগ তাহারা অনেক করিয়াছে কিন্তু দেখিয়াছে, ভোগে তৃপ্তি নাই। তাহারা প্রকৃত তৃপ্তির

আস্বাদন পাইয়া ধন্য হইতে চাহে। তাহারা সাধুসন্তদের অলৌকিক শক্তির ম্যাজিক দেখিতে চাহে না, কারণ, তাহাদের নিজেদের মধ্যেই বহুজন জগদ্বাসীকে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ম্যাজিক দেখাইয়া বোকা বানাইয়া দিয়াছে কিন্তু তাহাতে লাভ কিছু হয় নাই। তাহারা শান্তি চাহে। তোমরা প্রত্যেকে সাধন করিয়া প্রকৃত শান্তির অধিকারী হও এবং নিঃশেষে নিজেদের প্রাপ্ত সম্পদ জগদ্বাসীকে অকাতরে বিলাইয়া দিয়া মানব-জীবন ধন্য কর।"

অকৃতজ্ঞ পুত্রকন্যার পিতামাতার করণীয়

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ধড্ডা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অকৃতজ্ঞ-স্বভাবের পুত্রকন্যাদের জন্য পিতামাতা যতই ত্যাগ স্বীকার করুক না, এই অকৃতজ্ঞেরা মনে করে যে, এই ত্যাগের ভিতরে মহত্ত্ব কোথায় আছে? ইহা করা ত' পিতামাতার কর্ত্তব্য। কেহ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছে বলিয়া তাহাকে আবার তারিফ করিতে হইবে নাকি? ইহারা বিচার করিয়া দেখে না যে, পিতামাতার কাছ হইতে কিছু পাইতে হইলে ভদ্রতার অনুরোধেও বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। পিতামাতা কাহাকেও জন্ম দিয়াছেন বলিয়াই যদি দায়গ্রস্ত হইলেন, তবে কেহ ঐ ঘরে জন্ম নিয়া গৃহস্থদের শ্রম, ত্যাগ

ও সেবা আদায় করিয়া নিল বলিয়া তাহাদেরও দেনা আছে। অবশ্য, অনেক বুঝ-প্রবোধ দিয়াও অবুঝ অকৃতজ্ঞ পুত্রকন্যাকে এই বিষয় বুঝান যাইবে না, শুধু পাইয়া যাওয়াই তাহাদের প্রয়োজন, বিনিময়ে একটু ভদ্রতা বা বিনয়-নম্রতাও আশা করিবার উপায় নাই।—এই সকল ক্ষেত্রে পিতামাতাকে ধৈর্য্য সহকারে শুধু কালপ্রতীক্ষা করিতে হয়। অন্য উপায় কিছু নাই। পুত্রকন্যাকে শাসন করিলে তাহারা রুখিয়া দাঁড়াইবে, তিরস্কার করিলে অযশস্কর ভাবে গৃহত্যাগ করিবে, উপদেশ দিতে গেলে ক্ষেপিয়া উঠিবে, তোষামোদ করিতে গেলে মাথায় চড়িবে। এমতাবস্থায়, 'যাহা ঘটিবার ঘটুক, আমি ঈশ্বর-চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিষ্কাম চিত্তে শুধু লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিয়া কৃতার্থ হইব',—এই পণ নিয়া চলিতে হয়। কটু বাক্য কহিও না, কারণ তাহাতে ফল কিছুই হইবে না। যতক্ষণ নেশা-ভাং না করিতেছে কিম্বা পরনারী বা পরপুরুষে আসক্ত না হইতেছে, ততক্ষণ কোনও বিপদকেই বিপদ বলিয়া গণিও না।"

স্ত্রীকে অবিশ্বাস করা পাপ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত সাহাপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিবাহিতা স্ত্রীকে অবিশ্বাস করা পাপ। বিবাহের দ্বারা

যে নারীর সহিত সর্ব্বপ্রকার দাম্পত্য ব্যবহারের সামাজিক ছাড়পত্র মিলিয়া গিয়াছে, সেই নারী পতির স্নেহ, সোহাগ, ভালবাসা পাইবার পরেও পরপুরুষাসক্ত হইবে, এইরূপ ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করা এক প্রকারের বাতুলতা। কিন্তু একথাও সত্য যে, এরূপ অভাবনীয় ঘটনা জগতে কখনও কখনও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ সন্দেহকে অমূলক বলিয়াই মনে করা উচিত। স্ত্রীর প্রতি সন্দেহের ভাব জাগিলে স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীর প্রতি আরও অনুরক্ত হইয়া প্রথমে তাহার মনোজয় করিবার চেষ্টা করা। তারপরে কর্ত্তব্য স্ত্রীকে নানা সদাদর্শের প্রেরণা দিয়া পরোক্ষ উপায়ে সংশোধিত করিবার প্রয়াস পাওয়া। তারপরে প্রয়োজন উদার ক্ষমাশীলতার দ্বারা তাহার উপরে প্রভাব বিস্তার করা। সৎ-প্রয়াসের সৎফল আছেই আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু বিষয়টা এতটা জটিল এবং এই বিষয়ের অনুসন্ধান-কার্য্য এতই বিঘ্নসঙ্কুল তথা, কল্পনাবহুল যে, এই বিষয়ে সংসারত্যাগী হইয়া আমি অধিক উপদেশ দিতে পারিতেছি না। যে কারণটীকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর মন বিপথে যাইতে পারে, সেই আসল কারণটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তন্মূলে প্রতীকার চেষ্টা করিতে হইবে। হিংসা, জিঘাংসা, প্রতিশোধ-স্পৃহা বা দোর্দ্দণ্ড শাসন এই সব ক্ষেত্রে প্রতিকারের সহায়তা করে না।"

নারীজাতির বিশেষত্ব

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার ব্যক্তিগত সাধারণ ধারণাটী যদি শুনিতে চাহ, তবে আমি বলিব যে, অধিকাংশ নারীই তুচ্ছ ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের লালসায় স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিকা হয় না। পুরুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপর নারীর আকর্ষণে যত সহজে বিচলিত হয়, খুব সম্ভবতঃ অপর পুরুষের আকর্ষণে অধিকাংশ নারীই তদ্রূপ প্রলুব্ধা হয় না। যাহারা বিপথে পাদচারণা করে, তাহারা অন্যান্য গুরুতর ও ভয়ঙ্কর কারণ বশতই করে। নারীর আত্মদমনের ক্ষমতা যে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী, তাহার প্রমাণ এই যে, ভারতে বর্ত্তমানে পুরুষদের মধ্যে লাখ চুয়ান্ন দারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেছেন। কিন্তু কমপক্ষে পাঁচ সাত কোটি বিধবা পুনর্বিবাহ না করিয়া বা গোপন ব্যভিচারে জীবন ভাসাইয়া না দিয়া সেবাদানের মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ স্বরূপে গৃহস্থের ঘরে ঘরে দিদি হইয়া, কাকীমা হইয়া, পিসিমা হইয়া অপরের পুত্রকন্যাদের অপত্য স্নেহ দিয়া নিঃশব্দে পালন করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় দুই চারিটী বাদে বাকী প্রত্যেকে সংশিতব্রত তপস্বিনীর মতন কঠোর জীবন হাসিমুখে পালন করিয়া যাইতেছেন। ভারতে যতদিন বিধবা-জীবনের এই পবিত্রতা বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল নারীজাতির স্বাভাবিক সংযম-সামর্থ্য সম্পর্কে

সন্দেহবাদী হইবার কোনও রাস্তা নাই। সুতরাং পত্নীর ভিতরে সাধারণ নারীর স্বাভাবিক গুণ লজ্জাশীলতা যে নিশ্চয়ই আছে, এই বিশ্বাসটী অন্তরে জাগরূক রাখিয়াই প্রত্যেক স্বামীকে গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে নিয়ত সন্দেহই করিতে থাকে, তবে স্ত্রীর আবার স্বামীকে অবিরাম সন্দেহ করিতে থাকার পথে কি আপত্তি উত্থাপন করা চলিবে, বল ত'!"

দীক্ষার বয়স

ভ্রাতা শ্রীহরিবন্ধু দেবনাথ তাঁহার পত্নী শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবীকে নিয়া আসিয়াছেন দীক্ষিতা করিয়া নিবার জন্য। হিরন্ময়ীর বয়স বাইশ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মতে দীক্ষা গ্রহণের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে বারো বৎসর বয়স থেকে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত। দীক্ষা নেওয়ার পরে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত যদি একাগ্র মনে সাধনা করা যায়, তা'হলে আসাম মেইলে চাঁদপুর থেকে একেবারে তিনসুকিয়া ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত চলে যাবার মতন কয়লা ইঞ্জিনে ভ'রে নেওয়া যায়। কয়লা না থাক্‌লে ইঞ্জিন চলবে কি ক'রে?

হরিবন্ধু হাসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাসবার কথা নয়। প্রাচীন

কালে আট বৎসর বয়সে উপনয়ন হ'ত, তারপরেই আরম্ভ হ'ত গুরুগৃহে বাস। দ্বাদশ বর্ষ গুরুর তপোবনে বাস করার পরে একটা পূর্ণ মানুষ ঘরে ফিরে আসত সংসারী করার জন্য, গুরুগৃহে যে সম্বল সঞ্চয় করা হয়েছে, তার জোরে পঞ্চাশ বৎসর বয়স তক্ পার ক'রে আবার চল তপোবনে বানপ্রস্থাশ্রমে। মানবজীবনের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রাচীন এই বিধানটী আজও কালোপযোগী কিঞ্চিৎ সংশোধনের পরে আমাদের জীবনে প্রযোজ্য। আমরা অতীতের শ্রেষ্ঠ জিনিষটুকুকে ছেড়ে দিয়ে কেবল টিকির আস্ফালন আর শূদ্রের প্রতি ঘৃণাকেই সম্বল করেছি। আমাদের অধঃপতনের আসল কারণটী ত' এই।

শক্তিশালী বংশের পত্তন

কুমিল্লার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত অবনী গুপ্তের স্ত্রী শ্রীমতী সুবর্ণ প্রভা গুপ্তাও আজ দীক্ষা নিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসিলেন,—অবনী বাবু এলেন না?

সুবর্ণদি বলিলেন,—বল্লেন, তুমিই আগে নাও, আমি পরে নিয়ে নিব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আণ্ডাবাচ্চা সহ সবাইকে একদিন আস্‌তে হবে। বেশ, প্রতীক্ষাই করুক।

সুবর্ণদি বলিলেন,—আপনার আদেশ হ'লে সব দুধের শিশুদেরও এখনি দীক্ষা নেওয়াব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার দরকার নেই। অপেক্ষা করাই ভাল।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার গুপ্ত এক সময়ে পুপুন্‌কী আশ্রমের কর্ম্মী ছিলেন। তাঁর নববিবাহিতা পত্নী শ্রীমতী লীলা গুপ্তেরও আজ দীক্ষা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত প্রবোধকে বলিলেন,—স্ত্রীকে দীক্ষা নেওয়ালে, কাজটা ভালই করেছ। কিন্তু ভবিষ্যতে পুত্রকন্যারা যদি দীক্ষা থেকে বাদ প'ড়ে যায়, তাহ'লে সাধনটার ধারা অব্যাহত থাকবে না, এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রেখো। তুমি বিবাহ করার আগেই যে দীক্ষা পেয়েছ, বিবাহান্তে তোমার পুত্রের ভিতরে তার কিছু প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে। এই পুত্র যদি পুনরায় সেই একই পদ্ধতির সাধন পায় ও তদনুযায়ী সাধন করে, তবে তোমার পৌত্রের ভিতরে এই সাধনের প্রভাব সঞ্চারিত হবে। এভাবে যদি কয়েক পুরুষ পার ক'রে দিতে পার, তাহ'লে জানবে যে, একটা শক্তিশালী বংশের তুমি পত্তন ক'রে দিলে। এটা যে কত বড় একটা কথা, একটু না ভাবলে তা বুঝতে পার্ব্বে না। দীক্ষা কত লোকেই ত' নেয় কিন্তু সবই প্রায় হুজুগে প'ড়ে। রাম দীক্ষা নিল, তারপরে কালপূর্ণ হ'লে শ্মশানে পুড়ে ছাই হ'ল। যা উপকার হবার, তার আত্মারই হ'ল, যা পরমপ্রাপ্তি সে লাভ কর্ল, তা সে পরলোকে গিয়ে ভোগ কর্ল। কিন্তু রাম যখন দীক্ষাই নিয়েছে, তখন তার শরীর থেকে যে সব শরীর পত্নীগর্ভে জন্ম নিয়েছে, সেই শরীরগুলির

মধ্যে ধারাবাহিকতার ফলে এক নবজন্ম সঞ্চারণের চেষ্টা কেন হবে না? রামের দেহ শ্মশানে ছাই হ'য়ে যেন গেল, কিন্তু রামের সাধনা তার পুত্রে, পুত্রের সাধনা পৌত্রে, পৌত্রের সাধনা প্রপৌত্রে ধারাবাহিক ভাবে সঞ্চারিত, সংবর্দ্ধিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হ'তে হ'তে অনন্ত পথ পানে কেন ছুটবে না? রামের শারীরিক আবির্ভাব, তার বংশধরদের শারীরিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে ক্রমোন্নতির পথে যাবে না কেন? পিতা ইচ্ছা কর্লেই তার পুত্রকে, পুত্র ইচ্ছা কর্লেই পৌত্রকে, পৌত্র ইচ্ছা করলেই প্রপৌত্রকে সেই ধারার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিতে পারে। আমি যেই পদ্ধতিতে দীক্ষা দেই, সেটা জগন্মঙ্গলের প্রশস্ত রাজপথ। এই পথে তোমার মনকে তুমি বিচারশীল রেখে তোমার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণুকেও প্রভাবিত কচ্ছ। তোমার পুত্রও কেন তা কর্ব্বার শিক্ষা পাবে না? তোমার মুক্তিকল্পনা ত' সাকল্য-মুক্তি, একা তোমার নিজস্ব মুক্তিটুকু নয়। তবে তোমার পুত্রকে, পৌত্রকে, প্রপৌত্রকে ঐ একই পদ্ধতিতে চলতে প্রেরণা তুমি দেবে না কেন? অনেকে যে দেয় না, তার কারণ তারা অন্ধ। তারা ভবিষ্যৎকে দেখতে পায় না বা দেখতে চায় না।

বংশানুক্রমিক সাধনায় রূপান্তর

শ্রীযুক্ত হরিবন্ধু নিকটেই ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন,—সাধন ত' আমরা করি নিজ নিজ আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য এবং গৌণভাবে নিজ নিজ শারীরিক হিতসাধনের জন্য। এর সঙ্গে উত্তরসূরীদের কোন্ সম্পর্ক আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— ভুলে যাচ্ছ কেন যে, তুমি যখন বিবাহিত হ'লে, তখন সঙ্গে সঙ্গে একটা বংশ-প্রতিষ্ঠাতা হবার সুযোগ ভগবান্ তোমার হাতে তুলে ধরলেন। এবংশে রাবণ, কংস, দুরাচার দস্যু, পরানিষ্টকারী দুর্ব্বৃত্তও জন্মাতে পারে, আবার সাধন-সিদ্ধ পরদুঃখকাতর মহাপুরুষেরও জন্ম হ'তে পারে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর কর্ব্বে পরমেশ্বরের কৃপার উপরে কিন্তু আংশিক নির্ভর করে তোমার নিজের রুচি, অভিপ্রায়, প্রয়াস ও নিষ্ঠার উপরে। জগতের মঙ্গল-চিন্তা-মূলক সাধন-পদ্ধতির অনুবর্ত্তন কত্তে কত্তে তোমার শারীরিক অনুপরমাণুসমূহ, বিশেষ ক'রে তোমার মস্তিষ্ক-মধ্যস্থ বিশেষ বিশেষ বিন্দুগুলিতে যে সকল কল্যাণপ্রদ পরিবর্ত্তন হচ্ছে এবং হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেই সকল পরিবর্ত্তন যদি তোমার পুত্রের দেহেও ঘটবার সম্ভাবনাগুলির উৎস-মুখ তুমি খুলে রাখ বা প্রতিষ্ঠিত কর, তাহ'লে ধারাবাহিক ভাবে কয়েক পুরুষ ধ'রে সাধন কত্তে কত্তে একটা নূতন জাতের মানুষের আবির্ভাব জগতে সম্ভব হবে। ক্রমোন্নতি হ'তে হ'তেই ত' বনমানুষের বংশধরেরা আজকের সভ্য মানুষে রূপান্তর পেয়েছে।

কুমিল্লার তৃতীয় বক্তৃতা

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি ঈশ্বর পাঠশালার সংলগ্ন মাঠে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতাটি দিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষকে মনে রাখতে হবে যে, স্বভাবতই সে দেবতা, সে দানব নয়। মানুষের এই দেবত্বকে বহির্বিকশিত করবার আনুকূল্য বিধানের জন্যই যম-নিয়ম প্রভৃতির অনুশীলন এবং গুরুগৃহে শিক্ষাগ্রহণ। একদা আমরা পশু ছিলাম বা রাক্ষস ছিলাম, আজ আমরা মানুষ রূপে আত্মপরিচয় দিচ্ছি। কাল আমরা দেবতা হব এবং দেবতা ব'লে আত্মপরিচয় দেব। এই যে আমাদের ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা, তাকে মনে প্রাণে স্বীকার করাই হচ্ছে তপস্যা।

তপস্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তপস্যা ত্যাগ-সাপেক্ষ, ক্লেশ-সাপেক্ষ, ধৈর্য্য-সাপেক্ষ। ক্লেশসহনের ক্ষমতা, ধৈর্য্য-ধরার যোগ্যতা, ত্যাগ স্বীকারে রুচিস্পন্ন হওয়া সহজ কথা নয়। তারই জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য্যের। ব্রহ্মচর্য্যকে যে সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলা হয়েছে, তার আসল কারণ এইটী।

দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া বক্তৃতা চলিল। অদ্য জনতা পূর্ব্বদিবস অপেক্ষা অনেক বেশী হইল।

জনে জনে ভগবানের পূজা করিবে? উত্তর এই যে, ফুল দিয়া একজনে পূজা করিবার পরে সেই ফুল আরও এক জনে পূজা করিবার জন্য ব্যবহার করিতে পারে না। ভগবৎ-পাদপদ্মে অর্পিত হইবার পরে সেই ফুল নির্ম্মাল্য হইয়া যায়, তাহা হাজার লোকের মস্তকে আশীর্ব্বাদীয় এক অমূল্য বস্তু রূপে মস্তকে স্পৃষ্ট হইতে পারে, পূজার ফুল রূপে তাহা আর ব্যবহার করা চলে না। তুমি জোর করিয়া যদি নূতন বিধান কিছু কর, তবে তাহা জবরদস্তি হইবে, অনাচার হইবে, ব্যভিচার হইবে।"

দীক্ষা নিবার জন্য ডাকিও না

নোয়াখালী জেলান্তর্গত ভোলাবাদশা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য একটী প্রাণীকেও ডাকিও না। এ ডাক নিরর্থক। আমি লোককে দীক্ষা দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া স্থানের পর স্থান পরিভ্রমণ করিতেছি না। আমি চাহি যে, প্রত্যেকটী মানুষের মনের মধ্যে জগৎ-কল্যাণমূলক উচ্চ চিন্তা এমনই সুপ্রতিষ্ঠিত হউক, যাহার ফলে আস্তে আস্তে বর্ত্তমানের সাধারণ মানবজাতি ভবিষ্যতের এক দেবমানব-জাতিতে পরিণত হইবে। আমি চাহি, সাধারণ দোষগুণের অধিকারী আজিকার মানুষেরা ভবিষ্যতে সর্ব্বদোষ-

বিরহিত অসংখ্য গুণে বিমণ্ডিত দেবমানবে রূপান্তরিত হউক। একটা নিকৃষ্ট জাতি হইতে ক্রমিক উন্নতির দ্বারা ভবিষ্যতে অভ্যুন্নত এক মহাজাতি সৃষ্টির পরিপূর্ণ সম্ভাবনায় আমি আপ্রাণ বিশ্বাসী। তাই আমি চাহি যে, আমার অন্তরের ভাবগুলি, আমার অনুশীলনের আদর্শগুলি, আমার জীবনের দুই চারিটি বিরল দৃষ্টান্তকে সকলে অনুসরণ করুক। সুতরাং প্রয়োজন হইতেছে ভাব-প্রচারের। আমাকে প্রচার করিয়া কোনও লাভ নাই। আমি প্রশংসা এবং নিন্দার উর্দ্ধে থাকিতে চাহি। আমি স্তুতি এবং সমালোচনার অতীতে রহিতে অভিলাষী। আমার কাছে মানব-সন্তানদিগকে আসিয়া দলে দলে দীক্ষা নিতেই হইবে, এমন কোনও গোঁড়ামি বা জিদের তোমরা বশবর্ত্তী হইও না বা কাহাকেও শিকার করিও না। আমার ব্যবসায় ব্যাধের নহে, আচার্য্যের। আচার্য্য যে উপদেশ দিবেন, তাহা নিজে পালনও করিবেন। অন্যেরা উপদেশ অনুসরণ করিয়া জীবন-গঠন করুক, আচার্য্য ইহা কামনাও করিবেন। কিন্তু কাহাকেও দীক্ষাসূত্রে বন্ধন করিয়া চিরজীবনের জন্য ক্রীতদাস করিবেন, ইহা আচার্য্যের কাজ নহে। দীক্ষা-রূপ আধ্যাত্মিক সংস্কারটী এদেশে এমনই দৃঢ়মূল যে, ইহার দ্বারা কিছু লোকের সত্য সত্যই হিত সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীক্ষাদাতা গুরুদেবের পূজা ও প্রতিষ্ঠার পথ মাত্র উন্মুক্ত হইয়াছে, দীক্ষিতদের ব্যাপক ভাবে বা গভীর ভাবে কোনও অসাধারণ হিত সম্পাদিত হইয়াছে কিনা, বোধগম্য হয় নাই। দলে দলে দীক্ষা নিল, সঙ্গে সঙ্গে দলে

দলে লোক কি সত্য সত্য সৎ হইল? দীক্ষা নিবার পরে দীক্ষিত মানুষগুলি যদি সৎ হইবার এবং নির্লোভ থাকিবার চেষ্টা না করিল, তবে দীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল কি দর্শকদের দ্বারা উপলব্ধ হইবে? এক এক জন লোকগুরু আসিয়া পঙ্গপালের ন্যায় শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধন করিয়া গেলেন, এই দৃশ্য ত' নানা স্থানে কিছু দিন পরে পরেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গপালেরা পরের শস্যক্ষেত্রের প্রতি লোভ ছাড়িয়া দিয়া সর্পশ্বাপদসঙ্কুল সংসার-অরণ্যের বিপদ-আপদের পরিমাণও কমাইয়া দিতে লাগিল, এইরূপ দৃশ্য কি হামেশা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে? কেবল দীক্ষাদান ও দীক্ষাগ্রহণ একটা কাজের কথাই নহে। দীক্ষার মধ্য দিয়া এক একটা মানুষ এক একটা নবজন্মান্তরে প্রবেশ করিল, অতীতের কদভ্যাস, পাপ, প্রবঞ্চনা, প্রাকৃত জঘন্যতা বর্জ্জন করিল, ধরিত্রীর উত্তপ্ত আবহাওয়াকে স্নিগ্ধ ও শীতল করিল, ইহাই কি কাম্য হইবে না? সুতরাং যাহার প্রয়োজন একেবারে মৌলিক, তাহা হইতেছে সদভাবের প্রচার,—ব্যাপক প্রচার এবং গভীর অনুপ্রবেশ।"

নামেরই জয়ধ্বনি দাও

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত ব্রাহ্মণশাসন নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসার-খাণ্ডবে অগ্নিদাহন সহিতে সহিতেও তোমাদিগকে

আমৃত্যু নিষ্ঠায় ভগবানের নামেরই জয়ধ্বনি দিতে হইবে। দুঃখ, দুর্দ্দৈন্য, দুর্দ্দশায় বারংবার বিদলিত হইয়াও বারংবার ভগবানেরই নাম স্মরণ করিতে হইবে। নাম তোমাকে সাহস দিবে, শৌর্য্য দিবে, জয়িষ্ণুতা দিবে। নামকে জানিবে কল্পতরু। যাহা চাহ তাহা ত' পাইবেই, যাহা চাহ নাই কিন্তু প্রয়োজন, তাহাও পাইবে। দৃঢ়তার সহিত নামে লাগিয়া থাকার সামর্থ্যের চেয়ে বড় বীরত্ব তিন ভুবনে আর কিছু নাই। নামের সেবক নির্লোভ হয়, নির্ব্বিদ্বেষ হয়, ক্ষমাশীল হয় এবং দুর্দ্দমনীয় তেজের অধিকারী হয়। এই কথাগুলি সত্য কিনা, তাহা নামে লাগিয়া থাকিয়াই পরীক্ষা করিতে হয়, তর্ক-বিতর্কের দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। কি নাম জপিবে, ইহা নিয়া কোনও সমস্যা থাকা উচিত নহে। আমি বলি, যে যেই নামে ডাকিতে ভালবাস, সে সেই নামেই ডাকো। নানা জনে নানা নামে ভগবানকে ডাকিলেও ভগবান্ কিন্তু মাত্র একজন। হিন্দুর ভগবান্ একজন, মুসলমানের ভগবান্ আবার আর একজন, খ্রীষ্টানের ভগবান এক তৃতীয় সত্তা,—এরূপ হইতে পারে না। যে যেই নামে রুচি পাও, সে সেই নামে ডাক। ডাকিতে থাক অবিরাম, অবিশ্রাম, নিরন্তর। তোমার জীবন-গতির প্রতিটি ছন্দে নামেরই জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতে থাকুক।

তরুণ কিশোরদের মধ্যে কাজ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত মেড্ডা-নিবাসী জনৈক পত্রপ্রেরকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তরুণ, কিশোর ও যুবক যেখানে যাহাকে দেখিবে, ডাকিয়া বলিবে,—'ভাই তোমার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, যাহাকে প্রকটিত, প্রস্ফুটিত ও পরিপূর্ণিত করিবার জন্য সংযম-সাধনার প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে যাহাতে করিবার মত করিয়া সকল কাজ করিতে পার, তাহার জন্যই আজ তোমার আত্মগঠন প্রয়োজন। সুতরাং তোমার নিজের অস্তিত্বকে দেশ ও জাতির পক্ষে একটা অমূল্য সম্পদ জ্ঞান করিয়া নিজেকে গড়িবার ও বাড়াইবার সাধনায় অগ্রণী হও।'—একবার বলিবে, দুইবার বলিবে, শতবার সহস্রবার বলিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে আত্মগঠনে ব্রতী না করিতে পারিতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর আশা ছাড়িবে না। আশাও যেমন ছাড়িবে না, তাহার সঙ্গও তেমন ছাড়িবে না। তাহার সহিত তোমার যাবতীয় ভাবের আদান-প্রদানকে যাবতীয় স্বার্থ ও লালসার ঊর্দ্ধে রাখিয়া তোমাকে কাজ করিতে হইবে। ইহাদের প্রতিজনের হস্তে সসম্মান কর্ম্ম তুলিয়া ধর এবং প্রতিজনে যাহাতে প্রতিজনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কাজে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ উপদেশ, শিক্ষা ও প্রেরণা ইহাদিগকে দিতে থাক। যক্ষের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া ইহাদের আচরণের শোভনতাকে রক্ষা করিয়া চল, ভিড়ের দঙ্গলে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া হঠাৎ কেহ পূর্ব্ব অভ্যাসে ফিরিয়া গিয়া নিজেকে দুর্ব্বল না করে, সেই দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখ। কাজ সুদীর্ঘকাল চালাইয়া যাইতে হইলে এই কথাগুলি

তোমাদের মনে রাখিতেই হইবে। তুমি যদি সুদীর্ঘকাল কাজ চালাইয়া যাইতে চাহ, তাহা হইলে এই নির্দ্দেশ তোমাকে মানিতেই হইবে। তুমি যদি তাহাদের প্রকৃতই আস্থা-ভাজন হইতে চাহ, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি তোমাকে আস্থা অর্পণ করিতে হইবে। খর দৃষ্টি রাখিও যেন কেহ গোপনে বিপথে পা না বাড়ায়, কিন্তু তাহারা প্রতিজনে যে শত দেবদূতের কাজ করিতে পারে, এই বিশ্বাসটী অন্তরে রাখিও।"

পতি-পত্নীর প্রকৃত সম্বন্ধ

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত মৌলভী-বাজার নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পতিপত্নীর পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাপারে তোমাদের অধিকাংশের মনে যে বিপজ্জনক ধারণাটী আছে, তাহাই দাম্পত্য জীবনকে বিপর্য্যয়কর করিয়া রাখিয়াছে। পত্নী হইতেছে ভোগ্যা আর পতি হইতেছে ভোক্তা,—এই যে এক মারাত্মক কুসংস্কার তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আছে, তাহাই তোমাদের মোহ-কারাগারের ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন দুয়ার-গুলিকে চিরতরে অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীর শরীর-মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করিয়া যিনি প্রাণকে সংরক্ষণ করিতেছেন, আর স্ত্রীর শরীর-মধ্যে অবস্থান করিয়া যিনি ঐ একই কাজটী করিতেছেন, তিনিই যুগপৎ এবং উভয়তঃ

"তরুণ, কিশোর ও যুবক যেখানে যাহাকে দেখিবে, ডাকিয়া বলিবে,—'ভাই তোমার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, যাহাকে প্রকটিত, প্রস্ফুটিত ও পরিপূর্ণিত করিবার জন্য সংযম-সাধনার প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে যাহাতে করিবার মত করিয়া সকল কাজ করিতে পার, তাহার জন্যই আজ তোমার আত্মগঠন প্রয়োজন। সুতরাং তোমার নিজের অস্তিত্বকে দেশ ও জাতির পক্ষে একটা অমূল্য সম্পদ জ্ঞান করিয়া নিজেকে গড়িবার ও বাড়াইবার সাধনায় অগ্রণী হও।'—একবার বলিবে, দুইবার বলিবে, শতবার সহস্রবার বলিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে আত্মগঠনে ব্রতী না করিতে পারিতেছ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর আশা ছাড়িবে না। আশাও যেমন ছাড়িবে না, তাহার সঙ্গও তেমন ছাড়িবে না। তাহার সহিত তোমার যাবতীয় ভাবের আদান-প্রদানকে যাবতীয় স্বার্থ ও লালসার উর্দ্ধে রাখিয়া তোমাকে কাজ করিতে হইবে। ইহাদের প্রতিজনের হস্তে সসম্মান কর্ম্ম তুলিয়া ধর এবং প্রতিজনে যাহাতে প্রতিজনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কাজে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ উপদেশ, শিক্ষা ও প্রেরণা ইহাদিগকে দিতে থাক। যক্ষের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া ইহাদের আচরণের শোভনতাকে রক্ষা করিয়া চল, ভিড়ের দঙ্গলে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া হঠাৎ কেহ পূর্ব্ব অভ্যাসে ফিরিয়া গিয়া নিজেকে দুর্ব্বল না করে, সেই দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখ। কাজ সুদীর্ঘকাল চালাইয়া যাইতে হইলে এই কথাগুলি

তোমাদের মনে রাখিতেই হইবে। তুমি যদি সুদীর্ঘকাল কাজ চালাইয়া যাইতে চাহ, তাহা হইলে এই নির্দ্দেশ তোমাকে মানিতেই হইবে। তুমি যদি তাহাদের প্রকৃতই আস্থা-ভাজন হইতে চাহ, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি তোমাকে আস্থা অর্পণ করিতে হইবে। খর দৃষ্টি রাখিও যেন কেহ গোপনে বিপথে পা না বাড়ায়, কিন্তু তাহারা প্রতিজনে যে শত দেবদূতের কাজ করিতে পারে, এই বিশ্বাসটী অন্তরে রাখিও।"

পতি-পত্নীর প্রকৃত সম্বন্ধ

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত মৌলভী-বাজার নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পতিপত্নীর পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাপারে তোমাদের অধিকাংশের মনে যে বিপজ্জনক ধারণাটী আছে, তাহাই দাম্পত্য জীবনকে বিপর্য্যয়কর করিয়া রাখিয়াছে। পত্নী হইতেছে ভোগ্যা আর পতি হইতেছে ভোক্তা,—এই যে এক মারাত্মক কুসংস্কার তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আছে, তাহাই তোমাদের মোহ-কারাগারের ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন দুয়ার-গুলিকে চিরতরে অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীর শরীর-মধ্যে আত্মারূপে বিরাজ করিয়া যিনি প্রাণকে সংরক্ষণ করিতেছেন, আর স্ত্রীর শরীর-মধ্যে অবস্থান করিয়া যিনি ঐ একই কাজটী করিতেছেন, তিনিই যুগপৎ এবং উভয়তঃ

ভোক্তা, অপর কেহ ভোক্তা নাই। পতি যে উপভোগ-সুখটুকু আস্বাদন করিল, তাহাই এই অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত সত্য নহে, পত্নী যে সুখটুকু পাইল, তাহাও এই হিসাবের সঙ্গে যুক্ত হইবে। উভয় দিকের সবটুকু সুখ আসলে কিন্তু একটী অদৃশ্য শক্তির অর্থাৎ আত্মার, যিনি উভয়ের ভিতরে অবস্থান করিয়াও এক এবং অদ্বিতীয়। সেই অদ্বিতীয়কে উভয়ের মধ্যে যুগপৎ অবস্থান-রত দেখিতে না পাওয়া পর্য্যন্ত পতি ঠিক ঠিক পতি হইল না, পত্নী ঠিক্ ঠিক্ পত্নীও হইতে পারিল না। আর, যুগপৎ অর্থাৎ এক সঙ্গে দুই জনের ভিতরে বিরাজমান পরমেশ্বরকে এক ও অভিন্ন রূপে দেখিতে পাওয়া মাত্র, স্বামী প্রকৃত স্বামী হইল, পত্নী প্রকৃতই হইল সহধর্ম্মিণী। এই তত্ত্ব পাশ্চাত্যেরা জানে না বা ইহা নিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও কখনও মাথা ঘামান নাই। তাঁহারা এই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতাকে লক্ষ্য করিয়া হাজার কথা কহিয়াছেন, হাজার গাথা লিখিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের পরম নৈকট্য যে উভয়কে একটী সত্তায় পরিণত করে, এই উপলব্ধির কাছ ঘেঁষিয়াও তাঁহারা হয়ত যান নাই। এই কারণেই 'পতি পরম দেবতা' কথাটাকে ভারতীয় নারীর ক্রীতদাসীত্বের প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন। ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়তার সময়ে পতি ও পত্নীতে এমনই এক সোহাগভরা একাত্মতা-বোধ আসে, যাহা নারীকে দিয়া আপনা আপনি বলাইয়া লয়,—'পতি পরম দেবতা',—যাহা পুরুষকে দিয়া বলাইয়া লয়,—'নারী সর্ব্বদেবময়ী।' এই উভয় উক্তির মধ্যেই

একটী মাত্র ভাব বিদ্যমান,—বক্তার ব্যক্তিত্ব-সম্পর্কে দাবী একেবারেই অনুপস্থিত। সামাজিক ব্যবহারে এই ভাবটী উভয়ত সমান ভাবে প্রকাশিত হয় না সত্য, কিন্তু তন্ত্রের অবিস্মরণীয় শিক্ষার গুণে সাধারণ ভারতীয়ের মনে নারীর প্রতি সম্ভ্রম-বোধ পাশ্চাত্য দেশসমূহের লোকের চেয়ে অনেক উন্নততর।"

স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত ধনপতিখোলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করার বাতিক অনেক স্বামীর থাকে। সাধারণতঃ এই সকল স্বামীরা নিজ নিজ জীবনে বহু নারীর প্রতি আসক্ত হইয়া জীবনে অনেক ভুল করিয়াছে এবং তাহার পর হইতে নিজের চরিত্র-দুর্ব্বলতাকে যেন প্রবোধ দিবার জন্যই নিজ স্ত্রীর প্রতি কল্পিত এক অভিযোগ দাঁড় করাইয়াছে। স্বভাবতই স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত লজ্জাশীলা। এই লজ্জা তাহাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরায় রক্ষা করিতেছে। লজ্জাশীলতা কেবল একটা দুর্ব্বলতাই নহে, বরঞ্চ ইহা আত্মরক্ষণে প্রেরণা দিয়া থাকে। কিন্তু সেইরূপ লজ্জাশীলতা খুবই দোষের, যেরূপ লজ্জাশীলতা থাকিলে দুষ্ট পুরুষের আক্রমণকে ঠেকাইয়া রাখিবার ব্যাপারে নারী অপটু হয়। একটী ধমক, একটী চীৎকার, একটী প্রতিবাদ করিবার সাহসের অভাবে অনেক অতি-লজ্জাশীলা নারী শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিতা

হয়। লজ্জাশীলতার এই সুনির্দ্দিষ্ট চংটা বাদ দিলে অন্য প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাহার লজ্জাশীলতা তাহাকে প্রলোভন হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়া চলে। সুতরাং, স্বেচ্ছায় কোনও পত্নী বিপথ-গামিনী হইতেছে, স্বামীদের এইরূপ সন্দেহ করা উচিত নহে। অতিরিক্ত কামুকী স্ত্রী যে জগতে নাই, তাহা নহে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা সকল সমাজেই অত্যল্প। আত্মদমনের ক্ষমতা পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের অনেক বেশী। স্বভাবতই পুরুষদের লজ্জাশীলতা কম বলিয়া লম্পটের সংখ্যা তাহাদের মধ্যেই বেশী। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিবার আগে এই কথাগুলি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও।"

ঈশ্বরে মন দাও

প্রাতে ঠিক ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি উকিল শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার রায়ের গৃহে শুভাগমন করিলেন।

অশ্বিনীদা এবং তাহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুধারাণী রায় গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—শ্রীভগবান্ স্বয়ং আজ আমাদের গৃহে আসিলেন, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন নিজে আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করিলেন। আমরা ধন্য ও, কৃতকৃতার্থ।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমি একটা সাধারণ মানুষ, তোমাদেরই মতন মানুষ। নিজেকে আমি তোমাদের যে-কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি না। তবে, তাত্ত্বিক সত্যের

দিক্ দিয়ে বিচার কত্তে হলে আমিও ব্রহ্মই বটে, আমি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নই। তেমন আবার তোমরাও ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নও। সবই যখন ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু যখন নেই, তখন তোমরাও প্রত্যেকে ব্রহ্ম ছাড়া আর কি হ'তে পার?

রায় দাম্পতী বলিলেন,—একথা আপনার বিনয় বাবামণি। আপনি কদাচ সাধারণ নন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য বস্তু। তাঁকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি কত্তে হলে তাঁতে সম্যক্ আত্মবিসর্জ্জন দিতে হয়। এই আত্মবিসর্জ্জনই মনুষ্যজন্ম লাভের পরম সার্থকতা। ঈশ্বরকে ভালবাসাই মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ও কৃতিত্ব। আমি এসেছি তোমাদিগকে সেই ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট কত্তে। আমার ত' কোনো প্রয়োজন নেই নিজে ঈশ্বর সেজে তোমাদের পূজা নেবার। আমি যে ব্রহ্ম, আমি যে ওঙ্কার, আমি যে চতুর্ব্বেদের মূর্ত্ত বিগ্রহ, এটা আমি স্পষ্ট অনুভব করি। আমি যে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আমি যে বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর, আমিই যে জগতের কোটি কোটি সিদ্ধ তাপস ও ঋষি-মহর্ষিগণের সমষ্টি, এটা আমি জানি। কিন্তু আমি ত' নিজের পূজা প্রবর্ত্তনের জন্য আসিনি। আমি এসেছি, সকল সাধকের, সকল পূজকের একটী মিলন-ভূমি তৈরী কত্তে। তোমরা ঈশ্বরে মন দাও। জীব ভাবে আমি যা, তা হয়ত, দু চার শ বছর পরে সবাই ভুলে যাবে। পার্থিব

প্রতিষ্ঠা ক্ষণভঙ্গুর। ওটার ভরসা ক'রে গুরুদেবদের কৃষ্ণ-বিষ্ণু সাজা অর্থহীন।

দানবীর মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাতে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি রামমালা ছাত্রাবাসে আসিলেন। সেখানকার সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় রামমালা ছাত্রাবাসের নূতন নূতন কি কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা দেখাইতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দাতা মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সত্য সত্যই একজন দানবীর। এক দিক দিয়ে তিনি দানবীর এই জন্য যে, সৎকার্য্যে দান ক'রে তিনি কখনও ক্লান্ত হন নি। আর এক দিক দিয়ে তিনি দানবীর এই হিসাবে যে, তিনি জীবনের অধিকাংশ দানই করেছেন গোপনে। সংগোপনে দান করেন যাঁরা, জানতে হবে যে যশের তাঁদের কোনও লোভ নেই। যশের জন্য কেউ দান করলেও সে দান প্রশংসনীয়। কিন্তু নাম-যশের লোভহীন দান হচ্ছে বীরের দান। আমি লোকমুখে যা শুনেছি, তাতে বুঝেছি, মহেশবাবু সত্যই মহাপ্রাণ।'

দান ও ভিক্ষা

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহেশবাবু আপনাকে কিছু দান করেছেন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—"না, আমি তাঁর বা অন্য কোনও দাতার দান কখনও চাইনি, চাইবও না। দান গ্রহণ করলে অসুবিধা কোথায় তা আমি পুপুন্‌কী আশ্রমের ভূমি গ্রহণ ক'রে বুঝেছি। ঐখানে ঐ দানটা যদি আমি অনুরোধ-উপরোধে প'ড়ে না নিতাম, তাহলে আমার বিগত নয় বৎসরের ইতিহাস অধিকতর উজ্জ্বল কালিতে লেখা হোত। দানের প্রস্তাব এলে ভবিষ্যতে আমি আর কোথাও গ্রহণ করব না, এই সংকল্প নিয়েছি। স্বেচ্ছাদত্ত দান ভিক্ষা নয়। কিন্তু তাতেও অনেক বাধ্য-বাধকতা আসে। ত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে, গৃহস্থদের কাছে দায়ে আবদ্ধ থাকা ক্ষতিকর। গত নয়টা বৎসরে আমি কি পঞ্চাশ হাজার টাকার বই বেচি নাই? আমার বেচা কথাটার মানে হচ্ছে সভাস্থলে বক্তৃতা শুনে স্বেচ্ছায় এসে দাম দিয়ে তা কিনে নেওয়া। বই বিক্রীর জন্য আমি ক্যানভাসিং করি না, সভাস্থলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি আমার রচিত গ্রন্থাবলীর কোনও নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করি না। লোকে যেমন উৎকর্ণ হ'য়ে আমার ভাষণ শোনে, তাতে বক্তৃতাকালে বইগুলির একটু নামোল্লেখ করলে বিক্রী আরও বাড়ত। তবু যে টাকাটা এসেছে, তাতো পুপুন্‌কীর জঙ্গল সাফ করতেই খরচ হ'য়ে গেল। তবু সে জঙ্গল আবাদের যোগ্য হ'ল না। জলাভাবে ফসল উৎপন্ন করতে পারলুম না। একটা মূলা উৎপাদন করতে যদি দশ পয়সা

খরচ পড়ে, আর একটা ফুলকপির ফুল ফুটাতে যদি আড়াই টাকা খরচ পড়ে, তাহ'লে এই মূলা আর এই কপি পয়সা দিয়ে কিনে রান্না ক'রে খাওয়ার সাহস কার আছে? ফলে আরও বড় বড় স্কীম আমাকে করতে হচ্ছে, যে গুলিকে জীবংকাল-মধ্যে সফল হ'তে দেখে যেতে পারব কিনা, সন্দেহ। নিত্য নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে পারে, যার সঙ্গে লড়াই না দিলে হেরে যাব, যার সঙ্গে লড়াই দিতে গেলে লোকের অপ্রিয় হব। প্রতিবেশীদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচা আর কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে বিছানা পেতে শোওয়া এক কথা। হয় এদিকের অর্জ্জুন মেরে ফেলবেন নয় ওদিকে মারবেন কর্ণ। একটা দান গ্রহণ ক'রে পাপ করেছি। কিন্তু সে পাপ না বুঝে করা। সুতরাং আর দান গ্রহণের রাস্তায় যাচ্ছি না। আমি যদি আজ পুপুন্‌কী আশ্রম ছেড়ে চ'লে আসি তবে কিছু লোক সত্যিই যে খুশী হবে, এরকম অনুমান সঙ্গত। কিন্তু অনেক ভাল লোকও সেদেশে আছে, যাদের চিনতে পারিনি ব'লে খুঁজে বের করা যায় নি। তবু তাদেরই প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল আমাকে সেখানে থাকবার চেষ্টা করতেই হবে। লোকের কাছে নিজের অসুবিধার কথা নিবেদন করার আমার ইচ্ছা নেই। কিন্তু হঠাৎ কোনও ফাঁদে প'ড়ে বিপন্ন না হই, এজন্য আমাকে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। পরমেশ্বর যতটুকু সহায়তা করেন, তার বেশী প্রত্যাশা আমি করি না।

এই যে ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছি, কারও কাছ থেকে পায়ের নেই নাই। এই যে ঝড়ের মতন শ্রীহট্ট, রংপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি আদি নানা স্থান পাড়ি দিয়ে এলাম, জনে জনে জিজ্ঞাসা করে দেখ যে, আমি কারও কাছে কখনও রেল ভাড়া বা ষ্টীমার ভাড়া অথবা নৌকা ভাড়া বা বাস ভাড়া চেয়েছি কিনা। আমি যে কারও কাছে কোনও কিছু চাই না, এটা আমার ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ নয়,—এটা আমার বংশগত সংক্রামণ।

পুণ্যশ্লোক হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার পিতামহ পুণ্যশ্লোক হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় আজীবন মানুষকে দান করেছেন। কত জনকে কত প্রকারে দান করেছেন তার ইয়ত্তা নাই। হরিদ্বারে যাই, ঋষিকেশে যাই, উজ্জয়িনী যাই, মাদুরায় যাই, মহীশূরে-যাই আর কামরূপ-কামাখ্যা যাই, সব জায়গাতেই এমন অনেক বৃদ্ধ লোককে দেখতে পাই, যাঁরা দানবীর হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়ের দানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। চাঁদপুর ষ্টীমার-ষ্টেশনে গত ষাট বছরে যত সাধু-সন্ত, পরিব্রাজক মেহার, সীতাকুণ্ড, কামরূপ-কামাখ্যা, সদীয়ার নিকটবর্ত্তী পরশুরাম-কুণ্ড প্রভৃতিতে যাবার জন্য পদার্পণ করেছেন, তাঁদের

অধিকাংশেরই ধুনী আমার পিতামহের পুষ্পবাটিকায় জ্বলেছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে বরিশালগামী ষ্টীমারের যত গৃহস্থ প্রয়োজন-বোধে বা বিপন্ন হ'য়ে চাঁদপুর ষ্টীমার ঘাটে নেমেছেন, তাঁদের শতকরা আশি জনকে পুণ্যশ্লোক হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অতিথি-শালায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। পিতামহ হরিহর, পিতামহী হরগঙ্গা অক্লান্ত সেবায় তাঁদের সন্তুষ্ট করেছেন। আর একটী মূল্যবান কীর্ত্তি এই যে, হরিহর-কুটীরে বহু বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান ক'রে বস্ত্র, পাদুকা, বেতন, আহারীয় প্রভৃতি সাহায্য পেয়ে প্রতি বৎসর পঁয়ত্রিশটি ক'রে ছাত্র লেখাপড়া শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে গিয়েছে। শতাধিক কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি অকুণ্ঠ ভাবে প্রত্যাশাতীত সাহায্য করেছেন এবং গরীব লোকদের শ্রাদ্ধে, বিবাহে, শ্মশানকার্য্যে নির্ব্বিচারে তাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন। এইগুলো স্বচক্ষে দেখেছি। তাই আমার চরিত্রের মধ্যে কারো কাছ থেকে দান গ্রহণের ঝোঁক নেই।

রামমালা ছাত্রাবাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বর পাঠশালা আর রামমালা ছাত্রাবাস, মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মানুষের মনে অমর ক'রে রাখবে। ইনি মানুষ গড়ার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান দুটি গড়েছেন। যারা উপকৃত হচ্ছে, কেবল তারাই উপকার পাচ্ছে

না। উপকারটা পাবে দেশের ভবিষ্যৎ নবজাতকেরা। ব্যক্তিগত উদ্যমে এত বড় প্রতিষ্ঠান এদেশে কমই দেখা যায়।

রামমালা ছাত্রাবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রের স্তূপের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন।

বিপত্নীকের সতর্কতা

নোয়াখালী জেলান্তর্গত আমিরাবাদ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিয়ত ঈশ্বর-স্মরণ সৎ ও সচ্চরিত্র থাকার একটী প্রধান সদুপায়। তবে, পাখী পড়ার মতন করিয়া অর্থহীন জপ করিলে হইবে না। ঈশ্বরের নামের অর্থ বুঝিয়া তাহা স্মরণ করিতে হইবে। তাঁহার অপার করুণা এবং অসীম শক্তির সম্পর্কে সজাগ থাকিয়া নাম স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই দেখিবে যে, তোমাকে বাসনার পাপ, পাপের মালিন্য, মলিনতার রুচি কদাচ আক্রমণ করিতে পারিতেছে না। তুমি বিপত্নীক বলিয়াই তোমাকে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। দাম্পত্য জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলির কথা তোমার এত তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হইয়া যাইবার কথা নহে। নারীর সান্নিধ্যে আসিলে তোমার ভিতরে ভোগের তৃষ্ণা যে-কোনও সময়ে জাগিতেই ত' পারে। সুতরাং তুমি সংশিত-ব্রত ব্রহ্মচারীর মত, ব্রতচারী সন্ন্যাসীর মত, ত্যাগব্রত যতির মত সর্ব্ববয়সের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে দূরত্ব ও ব্যবধান

রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। স্নেহ, আদর, সামাজিকতা প্রভৃতির ওজুহাতে তুমি যাহাতে কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ না হইয়া পড়, এই বিষয়ে তোমাকে বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে। একটী বিধবা মেয়েকে আমরা তাহার ইন্দ্রিয়-সংযমের সামর্থ্যের জন্য মনে মনে কত শ্রদ্ধা করি। নিজের গুণাবলির দ্বারা তোমাকে সেইরূপ সংযম-সমর্থ এবং শ্রদ্ধেয় থাকিতে হইবে। অন্যান্য দেশে বিধবাকে দেখিলে পাণিপ্রার্থীরা অনুসন্ধান করে, তার যৌবন অটুট কিনা এবং তাহার ধন সম্পদ আছে কিনা। ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারার মধ্যে এই উপসর্গটী একেবারেই নাই। বিধবা দেখিলে তাহাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়া মনে মনে করুণা যেমন অনেকে করে, তেমন আবার তাহার সদাচার-পরায়ণতা, নিয়ম-নিষ্ঠা ও কঠোরতা-সহনের যোগ্যতার কথা চিন্তা করিয়া তাহাকে মনে মনে পূজাও করে। বিধবারা নিজ নিজ আচার-আচরণের দ্বারা অনেক পুরুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জ্জন করিয়া থাকেন। অন্যান্য দেশের কথা ঠিক তাহা নহে, বরং তাহার বিপরীত। বিধবাকে বিবাহ করা গ্লানিকর বলিয়া তাহারা মনে করে না, যেমন করে না, স্বামীর সহিত ছিন্ন-সম্পর্ক সধবা নারীকে বিবাহ করিতে। বিধবার যেমন একটা আলাদা সম্মান আমরা অন্তরে পোষণ করি, বিপত্নীক সম্পর্কেও তদ্রূপ হওয়া উচিত। কিন্তু তোমরা বিপত্নীকেরা আদর্শ জীবন-যাপন করিবে, তবে ত' তাহা সম্ভব হইবে। বিধবা-বিবাহ আজকাল প্রচলিত হইতে

চলিয়াছে। সুতরাং বিধবাদের ভাবী বররূপে বিপত্নীকদের বিবাহ-বাসরে অবতীর্ণ হইবারও একটী ডাক আসিতেছে। তাহাতে সাড়া দিয়া যদি বিপত্নীকেরাও এমন জীবন-যাপন শুরু করিয়া দেয়, যাহা সমাজের লোকেরা ঘৃণার চোখে দেখে, তবে তাহার চেয়ে বড় বিড়ম্বনা জগতে আর কি হইতে পারে? তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুর্ব্বলতা তোমাকে নিরন্তর হাতছানি দিয়া ডাকিবে, আর তুমি তাহার মনোবিমোহন বেশ দেখিয়াও মুগ্ধ হইবে না, ইহা এক আশ্চর্য্য কথা। তাই বলিতেছি, কুকথা উঠিবার আগেই নিজে সাবধান হইয়া যাও। কোনও নারীকে দয়া করিতে হয়, সাহায্য করিতে হয়, ত' অন্য ভাবে কর। সুকৌশলে তাহাকে পতনের পথে টানিয়া নিবে আর মনে মনে ভাবিবে, বিপন্ন-উদ্ধার করিলাম, ইহা নিদারুণ এক আত্ম-প্রতারণা। নিয়ত ঈশ্বর-স্মরণ করিতে করিতে নামের মহাবলে তুমি তোমার অন্তরের প্রচ্ছন্ন কামকে পরাভূত কর। পরমেশ্বরের নামের এইটীই একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি যে, কামকে ক্রোধকে, লোভকে সে অচিরকাল মধ্যে পরাভূত করিয়া দেয়। মানুষ যদি ঈশ্বরের নাম নিরন্তর স্মরণের কৌশলটী ভগবানের দয়ায় না পাইত, তাহা হইলে কয়েক লক্ষ বৎসর পরে আজও সে বনমানুষের মতই অর্থহীন ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ধর্ম্মকে যাহারা সভ্যতার আবর্জ্জনা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা জানেন না যে, ভগবানের নাম কত শক্তি ধরে।"

আশ্রম-বাসের হিড়িক

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত হাটচান্দিনা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছে এবং আশ্রম তাহার ভাল লাগিতেছে শুনিয়াই নিজেও আশ্রমবাসী হইবার জন্য লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিও না। একই পরিবার হইতে যদি দুই তিনটী করিয়া উপার্জ্জনক্ষম পুত্র আশ্রমবাসী হইবার জন্য ছুটিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাদের পিতামাতার বার্দ্ধক্য-কালের নিঃসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়াও বিষন্ন হওয়া উচিত। এক সময়ে, বৌদ্ধ যুগে, ভারতে সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রমণ-জীবন গ্রহণের জন্য বেজায় ভিড় জন্মিয়াছিল। আমাদের কাছে এমন কোনও তথ্য নাই, যাহা দ্বারা বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিব যে, ইহার ফলে ঐ সকল পূজ্যপাদ ভিক্ষুগণের পিতামাতার সত্য সত্যই কতখানি অন্নকষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আজিকার দিনে উপার্জ্জনক্ষম বয়স্ক পুত্র সংসার ছাড়িয়া চলিয়া আসিলে পিতামাতার কতখানি আর্থিক দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের কোনও প্রয়োজন নাই। দুই একটা গ্রামে গিয়া এইরূপ পিতামাতাদের অবস্থা দর্শন করিলেই চাক্ষুষ প্রমাণ মিলিয়া যাইবে। সুতরাং তোমার পক্ষে তোমার দাদার পদাঙ্ক

অনুসরণ করিয়া আশ্রমবাসের জন্য কোমর কাছা ভুল হইবে। দেশে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, সুতরাং ত্যাগী, সংসার-বিমুখ লোকের সংখ্যা বাড়িলে, অন্য একটা দিক দিয়াও সমাজের অর্থনৈতিক হিত বাড়িতে পারে। কিন্তু সাধু-সন্তের সংখ্যা বাড়িলে ইহদের অন্ন কে যোগাইবে? ভিক্ষা বা দানের উপরেই ত' সকলকে নির্ভর করিতে হইবে! আমি আমার আশ্রম হইতে দান-সংগ্রহের চেষ্টাকে দূরে রাখিয়াছি কিন্তু ধনোৎপাদনের কৌশলগুলি নানা আইনের বেড়াজালে পরিবেষ্টিত। সুতরাং অযাচকত্ব রাখিবার প্রয়াসে মসী-অঙ্কিত মন্ত্রবাণী, পুস্তক-পুস্তিকা বিক্রয় করিয়া কয় জনের অন্ন-সংস্থান আশ্রমে সম্ভব হইবে? আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক অবস্থার সহিত অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেরও আর্থিক অবস্থার উঠ্‌তি-পড়্‌তি নিয়ত চলিবে। বস্তুতন্ত্রবাদ পৃথিবীতে যত প্রসারিত হইবে, ততই নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইবে। এতগুলি জটিল বিষয়ের সহিত ছোট ছোট আশ্রমগুলিরও সম্পর্ক আসিয়া যাইতেছে। সারা পৃথিবী-ব্যাপী অর্থশোষ, লোভ ও পরস্বাপহরণ-নীতির দাপটে সর্ব্বস্থানের শান্তিভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। সংসার ছাড়িয়া আশ্রমের বৃক্ষচ্ছায়ায় মাথা লুকাইলেও সেই অশান্তির হাত হইতে মুক্তি কোথায়? সুতরাং যতদিন পার, বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবার মধ্য দিয়া সংসারেই বাস কর। দশজনের সম্মিলিত সহযোগিতায় গ্রামটীকে একটা আশ্রমীয় পরিবেশ দিবার চেষ্টা কর।"

কুমারীর সতর্কতা

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত হানারচর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কুমারী মেয়েদিগকে আমি অবাধে যুবকদের সঙ্গে মিশিতে দিবার পক্ষপাতী নহি। কেন নহি, তাহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তাহাদের জীবন অগঠিত, বয়স উঠতির মুখে, সংসারের অভিজ্ঞতা অত্যল্প, এই জন্য তাহারা অতি সহজে বা সামান্য অপকৌশলের ফলে দুষ্ট পুরুষের কবলে পড়িয়া লাঞ্ছিতা হইতে পারে, এই আশঙ্কাটা অমূলক নহে। তাহাদিগকে সতর্ক না করিয়া পথ চলিতে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া বিপজ্জনক। কিন্তু এক একটা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলন পাইকারী ভাবে যুবক-যুবতীদের মধ্যে মিলন-মিশ্রণের সুযোগ করিয়া দিতেছে এবং যতই দিন যাইবে, ততই অধিক পরিমাণে দিবে। এমতাবস্থায় নিদারুণ কড়াকড়ি কিছু করার কথা ভাবা কঠিন। কিন্তু ইহাদের প্রতিজনের আত্ম-সম্মান-বোধ জাগ্রত করিয়া দিবার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। আমরা এই দায়িত্ব যদি পালন না করিতে পারি, তবে আমরা ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের নিকটে দায়ী হইব, তাহাদের দ্বারা নিন্দিত হইব। কারণ, যে দেশের কুমারীরা কলুষিত, সেই দেশের উত্তর পুরুষেরা অনেক অবাঞ্ছনীয় অবগুণ লইয়া অবতীর্ণ হয় এবং ধরাকে কলঙ্কিত

করে। কুমারীদের চলাফেরা সম্পর্কে পিতামাতার অবহেলা যেমন মারাত্মক ক্ষতির কারণ হইতে পারে, তেমন আবার অতিরিক্ত শাসনও অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় পরিণতিকে ত্বরান্বিত করিতে পারে। সুতরাং, যাহা করিবার, হিসাব করিয়া করিতে হইবে। অবশ্য, হাজার হিসাবী লোকেরও অনেক সময়ে হিসাবে ভুল হয়, একথা মানিতে হইবে। অনেক সময়ে অসামান্য গুণবতী মেয়েরাও হঠাৎ কল্পনাতীত ভুল করিয়া বসে, ইহা সত্য কিন্তু গ্রাম বা সমাজের পরিবেশ যদি থাকে পরিচ্ছন্ন, তাহা হইলে এরূপ ঘটনা অতি অল্পই ঘটে। কেহ ভুল করিলে ক্ষমা পাইবে না, এইরূপ জেদ অনুচিত। কিন্তু ক্ষমা পাইতে হইলে যে ভ্রমের সংশোধন করিতে হয়, ইহাও অপরাধীর মনে থাকা চাই। কেবল মেয়েদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলেই দায় সারিয়া যায় না, ছেলেদের প্রতিও কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে, যুবকদের চরিত্র-গঠনের আন্দোলনও আমাদের ঐ এক সঙ্গেই চালাইয়া যাইতে হইবে। চরিত্র আন্দোলনের কর্ম্মী যাহারা হইবে, তাহাদেরই কাহারো মধ্যে যদি চরিত্রহীনতা আসে, তবে তাহাকে আন্দোলনের মঞ্চ হইতে বলপূর্ব্বক সরাইয়া দিতে হইবে এবং অন্য লোকের দ্বারা আন্দোলন চালু রাখিতে হইবে। যতকাল মনুষ্য-সমাজের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি না ঘটে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত চরিত্র-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইবে না।"

ভগবদ্‌-বিশ্বাস ক্ষীয়মাণ হইলে

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত নান্দাইল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুরন্ত বিপদের সময়ে মানুষ্যের অন্তরে ভগবদ্‌-বিশ্বাস ক্ষীয়মাণ হইয়া যায়। তখনও হতাশ হইতে নাই। জোর করিয়া বলিতে হয়,—হে ভগবান্ আমি তোমার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিলাম। তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই কর। আমাকে দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনা দিলে তুমি যদি খুশী হও, তাহা হইলে উহাই আমি মাথা পাতিয়া নিব। কিসে আমার ভাল আর কিসে আমার মন্দ, তাহা আমি জানি না কিন্তু তুমি জান। আমি জানি না বলিয়াই নিজে কোনও বিশেষ অবস্থা বা বস্তু প্রার্থনা করিতে পারি না। তুমি জান বলিয়াই আমার যাহা পাইলে ভাল, তুমি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী তাহাই নিশ্চিত দিবে। যাহাতে সবার ভালো, দয়া করিয়া তুমি তাহাই কর প্রভু, তাহাই কর। —এই বলিয়া নিরন্তর আত্মনিবেদন করিতে থাক।"

মানুষের প্রতি

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত চান্দ্রা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা প্রত্যেকটী মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিও,

প্রত্যেকটী মানুষ সম্পর্কে সম্ভ্রম পোষণ করিও। যে মানুষের ভিতরে যে-টুকু ভাল, তাহার অনুকরণ কর, যে মানুষের ভিতরে যেটুকু মন্দ বলিয়া বোঝ, তাহাকে নিজ আলোচনা হইতে ও চরিত্র হইতে দূর করিয়া দাও। নিজে সম্মানিত হইবার জন্য লালায়িত হইও না কিন্তু এমন সৎকার্য্য-সমূহের অনুষ্ঠান কর, যাহার দ্বারা তোমার পল্লীর তোমার সমাজের, তোমার বান্ধববর্গের প্রতিজনের সম্মান বাড়ে। ঈশ্বরে নির্ভর কদাচ হারাইও না।"

ছোট ছোট কাজ

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত মতলবগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ছোট ছোট কাজের ভার পাইয়া যাহারা মনঃক্ষুন্ন হয় না, পরন্তু প্রাণপণ যত্নে তাহা সুচারু-রূপে সম্পাদন করে, শ্রীভগবান্ আস্তে আস্তে তাহাদের হাতে বড় বড় কাজ তুলিয়া ধরেন। যখনই কাজ কর, যে কাজই কর আর যতটুকুই কর, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা বিধান করিতে যত্ন পাইবে। ছোট কাজ দিয়াই ত' ধরা পড়িবে যে, তুমি বড় কাজ কি ভাবে করিবে। কাজ যে করিতে চাহে, তাহার কাজের অভাব হয় না। কিন্তু বড় বড় কাজ হাতাইয়া নিয়া পরে যাহারা কাজে শৈথিল্য করে, তাহারা পরমপাপিষ্ঠ। তাহারা কাজের সর্ব্বনাশ করে। ছোট

কাজে যে যশ চাহে নাই, বড় কাজেও যশের প্রতি নির্লিপ্ত থারা তাহারা পক্ষে সহজ এবং যশ তাহার আপনা আপনিই হয়। যশের জন্য কাঙ্গাল হইও না, যশ নিজে আসিয়া কাঙ্গালের মত তোমার পাদবন্দনা করিবে।"

প্রগতির সুগতি

একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারী ও পুরুষের মধ্যে সর্ব্বব্যাপারে সমতা সাধনের জন্য যে চেষ্টা এই শতাব্দীর আগের শতাব্দী হ'তেই আরম্ভ হয়েছে, তাকে প্রতিবাদ বা নিন্দা ক'রে থামান যাবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমতা ত' প্রায় প্রতিষ্ঠিতই হ'য়ে গেছে। মেয়েদের মধ্যে অনেক পণ্ডিতার আবির্ভাব হচ্ছে, যাঁরা পুরুষ বিদ্বান্‌দের চেয়ে কোনো অংশে হেয় নন। জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্রেও কিছুকাল পরে ঠিক্ তাই হবে। অর্থাৎ অফিসের বেয়ারার কাজ আর হাসপাতালের আয়ার কাজ থেকে কেরাণীর কাজ, বড় বাবুর কাজ, ম্যানেজারের কাজ, শিক্ষকের কাজ, অধ্যাপকের কাজ, তারপরে বাস, ট্যাক্‌সি, ট্রাম চালকের কাজ থেকে শুরু ক'রে পুলিশের কাজে, নাবিকের কাজে, ডাক্তারের কাজে, ইঞ্জিনীয়ারের কাজে, সৈনিকরে কাজে, এমনকি সেনাধ্যক্ষের কাজেও অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যেই এদেশেও নারীরা পুরুষকে টেক্কা দেবে। তাতে ভীত বা শঙ্কিত হবার

কারণ নেই। বস্তুবাদী সভ্যতার এগুলি অপরিহার্য্য পরিণতি। এই প্রগতি অসম্ভবও নয়, অপ্রয়োজনীয়ও নয়। কিন্তু প্রগতির সুগতি হবে তখন, যখন পুরুষ ও নারী তাদের জৈব সমতার পরাকাষ্ঠা নিয়েই গৌরব শেষ কর্ব্বে না, যখন অন্তরের ব্রহ্মানুভূতির দিক দিয়ে পরস্পর সমকক্ষ হবে। সে বিদ্যা বিদ্যাই নয়, যে বিদ্যা পরাবিদ্যার পরাকাষ্ঠায় পরিণত না হচ্ছে।

প্রগতির দুর্গতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রগতির দুর্গতি হচ্ছে সেখানে, যেখানে বিদ্যাই বল, অর্থই বল, প্রতিভাই বল আর যশই বল, স্ত্রী বা পুরুষকে অথবা উভয়কে ইন্দ্রিয়-বিকারের পঙ্কাবর্ত্তে নিক্ষেপ ক'রে দিয়ে নরককে স্বর্গ রূপে মায়ার খেলা খেল্‌তে থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখের লোভে নারী যতদিন পরপুরুষ-সঙ্গকে বা বহুপুরুষপ্রীণনকে বাহাদুরী ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বাধ্য হ'য়ে যতদিন পুরুষ পর-নারীতে বা বহু নারীতে আসক্ত হবে, নিতান্ত জান্তব সুখকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ ব'লে মনে করবে বা প্রচার কর্ব্বে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রগতি তোমাদের মতই হোক্, তোমাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিকতা, কবিত্ব-প্রতিভা এবং নিত্যনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি শুধু প্রগতির

বিকার মাত্র থাক্‌বে। সুতরাং যে যেই দিকেই যত উন্নতি অর্জ্জন কত্তে পার, কর, তাতে বাধা নেই, চরিত্র-ধনটী হারিও না। বাহ্য ব্যবহারে তুমি বেপরোয়া হ'য়ো না। কারণ, তোমার হয়ত অন্তরে কোনো মালিন্য নেই কিন্তু তোমার কুদৃষ্টান্ত অন্যের ভিতরে বিকার সৃষ্টি কত্তে পারে। জোর ক'রে প্রলোভনের মধ্যে গিয়ে প'ড়ো না যেন।

কুমিল্লার চতুর্থ বক্তৃতা

অদ্য কুমিল্লার চতুর্থ বক্তৃতা হইতেছে। বক্তৃতাটি শেষ হইবার পরেই শ্রীশ্রীবাবামণি আহারাদি সারিয়া ট্রেণ ধরিবেন। কারণ চট্টগ্রাম মেলে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত ফেণী রওনা হইতে হইবে। তথাপি বক্তৃতাটি সুদীর্ঘ হইল। প্রথম তিন দিনের সভা অপেক্ষা অদ্যকার সভায় জনতা অনেক বেশী হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, জনতা দশ হাজার ছিল। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অদ্যকার সভার স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রত্যেকটী অধ্যাপক আসিয়াছিলেন, আসিয়াছিলেন দুই জন সাবজজ, তিনজন মুন্সেফ এবং স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। অদ্যকার সমাগত অনেক লোকই পূর্ব্ববর্ত্তী তিন দিনের বক্তৃতা শোনেন নাই। অতএব শ্রীশ্রীবাবামণি তিন দিনের কথিত বিষয়ের মোটামুটি একটা সারাংশ প্রদান করিয়া তৎপরে নূতন বক্তব্যে প্রবেশ করিলেন।

পূর্ণতা ও শূন্যতা ঃ যোগ ও ভোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা দার্শনিকদের উচ্চ-চিন্তাকে অনেক পিছনে ফেলে রেখে ঊর্দ্ধ-গগনে বিচরণ করছে। এর স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়াবে যে, পূর্ণ এবং শূন্য এই দুই এর ব্যবধান-রেখা দূর হ'য়ে যাবে। পূর্ণতা ও শূন্যতা যে একই বস্তুর দুই দিক্‌, একথা বুঝতে কারও বাকী থাক্‌বে না। যোগস্থ ভোগী আর ভোগস্থ যোগী একার্থক হ'য়ে যাবে। এইটী একটী অসাধ্য-সাধন। X (এক্‌স্‌) এই অজ্ঞাত সংখ্যাটি নিয়ে অঙ্ক কষতে কষতে বিজ্ঞানী গাণিতিকরা যেইখানে গিয়ে পৌছুবেন, ব্রহ্ম বা ওঁ এই একটী অজ্ঞাত ধ্বনিকে নিয়ে কসরৎ করতে করতে ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্‌ একদা সেখানে পৌছে ছিলেন, আজও পৌছে আছেন। যে আজ অজ্ঞাত, সে কাল পরিজ্ঞাত হচ্ছে। এটা প্রগতির বিধান। কিন্তু অনন্ত জ্ঞান এমনই এক মহাশূন্য যে, যে যতটুকুই জান না কেন, আরও অজানা বাকী থাক্‌বে। একটা অণুর ভিতর কি শক্তি আছে, তা মহর্ষি কণাদ একদিন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের দ্বারা জেনেছিলেন। সেই একটী অণুকে নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করবেন। নিশ্চিতই প্রমাণিত করবেন যে, অণু কেবল অণুই নয়, অণু মহাশক্তির উৎস। এই অণু একটি অস্ফুট ওঁকার ধ্বনি ক'রে জগৎ সৃষ্টি করেছে, এই অণুই ঘোর গর্জ্জন ক'রে জগৎকে

প্রলয়-পথিক ক'রে ছাড়বে। প্রলয় মানে বিনাশ নয়, প্রলয় মানে কল্পনাতীত এক রূপান্তর, যেই রূপান্তরে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আস্তে আস্তে নূতন ক'রে জীব-সৃষ্টির পত্তন হয়, নূতন সভ্যতার উন্মেষ হয়। দার্শনিকের মনন, বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান মিলেজুলে এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, যার নাম বৈকুণ্ঠ বা দেবভূমি। ভোগ আজ কাণে বড়শী বিঁধে মানুষকে আকর্ষণ করছে। যোগ সেদিন ভোগকে রূপান্তরিত করে দেবে। পারদ সেদিন সোণা হ'য়ে যাবে। ভোগযোগ্য দেহ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভোগের প্রয়োজন থাকেই থাকে, সেই ভোগ সূক্ষ্মই হোক্, স্থূলই হোক। ভোগকে যোগমুখী করবার উপক্রমণিকাই হচ্ছে, ঈশ্বর-সাধন। ধনং দেহি নহে, জনং দেহি নহে, যৌবনং দেহি নহে, রূপং দেহি নহে, দ্বিষো জহি নহে, পরমেশ্বরই সব, তাঁতেই সব আছে, তাঁতেই সব যাবে, তাঁর মধ্যে আত্মনিমজ্জনই একমাত্র সার্থকতা,—এই বোধের পুনরাবৃত্তির বারংবার চেষ্টা করার নাম ঈশ্বর-সাধন।

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিলেন।

ফেণী (নোয়াখালী)
৪ঠা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৪৩
(১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৬)

অলৌকিকত্ব

ফেণীতে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র মালাকারের

গৃহে আসিয়াছেন। গিরিশ বাবু বলিলেন,—স্বামীজী, লোকমুখে শুনতে পাই, আপনার নাকি অনেক অলৌকিক শক্তি আছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আদৌ না। আমার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নাই। কিছু ক্ষমতা আমার নিশ্চয়ই আছে, যেমন প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু থাকে। সেটা একেবারেই লৌকিক শক্তি। কাল একটা অলৌকিক ঘটনার কথা রহিমপুরের একজন আমাকে এসে ব'লে গেল। আমি তা বিশ্বাস করি না। কারণ, ওটা স্বপ্নদর্শন ব্যতীত আর কিছু হ'তে পারে ব'লে আমি মনে কত্তে পাচ্ছি না। ৬ই বৈশাখ আমি রহিমপুরে থাক্‌ব, এটা সকলের জানা কথা। চারিদিকের দশ বিশখানা গ্রামের লোক আমাকে প্রাণসম প্রিয় মনে করে। সুতরাং আমাকে হয়ত রাত্র দুটার সময়ে স্বপ্নে দেখাটা কোনও আশ্চর্য্য বা অভাবনীয় ব্যাপার নয়। স্বপ্নে যা দেখেছে, সেটা যার যার মনের গঠন অনুযায়ী ব্যাপার। এর মধ্যে আমি আমার কোনও অলৌকিকত্ব দেখতে পাচ্ছি না। কাল এই নিদারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে তিনঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ ভাষণ দানের পরে আমি কিরূপ ক্লান্ত অবস্থায় ট্রেণে উঠেছিলাম, তা অনুমান কত্তে পাচ্ছ। সারা রাস্তায় ট্রেণের লোকের ভিড় একটু ভাল ক'রে বসবার জায়গাও পাই নাই। এই অবস্থায় আমার যদি অলৌকিক কোনও ক্ষমতা থাক্‌ত, তবে নিশ্চয়ই আমি হিমশীতল বায়ু প্রবাহ বহিয়ে দিয়ে নিজের ক্লেশ এবং

সঙ্গে সঙ্গে অনেকের ক্লেশ কমাতে পারতাম। আমি অলৌকিক ক্ষমতার সত্য সত্যই অধিকারী হ'লে খুব এক পশলা বৃষ্টি ও ত' এনে দিতে পারতাম। তাতে, কত লোকের ক্ষেত্রে হলকর্ষণের সুবিধা হ'তে পারত। হজরৎ মহম্মদ যখন মক্কা থেকে মদিনার দিকে পলায়ন কচ্ছেন, তখন নাকি তাঁকে প্রখর সূর্য্যকিরণ থেকে রক্ষা করার জন্য এক খণ্ড কালো মেঘ তাঁর মাথার উপর দিয়ে ভ্রমণ করেছিল। এটা একটা অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু আমি মহম্মদের জীবনীকারদের লেখার কোথায় যেন পড়েছি যে, অলৌকিকত্বের আরোপকে হজরৎ মহম্মদ অত্যন্ত অপছন্দ কত্তেন। বাস্তববাদী লোকের দৃষ্টিভঙ্গী এই রকমই হয়। ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁর ভিক্ষুসঙ্ঘের ভিক্ষুদের কাউকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব'লে আত্মপ্রচার করতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন। অলৌকিক গল্প ব'লে ব'লে মানুষকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ এক প্রকারের চতুরতা যা লোকেরা না বুঝে অবলম্বন ক'রে অথচ যার ফলে মানব-সমাজের দৃঢ়তা বা ঋজুতা কণামাত্রও বাড়ে না। ঈশ্বরকে জানা, পাওয়া এবং তাঁরই মধ্যে নিজেকে সম্যক্ সমর্পণ ক'রে দেওয়ার মধ্যেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ও কৃতিত্ব। ঈশ্বর-লাভের পথে পাদচারণা আরম্ভ করার পরে কারো কারো জীবনে অলৌকিক ব্যাপার সব সংঘটিত হ'তে দেখা যায়। যেমন বলা হয়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মূহুর্ত্তে মুহূর্ত্তে নানা বিভূতি দেখা যেত। সাধারণ বা অসাধারণ সব

সাধকের মাঝেই কম বেশী অলৌকিক ঘটনা ঘটতে শোনা যায়। অলৌকিক বিভূতি সাধকের কেবল সম্পদই নয়, বিপদও বটে।

দীক্ষার প্রসঙ্গে

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— আমি যদি কাউকে দীক্ষা দান করি, তবে এই ধারণা নিয়েই তাকে দীক্ষা দেই যে, সে পূর্ব্বে কোথাও কোনও দীক্ষা নেয় নাই বা পায় নাই। তুমি যদি কোনো মেয়েকে বিয়ে কত্তে যাও, তবে নিশ্চয়ই এই ধারণা নিয়েই বিবাহের বাসরে উপস্থিত হবে যে, মেয়েটী কুমারী, সধবা নিশ্চয়ই নয়। বিধবা বিবাহে যাদের আপত্তি নেই, তারাও কিন্তু কখনো সধবা বিবাহে আগ্রহী হয় না। একজনের মনের ভিতরে ঈশ্বর-সাধন সম্পর্কে দীক্ষালব্ধ একটা ছাপ আঁকা থাক্‌লে তাকে অন্য আর একজনের এসে দীক্ষা দেবার চেষ্টা করা সঙ্গত নয়। বহু লোককে দীক্ষা দিতে পারলে লোকগুরু রূপে একটা অসাধারণ সম্মান লাভ হ'তে পারে বা শিষ্যদের সেবাগ্রহের দৌলতে প্রচুর ধন-সম্পদ আসতে পারে, এই দিকে লক্ষ্য দিয়ে যারা কাজ ক'রে, তাদের কর্ম্মধারা হচ্ছে অনেকটা ব্যাধের মত। ব্যাধ বা নিষাদের কাজই হচ্ছে পাখী মারা। যে-কোনো প্রকারে মারতে পারলেই তার হ'ল। এই অতিব্যস্ততা আমাদের শোভে না। দীক্ষা যদি দেই, তবে

দীক্ষার্থীর কল্যাণ-কামনাতেই দেই। সে যদি একটী পথের প্রতি আকৃষ্ট থেকে থাকে, তবে তাকে জোর ক'রে বা কৌশল ক'রে নিজের পথে টেনে এনে তার ভাবভঙ্গ করা ভুল। রাম কতখানি ঈশ্বর, কৃষ্ণ কতখানি ভগবান্, রাম, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর মধ্যে ওজনে কে বেশী ভারী, অথবা আয়তনে কে বেশী বড়, এই সব যুক্তিতর্ক নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখা ভুল। জগতের সব সম্প্রদায় মিলে গিয়ে কখনো একটী মাত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হবে না, হ'তে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষার প্রকৃতি ও তারতম্য, বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য আদির বিভিন্নতার দরুণ বিভিন্ন মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে বা বিভিন্ন সমাজ সমষ্টি-গত ভাবে অন্য ব্যক্তি বা অন্য সমাজ থেকে সাধন-ধর্ম্মে চিরকালই হয়ত একটু আলাদা থাক্‌বে। কিন্তু লক্ষ্য তাদের এক পরমেশ্বর। এই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে অপরের বুদ্ধিভেদ-সৃজনের অপরাধ থেকে দূরে থাক্‌তে হবে। তুলসীদাস রাম রাম করেছিলেন, দাক্ষিণাত্যের যিনি একাধারে তানসেন এবং তুলসী দাস সেই ত্যাগরাজও রাম রাম ক'রে জীবন কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপীরা কৃষ্ণ কৃষ্ণই কর্লেন, রাম রাম কর্লেন না। এতে গোপিকাদের দোষ হয় নি। তুমি যদি দীক্ষাদাতা গুরু হও, তবে তোমাকে খেয়াল রাখতেই হবে যে, তুমি নিজে কোনো সম্প্রদায়ের নও, তুমি সর্ব্বসম্প্রদায়ের আপন, কোনো সম্প্রদায় তোমার পর নয়। কোনো সম্প্রদায় যদি তোমার পর না হয়, তাহ'লে কোনো

সম্প্রদায়ের সাধন-ধর্ম্মকে লুপ্ত ক'রে দেবার জন্য তুমি কেনো কাজ কত্তে পার না। যে যেখানে দীক্ষা নিয়েছে, তাকে সেই মতেই থাকতে দাও, তবে তাকে বিশ্বাসে অটল থেকে প্রাণে শান্তি এবং মনে আনন্দ নিয়ে সাধন কত্তে হবে। তার জন্য তুমি প্রেরণা দাও। অন্যের শিষ্যকে মন্ত্র বদল ক'রে নিয়ে নিজের শিষ্য করার তোমার কোন্ প্রয়োজন? পৃথিবীর কোটি কোটি লোক যদি তোমার কাছে দীক্ষা নিতে রাজিও হয়, তুমি পারবে কি হাজার বছর পরমায়ু পেলেও সে কাজ সমাধা কত্তে?

ফেণীতে চিত্র-প্রদর্শনী দেখাইবার প্রস্তাব

স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ প্রেসের মালিক শ্রীযুক্ত হরিপদ গুহ এবং রাজবাড়ীর শ্রীযুক্ত হরিমোহন দে প্রস্তাব করিলেন যে, পুপুন্‌কী আশ্রমে যে চিত্র-প্রদর্শনীটীর ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা ফেণীতেও দেখাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৌখিক উপদেশের চাইতে চিত্রযোগে উপদেশ লোকের মনে গভীরতর রেখাপাত করে। এই জন্যই পুপুন্‌কীতে এই লক্ষ্যে কাজ চল্‌ছে। ইচ্ছা আছে, প্রদর্শনীটী ফেণী, কৃষ্ণরামপুর এবং চাঁদপুরে দেখান। সময়

মত সব সংবাদ জানানো হবে। স্থানীয় জনসাধারণকে কোনো ব্যয়ই বহন কত্তে হবে না, তবে চিত্রগুলির সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও প্রদর্শনীর জনতা-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজের পূর্ণ দায়িত্ব স্থানীয় লোকদের নিতে হবে।

রহিমপুর আশ্রম
৫ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪৩
(১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬)

প্রত্যুষের ট্রেণে ফেণী ছাড়িয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বেলা এগারটায় কুমিল্লা পৌছিয়াছেন। রহিমপুর আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন বেলা দুইটায়। চারিজন লোকের জন্য মোটর-কার রিজার্ভ করা ছিল, সুতরাং কোম্পানীগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিতে বিশেষ ক্লেশ হইল না।

দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়

সন্ধ্যায় প্রবল কীর্ত্তন হইল। তৎপর একে একে সকলে বিদায় নিলেন। আগামীকল্য উৎসব বলিয়া কিছু লোক আশ্রমে রহিয়া গেলেন। তন্মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবামণি, অলৌকিক ব্যাপারটার অর্থ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যাপারটা আদৌ অলৌকিক নয়। তোমরা অনেকেই প্রবল ভাবে আমার কথা চিন্তা ক'রে থাক। অতএব সবাই স্বপ্নে দেখেছ। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর, অনেক দিন ধরেই আমি তোমাদের ব'লে আসছি

স্থানাভাবে জর্জ্জরিত হ'য়ে এক ইঞ্চি জমির জন্য প্রিভি কাউন্সিলে মামলা চালাবার চেয়ে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চলে সবাই ছড়িয়ে পড় এবং নিজেদের স্বচ্ছল অন্ন-সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ত্রিপুরার অরণ্যবাসী মানুষদিগকে উৎকৃষ্টতর সভ্যতার জগতে টেনে আন। আজ কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না, কিন্তু এমন একদিন আসবে। যেদিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্ব্বে যে আমি ভালো উপদেশই দিয়েছিলাম।

দেশ ত্যাগের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজের জন্মভূমিতে চিরকাল বাস করা একটী বড় আনন্দজনক ব্যাপার। কিন্তু নানা কারণে মানুষকে জন্মভূমিও ত্যাগ ক'রে বাইরে যেতে হয়। আর্থিক কারণই তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, কখনো কখনো রাজনৈতিক কারণও ঘটে। নৈসর্গিক কারণও ঘটে। হঠাৎ বন্যায়, ভূকম্পে, মহামারীতে, লোকক্ষয়কর যুদ্ধে, গৃহবিবাদে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে পারে, যার ফলে চিরদিনের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে মানুষকে অনেক দূরদেশে চলে যেতে হয়। সামাজিক উৎপীড়ন, সাম্প্রদায়িক অত্যাচার, মাৎস্য-নীতির প্রবর্ত্তন, অনেক লোককে ভিটে-মাটি ছাড়া ক'রে দূরদেশে নূতন বসতি স্থাপন কত্তে বাধ্য করেছে। কখন কোন্ জাতির বা কোন সম্প্রদায়ের ভাগ্যে কি ঘটে, তা কে জানে?

সুতরাং নূতন জায়গায় গিয়ে স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যে বসবাস করার রুচি খুব ভাল জিনিষ।

মানব-জাতির কাছে ঋণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যে তোমাদিগকে ত্রিপুরার পাহাড়ে যেতে বলি, তার উদ্দেশ্য দুইটী। একটী এই যে, ওখানে সর্ব্বপ্রকারের কৃষিভূমি এবং ফলবৃক্ষের লাভজনক উদ্যান সৃষ্টি করা সহজে সম্ভব। দ্বিতীয় বা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মৃতিকে ধ'রে রেখে যে বিরাট মানবসমাজ এখনো বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে উন্নতির ও সাধনার বীজ বপন করা, তাদের প্রতিজনকে মনুষ্যকুলের এক একটী অলঙ্কারে পরিণত কর্ব্বার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। একদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও অজ্ঞ, মূর্খ, নিরক্ষর, অজ্ঞান, অবোধ ও অসহায় ছিলেন। অন্যেরা এসে তাঁদেরকে মানুষ নামের যোগ্য করেছেন। এটা সমগ্র মানব-জাতির কাছে আমাদের ঋণ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আরও একটা কথা মাঝে মাঝে আমার মনে উকিঝুঁকি মারে। ম্যালথাসের লেখা বই না পড়লে এই কথাটা হয়ত আমার মনে এত দ্রুত আস্‌ত না। ম্যালথাস্ বলছেন, মানুষ যে হারে নূতন নূতন শিশুদের জন্মদান কচ্ছে, সেই হারে কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলির পরিমাণ বাড়্‌ছে না। আগামী একশত বৎসরের

মধ্যে পৃথিবীতে জনসংখ্যা এত বাড়্‌বে যে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সেই অনুপাতে শস্যোৎপাদনক্ষম ভূমির পরিমাণ বা সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ নিশ্চয়ই বাড়্‌বে না, বাড়্‌তে পারে না। পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই বিষয় নিয়ে ঘোরতর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

জনসংখ্যা ও জন্মশাসন

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি ম্যালথাসের এই থিওরির কোনো ভিত্তি আছে ব'লে মনে করেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিশ্চয়ই। প্রত্যেক জাতিরই আর্থিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে নবজাতকের সংখ্যাবৃদ্ধি-প্রশমনের চেষ্টা কর্ত্তব্য। কিন্তু তার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের আবশ্যকতা পড়লে, রাষ্ট্র-কর্ণধারেরা যথাসময়ে সে বিষয় চিন্তা কর্ব্বেন। তাঁদের বিচারে ও সিদ্ধান্তে কোনো ভুল থাক্‌লে সমগ্র জাতিকে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে। এটা একটা গুরুতর কথা। আমরা যে জন্মশাসনকে আবশ্যক মনে করি, তার প্রকৃত অর্থ এই যে স্বামী ও স্ত্রীর রমণ-শক্তি এবং সম্ভোগাকর্ষণ একটা উন্নততর পথে ধাবিত হ'লে দেশের, জাতির, জগতের সাত্ত্বিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে প্রবর্দ্ধিত করবে। অত্যন্ত কামাতুর ব্যক্তি যখন

কামদমনে সমর্থ হয়, তখন তার ভিতরে এমন অনেক বিস্ময়কর কর্ম্ম-সামর্থ্যের সূচনা দেখা যায়, যা অতীতে কেউ কখনো ভাবতেও সাহস পায় নি। কামুককে সংযমের পথে টেনে আনতে পার্লে দেশবাসীর শক্তি, সামর্থ্য, সমৃদ্ধি, মনোবল, সাহস ও শৌর্য্য বাড়ে। এটা একটা চিরস্থায়ী সত্য। এই সত্যের দিকে তাকিয়েই আমার মুখ থেকে সংযম-পালনের উপদেশ নির্গত হয়। শুধু জন্মসংখ্যার বিভীষিকা দেখে আমি কাতর বা বিচলিত হই না।

স্বামী-স্ত্রীর সংযম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী এবং স্ত্রী যখন সংযম পালন আরম্ভ করে, তখন থেকেই তাদের দুজনের মধ্যে একটা নূতন রকমের সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে চলে, যার মাধুর্য্য অপরিসীম, যার পবিত্রতা অনপনেয়, যার আত্মপ্রসাদ অকৃত্রিম এবং যার স্থিতি শাশ্বত। এই সম্বন্ধটা এলে পরে দেহবুদ্ধি ক'মে যায় এবং আত্মার সঙ্গে আত্মার অভিরমণ চলে অনুক্ষণ, যার সুখ যুগপৎ কোটি-সম্ভোগের সুখের চেয়েও গভীর। এই একটী অসাধারণ অবস্থায় পৌছুবার প্রয়োজনেই দাম্পত্যসংযম-পালনকারীদের কোনও অবস্থাতেই নিজ নিজ সংযম-ব্রতের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হ'তে দেওয়া উচিত নয়।

সংযমে অপ্রচার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংযমের খবর বাইরে প্রচারের এক বিরাট বিঘ্ন লোকমান বা অভিমান। হাসি-টিট্‌কারীতে কিছু আসে যায় না কিন্তু নিজের ভিতরে সুখ্যাতির লোভ এবং অহমিকা এসে গেলে সব যজ্ঞ একেবারে দক্ষযজ্ঞ হ'য়ে যায়। তাই এই বিষয়ে গোপনতার বিশেষ প্রয়োজন। অসতর্ক দম্পতীদের সংযমব্রত পালনের চেষ্টা অনেক সময়ে শেষ পর্য্যন্ত একটা হাস্যকর অভিনয়ে পরিণত হ'য়ে থাকে।

রহিমপুর আশ্রম
৬ই বৈশাখ, রবিবার,১৩৪৩
(১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৬)

কীর্ত্তন

শেষ রাত্রিতে ধামঘর, মুরাদনগর, হোসেনতলা, কাশীপুর, করিমপুর, টন্‌কী, গুঞ্জর, ত্রিশ, ভবানীপুর, মোচাগড়া প্রভৃতি দশ বারোটী গ্রাম হইতে দশ বারোটী সুকণ্ঠ কীর্ত্তনদল হরিওঁ কীর্ত্তন করিতে করিতে রহিমপুর আশ্রমে আসিয়া পৌছিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এতগুলি কীর্ত্তনদল একত্র এসে মিলিত হয়েছ। কি আনন্দের কথা! কিন্তু এক এক দল এক এক সুরে এক এক লয়ে কেন গাচ্ছ? সবাই মিলে ঠিক সেই সুরটী সেই লয়টী ধ'রে হরিওঁ কীর্ত্তন কর না, যে সুরে যে

সনে এই রহিমপুর আশ্রমে আমি এক ছয়ই বৈশাখ আমার বর্ষব্যাপী মৌন ভঙ্গ করেছিলাম। আমি আগে আগে গাই, তোমরা পিছে পিছে গাও।

তুমুল কীর্ত্তন শুরু হইল।

কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গ্রাম-পরিক্রমা ক'রে এস। সবাই ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরেও গাইবার চেষ্টা ক'রো। শব্দে যেমন ব্রহ্ম আছেন, সুরেও তিনি তেমন আছেন। ভক্তি নিয়ে, ভাব নিয়ে, আবেগ নিয়ে, বিনয়নম্র চিত্ত নিয়ে গেয়ো। তোমার নিজের প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হোক্, এই আশা নিয়ে, সকল শ্রোতার প্রাণে প্রেমের বন্যা বয়ে যাক্, এই ভরসা নিয়ে কীর্ত্তন কর্বে। পৃথিবীর সব প্রেমিক কীর্ত্তনিয়ারা এই ভাবেই হরিনাম কীর্ত্তন করেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক তোমরা অনুসরণ করতে সমর্থ হও।

সমবেত উপাসনার অংশ-রূপে হরিওঁ কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমবেত উপাসনার সময়ে হরিওঁ কীর্ত্তনটুকু সব সময়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুরেই কত্তে হবে। অন্য সময়ে যখন হরিওঁ কীর্ত্তন কর, তখন যে-কোনও রাগে, যে-কোনও রাগিণীতে, যে-কোনও তালে হরিওঁ কীর্ত্তন করতে পার। উদয়াস্ত কীর্ত্তনে দিন বা রাতের সব রাগ-রাগিণী ব্যবহার করতে পার।

পথ চলাই প্রধান কথা

উৎসব মহাসম্মেলনাদি সুসম্পন্ন হইলে গভীর রাতে একটি মুসলমান যুবক আসিয়া গোপনে দেখা করিল। বলিল,—বাবামণি, আমি আপনার নিকট দীক্ষিত। কথাটা বাহিরে অর্থাৎ আমার স্বসমাজের লোকদের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে। এই জন্য তারা আমাকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করছে। এখন কি উপায় করি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি কি তোমাকে দীক্ষা নেবার জন্য ডেকেছিলাম?

যুবকটি বলিল,—না, আমি নিজ থেকেই দীক্ষার ঘরে ঢুকেছিলাম।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যদি আমার কাছে দীক্ষিত হবার ফলে তুমি উপকৃত বোধ ক'রে থাক, তবে কোনও অবস্থাতেই দীক্ষামন্ত্র ত্যাগ ক'রো না। আর দীক্ষা নিয়ে যদি সত্যিই কোনও উপকার না হ'য়ে থাকে, তবে আমার দেওয়া জিনিষ ছেড়ে দাও। যে কোনও অবস্থায় তুমি সেই কাজগুলো অবশ্যই ক'রে যাও, যা ইসলাম ধর্ম্ম অনুসারে শুভ্র, পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। সকল ধর্ম্মের লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরকে লাভ করা। সব ধর্ম্মই তাঁর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। পথে নামাটা বড় কথা নয়, পথে চলাটাই বড় কথা। আমার সংস্পর্শ যদি তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা পছন্দ না করেন, তবে তুমি

আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাক। সংসারে এবং সমাজে শান্তি না থাকলে ধর্ম্ম-সাধনার অগ্রগতির বড় বাধা। তুমি বাধাই ঠেকাবে, না পথে এগুবে? পথ-চলাটাই তোমার প্রধান কথা। যাদের খুশী ক'রে চললে তোমার পথ-চলার বাধা ক'মে যাবে, তাদের রুষ্ট ক'রে কষ্ট দিয়ে কোনও লাভ নেই।

দীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক একান্ত সেবককে বলিলেন,—আজকে তো কিছু লোককে দীক্ষা দিলাম। এরা সত্য সত্য কাজ করবে কি? দীক্ষা নিল অথচ কাজ করল না,—এটা একটা মারাত্মক ব্যসন। কাঁটার খোঁচা খেয়েও ফুল তুলল কিন্তু পূজা করল না, বাজার ক'রে জিনিষপত্র নিয়ে এল, কিন্তু রান্না করতে গেল না, কোঁচর ভ'রে গোলাপজাম কুড়িয়ে নিয়ে এল কিন্তু একটাও চেখে দেখল না, এ এক বিস্ময়কর বিভ্রান্তি। এরকম যাতে কেউ না করে, তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আমি তো দীক্ষা নেবার জন্য কাউকে ডাকি না, তবু লোকে দীক্ষা নেয়। ব্যাকুলতা দেখে না দিয়েও পারি না। এই যে দীক্ষা দেই, এটা কি দোষ? দুটা একটা লোক যে দীক্ষা নিয়ে সাধন করে, আর ফলাফল দেখে মুগ্ধ হই, চমৎকৃত হই, কৃতার্থ হই। তখন মনে হয়, কেউ দীক্ষা নিতে চাইলে তাকে ফেরাবো না। আমার কাছে যে লোকে দীক্ষা নিতে আসে, সে কি কেবল গ্রাম্য কুসংস্কারের ফলে?

কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। কিন্তু যারা সৎপ্রেরণা নিয়ে আসে, তাদের ফিরাই কি ক'রে? আমার চাইতে কত বড় বড় লোক চারদিকে বিরাজমান রয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে ঠেলে দিলেও এসব দীক্ষার্থীরা আমার কাছেই বারবার ফিরে আসে কেন? আমি সিদ্ধ নই, সাধক নই, তপস্বী নই, জাপক নই, আমি সাধারণ মানুষ। গুণের মধ্যে এই যে, বেশী কথা কইতে পারি। বেশী বেশী ক'রে কথা বলেও যাচ্ছি। আমার অন্তঃসারশূন্যতা এরা বুঝতে পারে না কেন? দীক্ষা নেবে, কাজ করবে না অথচ দেখা হ'লেই জ্বালাতন করবে। এ কেমন মুস্কিল হোল?

রহিমপুর আশ্রম

৭ই বৈশাখ, সোমবার, ১৩৪৩

(২০শে এপ্রিল, ১৯৩৬)

সমবেত উপাসনায় বিগ্রহ

শ্রীশ্রীবাবামণি জনৈক পত্রলেখককে লিখিলেন,—

"সমবেত উপাসনা-কালে বিগ্রহ থাকিবে কি না থাকিবে, এই প্রশ্ন আজ পর্য্যন্ত ওঠে নাই। মুসলমানের মসজিদে পশ্চিম দিকে একখানা কোরাণ-শরিফ থাকে। মসজিদ ছাড়া অন্য স্থানে নমাজ পড়িবার জন্য সমবেত হইলে দেখিয়াছি, তাঁহারা সামনে একখানা গামছা বিছাইয়া তাহাতে কোনও গ্রন্থ বা মূর্ত্তি বা বিগ্রহ না দিয়াই নমাজ সমাপন করেন।

আমরা কিন্তু একটী বিগ্রহ দেই। সেই বিগ্রহটী হইতেছেন প্রণব। ওঁ এই অক্ষরটী। ইহার অর্থ 'আছেন', ইহার অর্থ 'হাঁ'। 'আছেন' বা 'হাঁ' অর্থটুকু সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষেই অনাপত্তিকর। এমন নিরাপদ নির্ব্বিঘ্ন প্রতীক থাকিতে তোমাদের সমবেত উপাসনার কালে আবার হাজার দেবতার ছবি কেন টানাইবে, হাজার মহাপুরুষের মূর্ত্তি কেন বসাইবে, ইহা আমি ভাবিয়া পাই না। কাহারও গৃহে অন্যান্য মূর্ত্তি থাকিলে একজন ইহুদী, খ্রীষ্টান বা মুসলমান কদাচ ওখানে ঈশ্বরোপাসনা করিবেন না। কিন্তু সেই সব মূর্ত্তি যদি উপযুক্ত ভাবে ঢাকিয়া দেওয়া যায়, তবে আমরা আমাদের সমবেত উপাসনা করিতে কদাচ বিরুক্তি করি না। সমবেত উপাসনার স্থানে দুই বা বহু বিগ্রহের আমদানী সত্যই কার্য্য-হানিকর। একথা বুঝিতে তোমাদের দেরী হইতেছে। কিন্তু অন্যের পূজিত দেববিগ্রহাদির অসম্মান না করিয়াও আমরা সুকৌশলে অনেক স্থানেই সমবেত উপাসনা করিতে পারি, যদি ইতিবাচক প্রণব-বিগ্রহে আমাদের আন্তরিক আস্থা থাকে। আমি নূতন কিছুর প্রবর্ত্তন করিতেছি না, চিরপুরাতনকে নূতন যুগে প্রচার করিতেছি মাত্র। আমার অভিপ্রায় বুঝিবে না, অথচ আমার শিষ্য বলিয়া ঢাক পিটাইবে, ইহা সুখাস্বাদকর নহে।"

একের ভিতরেই ত' সব

শ্রীশ্রীবাবামণি ঐ পত্রেই আরও লিখিলেন,—

"তোমাদের কাহারও পূজিত বা বাঞ্ছিত বা কাঙ্ক্ষিত কোনও দেবতার পূজা লোপ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এক দেবতার পূজকেরা যে অন্য দেবতার পূজককে হেয় বা দ্বেষ্য মনে করে, তাহা আমাকে পীড়া দিতেছে। বহু ঈশ্বর মানিতে গেলে কোনও দেবতা শ্রেষ্ঠ, কোনও দেবতা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবেনই। ভারতের সাম্প্রদায়িক পুরাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে এই শ্রেষ্ঠতা-বোধ বা নিকৃষ্টতাবোধ লক্ষ্য করা যায়। যে যার পূজক, সে তাকে কুলীন করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে, ইহা মনুষ্য-চরিত্রে স্বাভাবিক। আমি চাই ভিন্ন ভিন্ন মতের পূজকেরা, ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসরণকারীরা সকলে এমন একটী স্থানে মাঝে মাঝে খোলা মনে খোলা প্রাণে মিলিত হইবার অভ্যাস অর্জ্জন করুক, যাহার ফলে আস্তে আস্তে সকলের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক সম্প্রীতির সৃষ্টি হইবে। প্রাচীন-ঋষিদের উপলব্ধি ছিল যে, একের মধ্যে সব এবং সবার মধ্যে এক নিত্য-বিরাজমান। আজিকার দিনেও সেই উপলব্ধিটুকু নবজাগ্রত মানুষের মনে জাগিয়া উঠিবে না কেন? একজনের ভিতরে যে সবাই আছেন একেবারে অভিন্ন ভাবে, এই বোধ না জাগিলে ধর্ম্ম ত' মহা-আড়ম্বরের ঐশ্বর্য্যেই মাত্র অনুসৃত হইবে, প্রকৃত ধর্ম্মকে বুঝিবে কে?"

মোচাগড়া আশ্রম
৮ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩
(২১শে এপ্রিল, ১৯৩৬)

সমবেত-উপাসনা সম্পর্কে কর্ত্তব্য

প্রাতঃকালে মোচাগড়া আশ্রমে সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনান্তিক ভাষণে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেখানে দু-তিন জন সমসাধক আছ, সেখানেই সপ্তাহে একটী দিন সমবেত উপাসনাতে মিলিত হবার অভ্যাসটী প্রত্যেকে অনুশীলন কর্ব্বে। সমবেত উপাসনা তোমাদের মিলনের আগ্রহ, অভ্যাস ও চেষ্টা বর্দ্ধিত করুক। উপাসনার জন্য নির্দ্ধারিত কোনো স্থানে তুমি থাকলে তোমার সাপ্তাহিক উপাসনাটী সেইখানে কত্তে পালেই সব চেয়ে ভাল। অন্যান্য দিন উপাসনা থাক্‌লে তা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কত্তে পার। এই বিষয়ে অবশ্য কড়াকড়ি কোনো নিয়ম করা ঠিক চলে না। অধিকাংশের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার উপায় ও উপকরণ বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে কর্ম্মতালিকা স্থির কর্ব্বে। সমবেত উপাসনাকে উপলক্ষ্য ক'রে কদাচ কোনো ঝগড়া-কলহকে সৃষ্ট হ'তে দেবে না। উপাসনা স্থলে সবাই সকলের

প্রতি ক্ষমাশীল মনোভাব নিয়ে কাজ কর্ব্বে। কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠদের সম্মান রক্ষা ক'রে চল্‌বে, জ্যেষ্ঠেরা কনিষ্ঠদের মর্য্যাদা-বৃদ্ধিকর ভাবে কাজ কর্ব্বে। শৃঙ্খলা ও নিঃশব্দতা রক্ষা ক'রে চলবার চেষ্টা প্রতিজনে কর্ব্বে। তোমাদের সমবেত উপাসনার আসরে এসে যেন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সুধী ব্যক্তিরা প্রেরণা ও আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারেন। এই সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়ে তোমাদের চরিত্র-গঠনের চেষ্টা যেন উন্নতিমুখিনী হয়।

আশ্রমাদির স্থায়িত্ব

একজন প্রশ্ন করিল,—মোচাগড়া, মেটংঘর, পূর্ব্বধৈর আদি স্থানে যে সব আশ্রম হইয়াছে, তাহা স্থায়ী হইবে কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— যে আশ্রমে পরিশ্রম ক'রে ক'রে সমস্ত পরমায়ুটাই বিসর্জ্জন দিতে চলেছি, সেই পুপুন্‌কী আশ্রমই কত কাল থাক্‌বে, তা আমি জানি না। এমন অবস্থায় মোচাগড়া, মেটংঘর, পূর্ব্বধৈর, কৃষ্ণরামপুর প্রভৃতি স্থানের আশ্রমের স্থায়িত্বের বিষয়ে কি নিশ্চয় ক'রে কোনো কথা বলা যায়? জগতে যত জনেরই জন্মলাভ হচ্ছে, তারা প্রতিজনেই যে একদা মরে যাবে, এই অপ্রিয় কথাটী কেউ বলে না শুধু ভদ্রতার অনুরোধে। নতুবা, যার জন্ম আছে,

তার মরণও নিশ্চিতই আছে। তবু যে জন্ম নিল, তাকে লোকে সেবাযত্ন দিয়ে বড় ক'রে তুলতে কুণ্ঠা করে না। কারণ, এই শিশুকে উপলক্ষ্য ক'রে জগতে কতক কাল কতকগুলি সৎ অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। সৈনিকেরা শিবির গাড়ে সেখানে চিরস্থায়ী বাসিন্দা-রূপে বাস করার জন্যে নয়, পরন্তু দুচার রাত্রি নিরাপদে কাটিয়ে দিয়ে নিজেদের লক্ষ্যপথে অব্যাহত গতিতে চ'লে যাওয়ার সুবিধাটুকু ক'রে নেওয়ার জন্য। রাজানুগ্রহলব্ধ এবং অসংখ্য ত্যাগী ভিক্ষুর সেবায় পুষ্ট বৌদ্ধ-বিহারগুলি হাজার দেড়েক বৎসরের মধ্যেই ত' লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তারা মানবসভ্যতার উপরে দাগ কেটে রেখে গেছে এইটীই একটী আশ্চর্য্য সত্য।

সমবেত উপাসনার কেন্দ্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— তোমাদেরও নিত্য নূতন আশ্রম গড়ার বাতিক না থাকাই ভাল। সমবেত উপাসনাটী সপ্তাহে অন্ততঃ একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে মিলে ক'রে নেবার একান্ত প্রয়োজনে তোমাদের এক একটা মিলন-স্থান প্রয়োজন। সে মিলন ভাল ঋতুতে বৃক্ষতলেও হ'তে পারে। তোমরা যদি সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-সান্নিধ্য এবং মানব-প্রীতি এই দুটী জিনিষ লাভ কত্তে পার, তাহ'লে আশ্রম না গ'ড়েও তোমরা জগতে বিমল শান্তি দিয়ে যেতে

পার্শ্বে। আর, যদি তোমরা আবার সমবেত উপাসনার পবিত্র কেন্দ্রস্থলটীকে অবলম্বন ক'রে ভাল রূপে ঝগড়া-কলহের আমদানী কত্তে পার, তবে জগৎ-কল্যাণকে শ্মশান-চুল্লীতেও তুলতে পারবে। যত স্থানে আশ্রম হয়েছে, সর্ব্বত্র আমি এই কথাটিই বারংবার ভেবেছি। তোমরা আমার মনের কথা যদি বুঝে থাক, তবে সজাগ দৃষ্টি রেখে পথ চল। প্রতিজ্ঞা কর, সমবেত উপাসনার স্থানে বা সমবেত উপাসনাকে উপলক্ষ্য ক'রে কদাচ ঝগড়া-কলহে মত্ত হবে না।

আশ্রম স্থায়ী হয় কি ভাবে

একজন প্রশ্ন করিলেন,—আশ্রম স্থায়ী হয় কি উপায়ে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপায় তোমার হাতে নেই, উপায় পরমেশ্বরের হাতে। তুমি শুধু প্রেম, নিষ্ঠা ও সেবা দিতে পার। বাকী সব পরমেশ্বরেরই হাতে। অন্তরে কেউ কখনো এমন অহঙ্কার রেখ না যে, তুমি এই কচ্ছ আর সেই কচ্ছ। নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কি বখতিয়ার খিলিজির রণোন্মত্ত সৈন্যদের হাতে নিস্তার পেয়েছিল? তক্ষশিলা, নৈমিষারণ্য বিদ্যার্জ্জনের সুমহান্ দুই কেন্দ্র রূপে নিখিল ভারতে প্রথিত ছিল, তারা কি আজ আছে? এক একটা যুগবিপ্লব ঘ'টে অনেক অযোধ্যা শ্রীহীন হয়েছে। কিন্তু তাদের দান জগৎকে তারা বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করে নি। জগদ্বাসী তা লাভ ক'রে কৃতার্থ হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার দোষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অন্য যুগে কি রকম ছিল, আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু এই যুগে এই দেশে সাম্প্রদায়িকতা এক মারাত্মক ব্যাধি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঘৃণা আর বিদ্বেষ এর প্রধান-উপজীব্য আর ইন্ধন দিচ্ছে আর্থিক ও ধন-বৈষম্য। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের ভাল ভাল কল্পনাকে জলসাৎ ক'রে দিচ্ছে। পণ্ড ক'রে দিচ্ছে অনেক সুপরিকল্পিত পরিশ্রম। সাম্প্রাদায়িক অসন্তোষ ও সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ যুক্তিহীন অন্ধের মত যখন চল্‌বে, তখন অনেক মহৎ লোক অকারণে মরবেন এবং অনেক সৎপ্রতিষ্ঠান চিরতরে ধ্বংস হবে। বারুদের স্তূপের উপরে ব'সে কারো সিগারেট খাওয়া উচিত নয়। মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষকে সম্মান দান আমাদের প্রতিজনের কর্ত্তব্য। প্রতিটী প্রাণী যখন কোনও দেশে সত্যিকারের মানুষ হবার জন্য চেষ্টা করে, তখন সে দেশে প্রকৃত শান্তি আসে। অসঙ্গত ঘৃণা যেমন পাপ, অন্যায় তোষণও তেমনি পাপ। মানুষ-মাত্রকেই মানুষ হিসাবে দেখতে হবে। এবং এই দেখা আমাদের নির্ভুল হবে তখন, যখন আমরা বিশ্বাস কর্ব্ব যে সব জাতি, সব বর্ণ, সব ধর্ম্ম, সব সমাজ, সব দেশ, সব প্রাণী একই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়েছে। সকলের ঈশ্বরই যখন এক ব'লে অনুভূত হবে, তখন আর সাম্প্রদায়িকতা থাক্‌বে না।

৯ই বৈশাখ শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতে রহিমপুর আসিলেন

এবং অপরাহ্নে আসিলেন নগরপাড়। ১০ই বৈশাখ প্রাতে আসিলেন কুমিল্লা, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ ধরিয়া দুপুরে পৌছিলেন চাঁদপুর এবং রাত্রি ৮টা ৪৬ মিনিটে সুরমা মেইল ট্রেণ ধরিয়া রাত্রি এগারটায় কুমিল্লা পৌছিলেন।

কুমিল্লা
১৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৩
(২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৬)

স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের মহিমা

কুমিল্লাতে এগারই বৈশাখ পঞ্চম বক্তৃতা, বারোই বৈশাখ ষষ্ঠ বক্তৃতা, তেরোই বৈশাখ সপ্তম বক্তৃতা, চৌদ্দই বৈশাখ অষ্টম বক্তৃতা এবং পনেরোই বৈশাখ নবম বক্তৃতা দিতে হইল। নবম দিবসে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল না এবং প্রচারও হয় নাই। তবু বিকাল বেলা এত জনতা হইল যে, অন্য দিনের তুলনায় বেশী বলিয়া মনে হইল। কলেজের কতিপয় অধ্যাপকের সাগ্রহ অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবামণি সভাস্থলে দাঁড়াইলেন এবং পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা কাল ভাষণ দিলেন। অদ্য বিশেষ করিয়া বলিলেন, স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব পোষণের উপায় সম্বন্ধে। একই ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে প্রতিদিন ভাষণ দিতেছেন। তবু জনতা কমিতেছে না দেখিয়া একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ

করিয়া বলিলেন,—আমি আমার মাতৃদেবীকে পরমেশ্বরী ব'লে জ্ঞান করি এবং জগতের প্রত্যেক রমণীতে মাতৃভাব আরোপের চেষ্টা করি। তারই প্রভাবে আমি সমগ্র দেশের সর্ব্বজাতির প্রতিটি মানুষের ভিতরে আমার মায়ের মুখচ্ছবি দেখতে পাই। এই জন্যই আপনাদের প্রতিজনের আমার বাক্যের প্রতি এত শ্রদ্ধা। আপনারা জানেন যে, কাল আমার বক্তৃতা শেষ হবার পরেই কৃষ্ণমালা-মা নামে পরিচিতা এক সাধিকা মহিলা আমার সঙ্গে দেখা কত্তে এসেছিলেন। তিনি পুরুষ-মাত্রকেই নিজের পুত্র ব'লে জ্ঞান করেন। ফলে তিনি নিজে নমঃশূদ্রাজাতীয়া হ'য়েও শত শত ব্রাহ্মণের পূজাস্থানীয়া হয়েছেন। প্রকৃত মাতৃভাব এলে মায়ের জাতির আর পতন নেই। প্রকৃত সন্তানভাব এলে আর পুরুষজাতির পতন নেই। আমি জাতির পতন-নিবারণ কত্তে চাই। তাই এই জনতার ভিড়।

ফেণী

১৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩

(৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৬)

প্রাতে ৬টা ৩০ এর ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা হইতে হইয়া বেলা ৮টা ৪৮এ ফেণী পৌছিলেন।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলন

নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম এই দুই জেলার সংগঠন-কর্ম্মী

যুবকেরা রাজবাড়ীতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন দে'র গৃহে সমবেত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁরা দেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম্ম কচ্ছেন বা যাঁরা এঁদের কাজের বিরুদ্ধে দল গঠন কচ্ছেন, তাঁদের কারো সঙ্গে তোমাদের বিরোধ করা চল্‌বে না। তাঁদের কর্ম্মধারার ভালমন্দ খুঁটিনাটি আলোচনা ক'রে মানুষের মনে তাঁদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও মতামত সৃষ্টি ক'রে দেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের নয়। একটা জাতির সামগ্রিক অভ্যুদয়ের দিকে তাকিয়ে তিন শত বৎসর ধ'রে সংযমের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরী ক'রে যাওয়া তোমাদের কাজ। সুতরাং এই তিন শত বৎসর ধরেই তোমাদের অরাজনৈতিক থাক্‌তে হবে। ইংরাজ এদেশের বর্ত্তমান প্রভু, তাঁরা চাইবেন ভারত-সাম্রাজ্যকে ইংরেজ জাতির স্বার্থের অনুকূলে শাসন কত্তে। অনেক প্রাণবান্ দেশপ্রেমিক দেশের রাজনৈতিক বন্ধন-দশার মুক্তিপিপাসু, তাঁরা চাইবেন নানা প্রকার আন্দোলন চালিয়ে যেতে। আবার, এঁদের মধ্যেও একটা দল এক দিকে অন্য দল অন্য দিকে ধাবমান হ'তে হ'তে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে একদল অন্য দলের সঙ্গে বিরোধ কর্ব্বেন, সংঘর্ষ বাধাবেন। এরূপও হ'তে পারে। এই সব দলাদলির হট্টগোলে না জড়িয়ে প'ড়ে তোমরা একেবারে খাঁটি ও নির্ভেজাল চরিত্র-গঠন-আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাক। কেউ টিটকারী

দেবে, কেউ কেউ বা বিরুদ্ধতাও কর্ব্বে। ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তা কত্তে বস না বা কারো সঙ্গে বিতর্ক বা বিরোধ বাঁধাবে না। তোমাদের কর্ম্মনীতি হবে the line of least resistance, যত অল্প বাধার মধ্য দিয়ে কাজ কত্তে পার, তাই তোমাদের করণীয়। কাজে সময় দেবে না বিরোধে সময়ের অপচয় কর্ব্বে, এ বুদ্ধি ভাল নয়।

চরিত্রগঠনের কর্ম্মধারা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কত বৎসর আগেই ত' আমি দিনলিপি লিখবার চার্ট তৈরী ক'রে দিয়েছি। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক তরুণ-তরুণী যদি দৈনিক আত্মশোধনের চেষ্টা করে, তবে দশ বিশ বৎসরের মধ্যে একটা যুগান্তর নিশ্চয়ই সৃষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। চরিত্র সুগঠিত হবার পরে কে কোন পথে পাদচারণা কর্ব্বে, তার নির্দ্দেশ তোমরা দিতে যেও না। চরিত্রবান্ ব্যক্তির বিবেক নিজের ক্ষমতাতেই তাকে সৎপথে বা যোগ্যতম রাস্তায় প্রবর্ত্তিত ক'রে দেবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৮ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৪৩

(১লা মে, ১৯৩৬)

প্রাতে ৫টা ৪০ মিনিটে শ্রীশ্রীবাবামণির ট্রেণযোগে ফেণী ত্যাগ করিলেন।

দৌলতগঞ্জ নিবাসী ভক্ত যুবকেরা শ্রীশ্রীবাবামণির জন্য

লাকসাম জংশনে খাদ্য-পানীয় নিয়া আসিয়াছিলেন। ট্রেণ এখানে তিপ্পান্ন মিনিট থামে।

তরুণ মাত্রের প্রতি কর্ত্তব্য

স্থানীয় যুবকদের নেতৃস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী এবং শ্রীস্নেহময়কে বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কতকগুলি উপদেশ দিলেন। বলিলেন,—তরুণমাত্রের প্রতি তোমাদের বিশেষ কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। প্রথম কর্ত্তব্য আমার লেখা 'সরল ব্রহ্মচর্য্য' বইখানি পড়তে দেওয়া। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য,—'দিনলিপি' লিখতে প্রেরণা দান। তৃতীয় কর্ত্তব্য আমার রচিত সংসঙ্গীত-গুলি গাইতে শিক্ষা দেওয়া, আমার রচিত অন্যান্য পুস্তকের নির্ব্বাচিত অংশগুলি কণ্ঠস্থ কত্তে উৎসাহ দেওয়া। আমি জীবনে একটী মাত্র সদুদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের প্রায় প্রতিটি কাজ করেছি, প্রায় প্রতিটি কথা বলেছি, সম্ভবতঃ অধিকাংশ চিন্তাও সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই অনুশীলন কত্তে চেষ্টা পেয়েছি। আমার যেমন তরুণদের দিয়ে প্রয়োজন, আমাকে দিয়েও তরুণদের তেমনি প্রয়োজন জান্‌বে।

কুমিল্লা ষ্টেশনে গাড়ী ২৮ (আঠাশ) মিনিট থামে। অন্যান্য দিন শ্রীশ্রীবাবামণিকে দেখিবার জন্য দুই চরিটি স্কুলের ছাত্র ছাড়া আর কেহ আসে নাই। আজ দেখা গেল, শহরের দুই তিন জন শ্রেষ্ঠ উকিল, একজন সুবিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

এবং কলেজের দুই জন কৃতবিদ্য অধ্যাপক দর্শনার্থীদের মধ্যে রহিয়াছেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি এই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাইতেছেন, তাহার পরে সোজা ময়মনসিংহে যাইবেন। অনুরোধ করিলেন যেন শ্রীশ্রীবাবামণি অচিরেই কুমিল্লা পুনরাগমন করেন এবং আরও অন্ততঃ দুইটী দিন ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি যে এতবড় একজন ধুরন্ধর বক্তা হ'য়ে পড়েছি, তা ত' আমি জান্‌তুমই না।

অধ্যাপক ধর বলিলেন,—বক্তা বল্‌ছেন কেন! বাগ্মী বলুন। আপনাকে বক্তা বললে অপমান করা হয়। রাজাকে তহসিলদার বল্লে যেমন অন্যায় করা হয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন,—বাপ্‌ রে বাপ! আমার মতন একটী নগণ্য সাধারণ মানুষের এত দাম বেড়ে গেছে? আশ্চর্য্য ব্যাপার ত! যাক্ আপনারা ভাব্‌বেন না, আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছবার পরে দুটা দিন পার হ'লেই ঠাণ্ডা মাথায় পুনরায় প্রগ্রাম কর্ব্ব এবং কুমিল্লায় আরো দুটা ভাষণ দেবো। আপনারা প্রচার-কর্ম্মের ভার নিবেন, এইটুকু অনুরোধ। এতদিন যে ভাষণ হয়েছে, প্রচার-কার্য্যটা আমাকেই অন্য লোক দিয়ে করাতে হয়েছে। এবার আপনারা আমার দলে ভিড়ুন।

সকলে প্রসন্ন মনে হাসিয়া উঠিলেন।

আখাউড়া জংশনে ট্রেণটী থামে একঘণ্টা নয় মিনিট

কাল। ঐ অঞ্চলের কোনও কোনও গ্রাম হইতে দুই একটী তরুণ দেখা করিতে আসিয়াছে।

খুকীর বিবাহ

একজন বলিল,—বাবামণি বিয়ে করেছি ছোট্ট মেয়েকে, যাকে খুকী বল্লেও চলে। এরূপ বিবাহের কি আপনি সমর্থন করেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বর ও কন্যা উভয়েই কাছাকাছি বয়সের হবে, ব্যবধান বড় জোর পাঁচ, সাত বা আট বৎসরের হ'তে পারে,—এভাবেই বিবাহ হওয়া উচিত। আধ্যাত্মিক দিক্‌টা যতই উন্নত হোক্, শারীরিক বা জান্তব যে একটা দিক্ আছে, যে দিকটা আছে ব'লেই বংশপ্রবাহ চল্‌ছে, নিত্য নূতন মানব-মানবীর আবির্ভাব ঘট্‌ছে, সেকথা ভুলে গেলে হবে না। তবে, তোমাদের সমাজে তোমাদের জাতের পুরুষদের মধ্যে তারাই সহজে বিবাহ কত্তে পারে, যাদের টেঁকে টাকা আছে। উপযুক্ত বয়সের মেয়েগুলি যদি ধনীরা কিনে নিয়ে যায় অর্থাৎ কন্যাপণ দিয়ে বধূরূপে তুলে নেয়, তবে ত' কনের সংখ্যায় আকাল ধরবেই। এই জন্যই ত' তোমাদের অনেককে বাধ্য হ'তে হয় ছোট ছোট খুকী এনে তাদের বিয়ে করার। কি কন্যাপণ, কি বরপণ, সব রকমের পণই বিবাহ-প্রথা থেকে উঠে যাওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু যতদিন সেই সুদিন না আস্‌ছে, ততদিন তোমাদের মত বিবাহিতদের বিবাহের পরে দুচার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করা দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিতা পত্নীকে আশ্বাস দেওয়া আবশ্যক যে, তোমরা ধৈর্য্য-সহকারে এই পত্নীদের যৌবন-প্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করবে, কিছুতেই বিপথে যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীটীকে শ্বশুরালয়ে বা পিতৃগৃহে, উভয় স্থানেই, অতর্কিত বিপদ-আপদ সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দিতে হবে। কুমারী অবস্থায় মেয়েদের যে সব বিপদ ঘটতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সধবা মেয়ের উপরে তা ঘটে না কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অবাধে ঘটে যায় এবং কেউ তার খবরাখবরটুকু জান্‌তে পারে না, কোন্ সমাজের কুসংস্কার কোন্ দম্পতীর জীবনে রাহুগ্রহের আবাহন কর্‍বে, কেউ জানে না। ধৈর্য্য, সতর্কতা, চতুরতা এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে চল্‌তে হবে।

শ্রাদ্ধান্ন

অপর একজন তার বাড়ীতে তার পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে যাইবার জন্য তারিখ জানাইয়া নিমন্ত্রণ করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রচলিত স্মার্ত্ত-মতের শ্রাদ্ধে, মানে যাতে তোমরা পুরোহিতকে ডাক, তাতে অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণ অন্নপানীয় বা দান গ্রহণ কত্তে যান না। তার প্রধান কারণ এই যে, লোকের মনে একটা সংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাস আছে যে, শ্রাদ্ধের দিনে

শ্রাদ্ধীয় অন্ন ও বস্তুর প্রতি প্রেতের লালসার দৃষ্টি পড়ে ব'লে ঐগুলি প্রেতের উচ্ছিষ্ট হ'য়ে যায়। সত্য সত্য কি হয়, তা কেউ বল্‌তে পারে না। কিন্তু এটাই অনেক লোকের ধারণা বা বদ্ধমূল বিশ্বাস। কোন্ সদ্‌ব্রাহ্মণ, যতি বা ব্রহ্মচারী যাবেন প্রেতের উচ্ছিষ্ট খেতে? একদা কিছু কিছু লোক আমাদের মতে, অর্থাৎ সমবেত উপাসনার সাহায্যে নিজ নিজ পিতামাতা, আত্মীয় ও বান্ধবের শ্রাদ্ধীয় পারলৌকিক কাজ কর্‍বে। এজন্য আমাকে কোনো অনুশাসন উচ্চারণ কত্তে হবে না, আপনা আপনিই এসব হবে। তখন কিন্তু উপাসনাকালে লোকে ধারণা কর্‍বে যে, প্রেত এখানে উচ্ছিষ্ট ক'রে দেবার জন্য আসে নি, সে এসে সমবেত উপাসনায় তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসেছে অন্য উপাসকদের সমসাধক রূপে সাধন কত্তে, যার প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে প্রেতত্ব থেকে মুক্তি। তখন দেখো, কেউ কারো বাড়ীতে শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ কত্তে দ্বিধা বোধ কর্‍বে না।

কীর্ত্তনাঞ্জলি ও সমবেত উপাসনা

চান্দাইসার-নিবাসী অপর একজন প্রশ্ন করিল,—সমবেত উপাসনাতে আর কীর্ত্তনাঞ্জলিতে কি তফাৎ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমবেত উপাসনাকে অঙ্গহীন না করাই ভাল। যেমন, কাল-সংক্ষেপ করবার জন্য জপটা বাদ দেওয়া হয়। জপ বাদ দিলে আর জপ-সমর্পণ মন্ত্র-

পাঠের আবশ্যকতা থাকে না। কীর্ত্তনাঞ্জলিতে জপ রাখতে গেলে জপ-সমর্পণও বাধ্যকর। কীর্ত্তনাঞ্জলিতে ধ্বনি, অখণ্ড-সংহিতা পাঠ, কীর্ত্তন, অঞ্জলি, শান্তি-বাচন পর পর এভাবে হবে। এই কীর্ত্তন তুমি দু-ঘন্টাও করতে পার, বার ঘন্টাও করতে পার। এরূপ ক্ষেত্রে অখণ্ড-সংহিতার নির্ব্বাচিত অংশ আগে পাঠ ক'রে নেবে। সময়ের অকুলান বুঝলে পাঠ সংক্ষেপে করতে পার। সময় হাতে থাক্‌লে দীর্ঘ সময় পাঠ করতে পার। তবে আসল কথাটা তখন কীর্ত্তন, এ কথাটা মনে রাখতে হবে। এখন তো হাতে-লেখা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ হচ্ছে, একদা ছাপান বই পাবে। তখন স্থানে স্থানে একই সঙ্গে, একই সময়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে উপাসনা বা কীর্ত্তনাঞ্জলি চালাতে তত অসুবিধা হবে না। আজ হাতে-লেখা প'ড়ে প'ড়েই কষ্ট ক'রে চালাও। মনে রাখতে হবে, কীর্ত্তনাঞ্জলিতে জপ রাখলে জপ-সমর্পণ বাধ্যকর,—জপ না রাখলে জপ-সমর্পণ বাধ্যকর নয়। এসব খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাকরণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতান্তর, মনান্তর অনুচিত। সমবেত উপাসনায় ধ্বনি দিয়ে পাঠ আরম্ভ ক'রে দিলে উপাসনা আরম্ভ হোল ব'লে জানবে। এই পাঠ আরম্ভ করাটা উপাসনার মনোভঙ্গি বা Mood তৈরী করার জন্য। তুমি যখন পাঠ আরম্ভ করেছ এখানে, ঠিক সেই সময়েই অন্যেরা শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কোলকাতা বা ধানবাদ পাঠ আরম্ভ ক'রে দিক। তুমি "জয় জয় ব্রহ্ম" বলবার

সময়েতে অন্যান্য জায়গার লোকেরা যদি জয় জয় আরম্ভ ক'রে দেয়, তাহ'লেও নয়ের দ্রুততা বা বিলম্ব হেতু নানা স্থানে গিয়ে ব্রহ্ম-গায়ত্রীর সময়টা বা হরিও কীর্ত্তনের সময়টার নড়চড় হবেই হবে। শান্তিবাচন তো একসঙ্গে এত জায়গায় কখনো সম্ভব হবে না। অখণ্ড-সংহিতা পাঠেই যখন উপাসনা আরম্ভ, তখন সব জায়গায় এই আরম্ভটাই ঘড়ি ধ'রে কর না! কিছু লোক যখন অনেক আগে এসে গেছে, বৃথা কেন চলাফেরা করছে, বৃথা কেন কথাবার্ত্তা বলছে, এজন্য সবাইকে একত্র বসিয়ে নেবার সুবিধের জন্য আগাম পাঠও আরম্ভ করতে পার। কিন্তু উপাসনা আরম্ভের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে এই আগাম পাঠ বন্ধ ক'রে দিও। ধ্বনি দিয়ে প্রণাম ক'রে আবার অখণ্ড-সংহিতা পাঠ আরম্ভ করতে হবে। এই ভাবেই উপাসনাতে শৃঙ্খলা আনতে হবে।

দেবেন্দ্র চন্দ্র তলাপাত্র

ট্রেণ বেলা দুইটায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌছিল। শ্রীশ্রীবাবামণি আনন্দবাজার শ্রীনীলমোহন ঘোষের গৃহে উঠিলেন।

অপরাহ্ন পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে স্থনীয় আনন্দময়ী কালীবাড়ীতে আড়াই ঘন্টা ব্যাপিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার প্রথম ভাষণটী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ জননেতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র তলাপাত্র মহাশয় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে প্রদত্ত সাতটী বক্তৃতারই

প্রায় পূর্ণ বিবরণ পঞ্চাশাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী পাণ্ডুলিপিতে ইংরাজিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কারণ, সেই সময়ে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছিল যে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব পাশ্চাত্য দেশ-ভ্রমণেও যাইতেছেন। বিদেশের কাজে লাগিতে পারে মনে করিয়া তলাপাত্র মহাশয় এই বিরাট পরিশ্রমটী করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই পাণ্ডুলিপিটি হারাইয়া গিয়াছে। ঐ পাণ্ডুলিপি যাঁহারা যাঁহারা দেখিয়াছেন, বলিয়াছেন,—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, অনবদ্য, অতুলনীয়! কি পরিস্থিতিতে এই মূল্যবান্ জিনিষটী হারাইয়া গেল তাহার বিবরণ লেখা সঙ্গত নহে। তলাপাত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত একটী গুণ-বিবেচন (appreciation) "Swarupananda as a Moral Teacher" (সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ) নামক পুস্তিকায় দেখা যাইবে। ভাষা-লালিত্যে, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ও রচনাশৈলীতে উহাও একটী চমৎকার সৃষ্টি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম বক্তৃতা

জনাকীর্ণ সভাস্থলের সুসজ্জিত মঞ্চ হইতে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার কম্বুকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—এসেছি আমি তোমাদের সম্মুখে প্রাচীন ভারতের মহত্তম আদর্শের কথা শুনাতে, যে আদর্শের সেবা ক'রে ভারতের যোগী, ঋষি, যতি, ব্রতী, তপস্বী, সন্ন্যাসী, গৃহী ও সাধারণ লোক প্রত্যেকে একদা

জগৎপূজ্য ব'লে গৃহীত হবার অধিকার পেয়েছিলেন। আত্মগর্ব্বে মগ্ন হ'য়ে সুদীর্ঘকাল আমরা আমাদের প্রকৃত সাধনার সিদ্ধিপথ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে নিজ হাতে নিজের হনন-কার্য্য চূড়ান্ত ভাবে ক'রে ফেল্‌বার আগে একবার সেই প্রাচীন জীবনের লক্ষ্য, গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অশেষ বিবেচনার প্রয়োজন পড়েছে। অতীত আমাদের যদি জঞ্জালই মাত্র হ'য়ে থাকে, তবে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে আমরা তাকে বিসর্জ্জন দিব। অতীত যদি আমাদের অকিঞ্চিৎকরই হ'য়ে থাকে, তবে তাকে আমরা বিস্মৃত হবার চেষ্টা নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রযত্নেই কর্ব্ব। কিন্তু অতীতে যদি সত্য সত্যই এমন বস্তু থেকে থাকে, যা নিত্যকাল অনশ্বর, যা চিরন্তন সত্য, যা সমগ্র পৃথিবীকে পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার কর্ত্তে সমর্থ, তবে তাকে পুনরায় আমাদের ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে সংঘজীবনে কেন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্ব না? পুরাতন হ'লেই সব পচে যায় না, নূতন হ'লেই তাকে অর্ব্বাচীন ও অবাঞ্ছনীয় জ্ঞান করা চলে না। অতীত ও বর্ত্তমানকে সামঞ্জস্যযুক্ত ক'রে নিয়ে ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণ করার কি কি সুযোগ, কি কি যোগ্যতা আমাদের আছে, তার একটা চূড়ান্ত হিসাব আগে ক'রে নিতে হবে। এই হিসাবের যে সত্যই প্রয়োজন এসেছে, এই কথাটুকু স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই আমি এসেছি। আমি এসেছি তোমাদিগকে

নিজের এবং দেশের, সমাজের এবং জাতির ভবিষ্যৎ-নির্ম্মাণের কাজে স্থপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার আগ্রহে আত্মগঠনের প্রেরণায় মাতিয়ে দিতে।

সভাস্থল নীরব

আড়াই ঘন্টা কাল ভাষণ দিয়া যখন শ্রীশ্রীবাবামণি মঞ্চ হইতে নামিলেন, তখন এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল। একটী লোক করতালি দিল না, একটী লোক টুঁ শব্দটীও করিল না, একটী লোকও বুঝিল না যে, বক্তা এখন তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন। মনে হইল যেন তাঁহারা তন্ময় হইয়া এখনো ভাষণ শুনিতেছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র তলাপাত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,—"It was a singular sight to look at. It seemed as if the sweet melody of a celestial music was still ringing and lingering in their ears." (মনে হইতে লাগিল, যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতের মধুর রেশ তখনও শ্রোতাদের কাণে গুঞ্জিত হইতেছিল। ইহা এক অতুলনীয় দৃশ্য।)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

১৯শে বৈশাখ, শনিবার,১৩৪৩

(২রা মে, ১৯৩৬)

রায় সাহেব জগৎচন্দ্র রায় শ্রীশ্রীবাবামণিকে তাঁহার

স্থিতিস্থান হইতে বেলা দশটায় নিজ গৃহে নিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি এখানে অর্দ্ধঘন্টা থাকিবেন।

ভক্তি-লাভের উপায়

রায় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—বলুন স্বামীজী, ভক্তি-লাভের উপায় কি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় ভক্তদের সঙ্গ করা, ভক্তদের জীবন-চরিত্র আলোচনা করা। যেমন একজন ভাল লোক চোরের সঙ্গ করলে আর চোরের জীবনী আলোচনা কর্লে আস্তে আস্তে নিজের অজ্ঞাতসারে চোর হ'য়ে যায়। সতী নারী অসতী নারীদের সঙ্গ কর্লে বা অসতীর চরিত্র-চর্চ্চা কর্লে আস্তে আস্তে নিজ সতীত্বের বন্ধনকে শিথিল ক'রে দিতে বাধ্য হয়। ডাকাতের সঙ্গ করলে আর ডাকাতদের জীবন নিয়ে আলোচনা কর্লে, সাধারণ ভীরু প্রকৃতির মানুষও আস্তে আস্তে দুঃসাহসী ও দুষ্প্রবৃত্তি-সম্পন্ন হয়। এভাবে ভক্তের সঙ্গ কর্লে এবং ভক্তদের চরিত্র-চর্চ্চা কর্লে অভক্তেরও আস্তে আস্তে ভক্ত হবার পথ সুগম হয়।

ভক্ত ও জ্ঞানী

প্রশ্ন হইল,—ভক্ত হওয়া ভাল, না জ্ঞানী হওয়া ভাল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুটোই ভাল। জ্ঞান ছাড়া ভক্তি হয় না, ভক্তি ছাড়া জ্ঞান হয় না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে, দুধ ভাল, না মিছরি ভাল, আমি বল্‌ব দুধও ভাল,

মিছরিও ভাল, তবে পরিমাণ মত একটার সঙ্গে আর একটা মিশিয়ে নিতে পার্লে সব চেয়ে চমৎকার।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পারস্পরিক আমদানী

প্রশ্ন হইল,—জ্ঞানীরা ভক্তদের বলেন,—ন্যাকা, ভক্তেরা জ্ঞানীদের বলেন—নিষ্ফল। এই বিষয়ে আমাদের কি সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিষ্ফল তিক্ত হ'তে পারে কিন্তু উপকারী নয় কি? প্রয়োজনীয় নয় কি? একজন জ্ঞানীর চোখে ভক্তের অশ্রু, ক্রন্দন, নর্ত্তন অনাবশ্যক ব'লে মনে হ'তে পারে কিন্তু যেটা যার পক্ষে স্বাভাবিক, সেটা তার হবেই। হাজার বক্তৃতা দিয়েও কেউ মৃদঙ্গ-করতালকে এদেশ থেকে নির্ব্বাসন দিতে পার্ব্বে না। বরং এক সময়ে এই দেশের মৃদঙ্গ-করতাল-নর্ত্তন-কুর্দ্দন-অশ্রুবর্ষণ এদেশ থেকে সুদূর সাগরের ওপারেও রপ্তানি হ'য়ে যেতে পারে। পাশ্চাত্যের মূল্যবোধকে আমরা লৌহকপাট তৈরী ক'রেও এদেশে আসা থেকে নিবৃত্ত কত্তে পার্ব্ব না, বরং বল্‌তে হচ্ছে যে ইংরাজের দেড়শ পৌনে দুইশ বৎসর রাজত্বকালে পাশ্চাত্য প্রচুর পরিমাণে এদেশে প্রবেশ করেছে। এমনকি, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রভৃতি যুগন্ধর পুরুষেরাও পাশ্চাত্যের কিছু কিছু চিন্তা সানন্দে

গ্রহণ করেছেন। সাম্যবাদ এই ভারতেও ছিল কিন্তু নূতন আমদানীটা পাশ্চাত্য থেকে। অবতারবাদ ত' সাম্যবাদেরই একটা অতি প্রাচীন ও অতীব সম্ভ্রান্ত সংস্করণ মাত্র।

অবতারবাদ ও সাম্যবাদ

রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—অবতার-বাদ আর সাম্যবাদ এক বস্তু? এটা ত' একটা আশ্চর্য্য কথা হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবতারবাদ আর সাম্যবাদ যে একটা টাকারই দুটো দিক্, একথা মানতেই হচ্ছে। অবতারবাদের মূল কথা, ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসতে পারেন। তিনি বুদ্ধ হোন্, খ্রীষ্ট হোন্, কৃষ্ণ হোন বা গৌরাঙ্গ হোন। অবতারবাদ মানুষের মূল্য বাড়িয়ে তাকে ঈশ্বরের সমান ক'রে দিল। সাম্যবাদ এক মানুষকে অপর শ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে কারো চেয়ে হেয় ব'লে স্বীকার কত্তে কুণ্ঠিত। এখানেও সাধারণ মানুষের দাম আশ্চর্য্য রকম ভাবে বেড়ে গেল। দুটারই চূড়ান্ত ফল মানুষের মূল্যবৃদ্ধি, মানুষের ইজ্জৎ-বৃদ্ধি। সাম্যবাদী মানুষদের মধ্যে কে একটু বেশী বড়, কে একটু বেশী ছোট, এ নিয়ে তর্ক থাক্‌তে পারে কিন্তু কেউ যে ছোট নয়, এটা সর্ব্বজন-স্বীকার্য্য। অবতারদের ভিতরে কে হচ্ছেন দশ আনা অবতার, কে বা বারো আনা, কে বা ষোল আনা, তৎপরে কে আবার আঠারো আনা, এই নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু কারো ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে কোনো তর্ক নেই।

পূজার্চ্চনার সফলতা

রায় সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—আমরা যে পূজার্চ্চনাদি ক'রে থাকি তা ঠিক হচ্ছে কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পূজার্চ্চনা তোমাদের ঠিক হচ্ছে কিনা, তার নির্ণায়ক তোমার নিজের মন। অধিকাংশ পূজাই ত' তোমাদের এক প্রকারের মারফতী ব্যাপার। পয়সা কড়ি দিয়ে পূজারি বা পুরুত নিয়োগ কর, নিজে পূজা কর না, কাজটা পুরুতেরা করেন। তোমাদের পূজা হ'ল কিনা, তা হয়ত পুরুতও বল্‌তে পার্ব্বেন না। পুরুত যখন মন্দিরে ব'সে পূজা করেন, তখন তোমরা ত' দর্শক মাত্র। কারো কারো মন তখন হয়ত ভগবানে লগ্ন হয়। তারা ঘন্টা না নাড়লেও তাদের পূজা হয়ই হয়। পূজার্চ্চনার সফলতা হচ্ছে তোমার মনটির অবস্থা নিয়ে। মনটী লগ্ন হ'ল ত' আসল কাজ হ'য়ে গেল। কার কি পন্থা, কার কি উপায় ওটা বাহ্য ব্যাপার মাত্র। মনটী যদি তৃপ্তিতে ভ'রে যায়, তবে জান্‌বে তোমার পূজা ঠিকই হয়েছে।

বিবর্ত্তন ও ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলন

অপরাহ্ণে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দ্বিতীয় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— গৌরবময় অতীতকে ভবিষ্যতের দিকে বিসর্পিত কর। অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমান

উজ্জ্বলতর হবে, বর্ত্তমান অপেক্ষাও ভবিষ্যৎ ততোধিক উজ্জ্বল হবে, এটাই ত' সৃষ্টিকর্ত্তার বিশেষ অভিপ্রায় ব'লে বুঝা যায়, তাঁর প্রবর্ত্তিত বিবর্ত্তনের নিয়মের ভিতরে। তুচ্ছ বস্তু একদা মহৎ হয়, এরই ত' নাম বিবর্ত্তন। যাকে অনুবীক্ষণেও ধরা মুস্কিল ছিল, তাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র গ্রাহ্য ক'রে তুলেছে ত' বিবর্ত্তনের নিয়মাবলি। ক্ষুদ্রতম প্রাণবিন্দুটীর প্রাণ-চাঞ্চল্য আপাতত উপেক্ষণীয় মনে হ'লেও এটা থেকেই ত' বিশ্বের আশ্চর্য্যতম প্রতিভার দীপ্তি একদা বেরিয়ে আস্‌তে বাধ্য হচ্ছে, এখন তা দশ লক্ষ বৎসর পরেই হোক্ বা লক্ষ কোটি শতাব্দী পরেই হোক। বর্ত্তমান তুচ্ছতার ভিতরেই যে ভবিষ্যতের অকল্পনীয় সম্ভাবনাসমূহ লুক্কায়িত আছে, এটা ত' এক অত্যাশ্চর্য্য সত্য। কিন্তু বহুকাল প্রাণীর অজ্ঞাতসারে এই বিবর্ত্তন-ক্রিয়াটী হয়ে আস্‌ছে, আজ জ্ঞানবান্ চক্ষুষ্মান্ ধীমান্ মানব-সন্তানেরা দাবী কচ্ছে যে, আমাদের জ্ঞাতসারে এই বিবর্ত্তন সুনির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হবে যেন আজকের সাধারণ মানুষদের ঘরে কালক্রমে দেবমানবেরা আবির্ভূত হ'তে পারেন। এই চিন্তাটাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট আন্দোলনে রূপদান করার চেষ্টাই হচ্ছে আমার চরিত্র-গঠন-আন্দোলন বা ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার-চেষ্টা। সমগ্র মানবজাতির সামূহিক অভ্যুৎকর্ষ বিধানের দিকে লক্ষ্য রেখে এই আন্দোলনকে চালিয়ে যেতে হবে এবং পৃথিবীর সকল দেশের সর্ব্বভাষাভাষী সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ী

সর্ব্বমতানুসারী পুরুষ ও নারীকে এর অংশীদার ক'রে নিতে হবে। কারণ, এ প্রয়াস নির্দ্দিষ্ট একটী জাতি বা সমাজকেই মাত্র উন্নীত করার জন্য নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় মানুষের জন্য।

কৌমার-জীবন আত্মগঠনের

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্রিমিকীটের মতন এক মিনিটে বিশ হাজার ডিম্ব প্রসবই মানবীর জন্মের সার্থকতা নয়, কুকুরের মত বহু কুক্কুরীর সঙ্গসুখে একটার পর একটাতে উপরত হওয়াই পুরুষের পুরুষত্ব নয়। মানবত্ব বা পুরুষত্ব তাদের দেবত্বেরই একটা অংশ, যেই অংশটা সম্পর্কে সর্ব্বসাধারণ অচেতন ব'লে জনবিরল অরণ্য দশ বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অক্ষম, দুর্ব্বল, ক্লীব ও কাপুরুষ নবজাতকদের দ্বারা পূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটা বড়ই ঘৃণ্য, যদিও শিশুমাত্রকেই আদর ক'রে বুকে না তুলে কোনো পিতামাতা পারে না। যাদের জন্মলাভের প্রয়োজন ছিল না, তাদেরও অকালে এই ধরাধামে আমন্ত্রণ ক'রে কেবল পিতামাতারই স্বাস্থ্যহানি ও অবস্থাসঙ্কট ঘটছে, তা নয়। এই শিশুগুলিকেও অনশন, অপুষ্টি, ব্যাধি এবং অকালমৃত্যুর শিকার ক'রে তোলা হচ্ছে। মরণ-রূপী মার্জ্জার মহানন্দে কচিশিশুরূপী ইঁদুর ছানাগুলিকে খপ্ খপ্ ক'রে ধরছে আর

অক্লেশে গিলে খাচ্ছে। এই দৃশ্য চখের উপরে দেখতে পেয়েও যে পিতামাতার দল সতর্ক হয় না, এটাও কি কম আশ্চর্য্যের কথা? সবাই হয়ত ভাবছে, অকালে মরতে হয় তো পরের শিশুরাই মরবে, আমার শিশুরা নয়। ফলে বেপরোয়া দুঃসাহসে মানবমানবীরা ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চা কচ্ছে এবং নিজ নিজ ক্ষুদ্র কুটীরকে এক একটা চিরস্থায়ী সূতিকাগৃহে পরিণত কচ্ছে। এই অবস্থার প্রতীকার চাই। অধঃপতিত গার্হস্থ্য আজ একবার কল্পনা ক'রেও দেখতে চেষ্টা কচ্ছে না যে, বিবাহের আগেই ভাবী বর ও ভাবী বধূর নিজ নিজ কৌমারাবস্থায় আত্মগঠনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ নেওয়া উচিত ছিল। কুমার-জীবন বা কুমারী-জীবন গার্হস্থ্য জীবনেরই উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ। কৌমার-জীবনে যারা সংযমের সাধনা শুরু করে, গার্হস্থ্য জীবনে তারা অতি সহজে রিপুর তাড়নায় কাবু হ'য়ে পড়ে না। কৌমার-জীবন আত্মগঠনেরই জীবন।

কুমার-কুমারীদের প্রতি কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ শত শত মানুষের প্রয়োজন, যাঁরা কুমার ও কুমারীদের অন্তর স্পর্শ ক'রে নিরন্তর তাদের শুনাতে পার্ব্বেন,—ভবিষ্যৎ জীবনে সকল সংগ্রামে জয়ী হবার প্রয়োজনে আজ তোমরা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে শাসন-বন্ধনে বাঁধবার অনুশীলনে লাগ। আজ তোমরা প্রতিজনে ভাবী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে কাজে লাগাবার

যোগ্য হবার জন্য, হাতের মুঠার ভিতরে যে অল্প কয়েকটা বৎসর আছে, তাকে আগে কাজে লাগাও। চঞ্চল কল্পনা, চঞ্চল বচন-বিলাস, চঞ্চল আচরণ থেকে নিজেদিগকে দূরে রাখ। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার মুখে যত তুমি থাকবে ধীর এবং স্থির, জীবনের প্রকৃত সংগ্রামে দেখা যাবে যে তত তুমি বীর ও বিজয়ী। প্রচণ্ড পিপাসার মুখে এক গ্লাস সরবৎ নিঃশেষে পান ক'রে দিলেই কেউ কি সত্যিকারের তৃপ্তিকে পায়? সে ত' নিতান্তই ক্ষণিক এক তৃপ্তি, যা সঙ্গে সঙ্গে পিপাসাকে আরও ক'রে তোলে উদ্দীপ্ত। প্রবল তৃষ্ণার মুখে যে একটুখানি থেমে যেতে পারে, যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে অল্প অল্প ক'রে সরবৎ পান করে, তার তৃপ্তি ঐ একটী গ্লাসেই পুরাপুরি এসে যায়, বারংবার পিপাসা মেটাবার জন্য সে হন্যে হ'য়ে গ্লাসের পর গ্লাস চাটে না। কুমার-কুমারীদিগকে আজ নির্ভয়ে এবং নির্লজ্জ হয়ে সেই কথাগুলি স্পষ্ট ক'রে বলে দেওয়া দরকার, যে কথাগুলি বলা প্রয়োজন ব'লে সবাই জানছে এবং বুঝছে কিন্তু-জেনে বুঝেও কিছু বলছে না। সিনেমার মাধ্যমে এই কথাগুলি নিশ্চয় বলা যেত, কিন্তু পয়সার কাঙাল ছবি-নির্ম্মাতারা ঠিক তার উল্‌টোটা প্রচার ক'রে দেশের যুবক-যুবতীদের মেরুদণ্ডে প্রাণক্ষয়ী যক্ষ্মারোগ সংক্রামিত ক'রে দিচ্ছে। কুমার-কুমারীদিগকে সৎশিক্ষা দেবার রাস্তা আজ খুঁজে বের কর্ত্তেই হবে।

বক্তৃতা আড়াই ঘন্টাকাল চলিল।

ব্রাহ্মণপাড়িয়া
২৩শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৪৩
(৩রা মে, ১৯৩৬)

প্রকৃত কর্ম্মী

প্রাতে পাঁচ ঘটিকায় উলচাপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় আসিলেন। বলিলেন, গত দুই দিনের বক্তৃতা আমি শুনেছি। আমার আফশোস হয়েছে যে, আমার স্বগ্রাম আলাদাযুদপুরের এবং আত্মীয়-গ্রাম উলচাপাড়ার লোকেরা কেন দলে দলে সভাস্থলে এল না। এজন্য কাল আর পরশু আমি অন্য কাজ ফেলে রেখে এই দুই গ্রামে ও আশে পাশের আরও আট দশটী গ্রামে ঘুরে ঘুরে ঘরে ঘরে খবর দিয়েছি যেন তারা পরবর্ত্তী বক্তৃতাগুলি কেউ না হারায়।

শ্রীশ্রীবাবামণি * জিজ্ঞাসিলেন,—তোমাকে একাজ কর্ত্তে কেউ কি উপদেশ দিয়েছিল?

শ্রীযুক্ত নীলমোহন ঘোষ বলিলেন,—না, তা কেউ দেয় নি, দেবার কথা কেউ ভাবেও নি। ইনি নিজের গরজে এই সুন্দর কাজটুকু ক'রে এসেছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রকৃত কর্ম্মীরা নিজেদের যোগ্য কাজ ঠিক সময় মত নিজেরাই খুঁজে বের ক'রে নেন। অন্যে এসে উপদেশ দেবে, পরামর্শ দেবে, আদেশ দেবে বা প্রেরণা দেবে, তারপরে কাজ কর্ব্বেন, এজন্য তাঁরা বসে থাকেন না।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র তলাপাত্র বলিলেন,—বড়ই গ্রীষ্ম পড়েছে। জনতা এত অধিক হচ্ছে যে, এত বড় মাঠেও ঠেলাঠেলি ক'রে লোককে বসতে বা দাঁড়াতে হচ্ছে। এজন্য আমি কালীবাড়ী-কমিটির তত্ত্বাবধায়কদের বলেছি, আজ থেকে যেন পিপাসার্ত্তকে জল দেবার ব্যবস্থা থাকে। তাঁরা রাজি হয়েছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি সোল্লাসে হাসিয়া বলিলেন,—এটাও ঐ একই কথা হল। খাঁটি কর্ম্মীরা অন্যের নির্দ্দেশের অপেক্ষা না ক'রেই করণীয় কাজ চিনে নেন এবং সময় বৃথা নষ্ট না ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে কাজে হাত দেন।

কর্ম্মীর সম্বল ধৈর্য্য

বেলা সাড়ে দশ ঘটিকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া আদালতের দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত সোমনাথ চক্রবর্ত্তী আসিলেন। বলিলেন,—আপনার কালকের বক্তৃতা একটী revelation বা সুপ্ত চেতনার পুনর্জ্জাগরণ। সমস্ত দেশ যদি আজ আপনার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এই একটী কথাই বল্‌ত! সমস্ত জাতি যদি আজ আপনার অন্তরের সঙ্গে অন্তর মিলিয়ে এই একই কথা ভাব্‌ত!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজ না বলুক, হয়ত ভবিষ্যতে কখনো বল্‌বে। আজ না ভাবুক, হয়ত ভবিষ্যতে কখনো ভাব্‌বে। কর্ম্মীর চাই ভবিষ্যতের উপরে অটল আস্থা। আজ ত' চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, দশ দিশিতে শুধুই হতাশা

এবং অজ্ঞানতা। কাল এরূপ নাও থাকতে পারে। ধৈর্য্য ধরতে হবে। ধৈর্য্যই কর্ম্মীর আশ্রয়, ধৈর্য্যই কর্ম্মীর সম্বল। সত্য সত্য যারা কাজ করে, তাদের সমগ্র জীবন জীর্ণ ভেলায় সমুদ্র পার হবার চেষ্টা কত্তে হয়।

অদ্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তৃতীয় বক্তৃতাটী হইল। বক্তৃতা আড়াই ঘন্টাকাল চলিল। বক্তৃতার কোনও নোট রাখা যায় নাই। জনতা কল্পনাতীত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২১শে বৈশাখ, সোমবার, ১৩৪৩

(৪ঠা মে, ১৯৩৬)

দীক্ষাগ্রহণের বাধ্যবাধকতা কি কি

একটী যুবক আসিয়া প্রশ্ন করিল,—আমি যদি আপনার নিকটে দীক্ষা নিতে চাই, দিবেন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসিলেন,— কেন দীক্ষা নেবে? দীক্ষার প্রয়োজনটা কি?

প্রশ্নকর্ত্তা।—অনেকেই নাকি আপনার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করে এবং আপনিও নাকি কাউকে কাউকে দেন। কাউকে কাউকে দেন না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজনের তৃষ্ণা পায় নি, তবু জল খেতে চাইল। দিয়ে কি লাভ? একটা মেয়ে অন্য

একজনকে ভালবাসে, কিন্তু তোমার সঙ্গে বিয়ে বসতে চায়। এই মেয়েকে বিয়ে কর্ব্বে? কেউ এসেছে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তোমাকে বিয়ে কর্ত্তে, তুমি এমন বৌ ঘরে নেবে? একটা লোক চোর, পরস্বাপহারী, লম্পট,— তোমার ঘর পাহারার জন্য তাকে রাখবে? —এই রকম নানা কারণেই বহু লোককে দীক্ষাদান চলে না। তবে, দীক্ষা নিলে তোমাকে সাধন কর্ত্তেই হবে, এটা কিন্তু বাধ্যকর। এই নিয়মের ব্যতিক্রম চল্‌বে না। চতুরতা ক'রেই দীক্ষা নাও, চালাকি করেই দীক্ষা নাও, গুরু পরীক্ষার জন্যই দীক্ষা নাও আর লোক দেখাবার জন্যই দীক্ষা নাও, একবার দীক্ষা নিয়েছ ত' তোমাকে প্রদর্শিত পথে সাধনা ক'রে দেখ্‌তেই হবে।

দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধন ত্যাগের অধিকার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীর্ঘকাল অথবা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধন কর্ত্তে কর্ত্তেও যদি তুমি উন্নতির পথে না চড়, যদি এই নির্দ্দিষ্ট ঢংয়ে সাধন করার ফলে তোমার নৈতিক অধোগতি ঘটে, যদি এই একই দীক্ষাপ্রাপ্ত পথের পথিকরা সবাই কুলোক, কুসঙ্গী, কদর্য্যকর্ম্মপরায়ণ ব'লে প্রমাণিত হয়, তবে তুমি নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা মতন এই দীক্ষার অনাদর ক'রে অন্যতর, ভিন্নতর, উৎকৃষ্টতর,

মহত্তর পথে নামবার চেষ্টা কর্ত্তে পার। তোমার এই স্বাধীনতাকে কেউ ক্ষুণ্ণ কর্ত্তে এলে তার কথা মেনো না।

ধরা আর ছাড়া

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে একটা ছেড়ে আর একটা ধরা এবং যেটাকে পরে এসে ধরলে, তাকেই আবার ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় আর একটী পন্থার আশ্রয় নেওয়া আর নষ্টকুলী সাজায় তফাৎ নেই। এমন লজ্জাকর আচরণ কেউ কখনো ক'রো না। আমার কাছে দীক্ষা নেবার আগেই হাজার বার চিন্তা ক'রে দেখো যে, কোনো কারণে এই দীক্ষা পরিত্যাগ কর্ত্তে হবে না ত'? বিয়ে করার অনেক আগেই যেমন ভেবে দেখ্‌তে হয় যে, এই বিবাহের পরিণাম আবার Divorce (বিবাহ-বিচ্ছেদ) হবে না ত'? যেখানে বিবাহ বাতিল করার প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা দেখবে, সেখানে বিবাহের রুচি রাখা মারাত্মক ভুল। যে জমি পরের হাতে নিশ্চিতই চলে যাবে, সেই জমিতে দালান-কোঠা পাকাবাড়ী তৈরী করার মত বেহিসাবি কাজ আর কি আছে?

গুরুতা-রূপ ব্যবসায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুতা যখন ব্যবসায়ে পরিণত হয়, তখন যে-কোনো প্রকারে যে-কোনো মানুষকে দীক্ষা

একটা দিয়ে দিবার বাতিক জন্মে যায়। তখন অনেক চতুর ব্যবসায়ী কথাবার্ত্তায়, আচার-আচরণে, প্রচার-বিচারে, উপদেশে ও বিজ্ঞাপনে এমন আশ্চর্য্য বিশেষত্ব প্রকাশ করেন যে, কলিযুগে ইনিই একমাত্র লোকত্রাতা মহাপুরুষ, এই খ্যাতি যেন রটে যায়। ফলে শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই একেবারে অকূল সাগরে পড়ে যায়। দু-দশটা একনিষ্ঠ ও ভক্তিমান্ শিষ্য নির্ব্বিচারে গুরুর নির্দ্দেশ পালন কত্তে কত্তে এমন এক লোভনীয় উন্নত অবস্থায় পৌঁছেন, যা দেখে সন্দিগ্ধপ্রাণ অপর শিষ্যেরা অবাক্ হ'য়ে ভাবে, এমন কণ্টকে এমন পুষ্প বিকশিত হ'ল কি ক'রে? তখন তারা চুপ্ মেরে যায় এবং অন্যান্যদের জয়-জয়-ধ্বনির পিছনে পিছনে নীরবে নিঃশব্দে দুঃখময় পথ অতি ক্লেশে অতিবাহন করে। হুজুগে দীক্ষা নেওয়ার এইটাই কুফল।

মুক্তি

মেড্ডা গ্রাম-নিবাসী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ-দর্শন করিতে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুক্তি কাহাকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সরল কথায় মুক্তি বলতে বন্ধন থেকে মুক্তি বুঝায়। সুতরাং আগে দেখতে হবে যে, আমাদের কার কি বন্ধন আছে। যে বন্ধন আমাদের ক্লেশ জন্মায়, আমরা তা থেকেই মুক্তি চাই, যে বন্ধন ক্লেশ জন্মায় না, তা

থেকে মুক্তি কেউ প্রার্থনা করে না। বন্ধন ছাড়া জীবন নেই, জীবন মানেই চুক্তি এবং চুক্তি-পালন। যে চুক্তি আমাদিগকে আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই চুক্তি বন্ধন সৃষ্টি কর্লেও অনভিপ্রেত হয় না। এই মূলসূত্র থেকে মুক্তির ব্যাখ্যা কত্তে হবে। এক এক জনের মনের ও চিত্তবৃত্তির গড়নের উপরে মুক্তির প্রকার-ভেদ হতে পারে। এই জন্যই প্রেতপূজক প্রেতের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেলেই মুক্ত হ'ল ব'লে মনে করে, দেবপূজক স্বর্গে বাস কত্তে পার্লেই মুক্ত হ'ল ব'লে মনে করে, কৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হ'তে পার্লেই মুক্তি হ'ল ব'লে জ্ঞান করে। ব্রহ্মসাধক ব্রহ্মের সহিত অভেদ একাত্ম হ'তে পার্লেই ঐ অবস্থাটাকে মুক্তি মনে করে। তুমি কি রকম মুক্তি চাও, তাই বল।

মুক্তির পথ

রায় সাহেব বলিলেন,—আমি আসল মুক্তি চাই, নকল মুক্তি দিয়ে আমার কাজ নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বেশ ত'! গুরুর কাছে যদি কোনো উপদেশ পেয়ে থাক, তবে তদনুযায়ী কাজ ক'রে যেতে থাক। কাজ কত্তে কত্তে ঠিক পথ মিলে যাবে। আসল মুক্তি যে কি জিনিষ, তা ভাষায় ব্যাখ্যা করার আগে ভাষাসমূহের আরও অনেক উন্নতি ঘটা দরকার। আসল বস্তুকে ব্যাখ্যা করবার ব্যাপারে বর্ত্তমান শব্দাবলীর ক্ষমতা

একেবারেই পঙ্গু বা অসম্পূর্ণ। কাজ ক'রে যাও এবং যা জানবার ও বুঝবার, প্রত্যক্ষ ভাবে জেনে বুঝে নাও। কোনও গুরুর উপদেশ যদি না পেয়ে থাক, তবে ভগবানকেই গুরু-রূপে বরণ ক'রে তাঁর প্রদত্ত নির্দ্দেশ অন্তরে উপলব্ধি কর্ব্বার চেষ্টা কর। ব্যাকুল প্রার্থনা জানাতে থাক্‌লে সময় মতন তিনি তাঁর নির্দ্দেশ তোমার অন্তরে জাগ্রত ক'রে দেবেন। আসল মুক্তি কি আর নকল মুক্তিই বা কি, তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা বা গবেষণা করার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজের চারদিকের বন্ধনগুলি কি, তার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের স্পর্শ যতটা সম্ভব অতিক্রম ক'রে চল্‌বার চেষ্টা কত্তে কত্তে ভগবৎ-সাধন কত্তে হবে। কাকে কিসে আট্‌কাচ্ছে, কার পক্ষে কি বিরাট পথ-বাধা হ'য়ে রয়েছে, তা সে নিজে যেমন জানে, অন্য কেউ তেমন জান্‌তে পারে না। এজন্য, নিজের Stock-taking এর প্রয়োজনে নিজের অন্তরের দিকেই তাকাতে হবে। এই বিষয়ে পরনির্ভরতা প্রায় মূল্যহীন বা অবান্তর। বাইরের লোক কি ক'রে বুঝ্‌বে যে, তোমার আসক্তি কোথায় কোথায় জড় ছড়িয়ে রেখেছে অথবা আসক্তির মূলটী কি। তুমি নিজে তা বুঝতে পারবে। বুঝবার জন্য সাধারণ ভাবে চেষ্টা কল্লেই ঠিক্ বুঝা যাবে না। সাধনপথে অগ্রসর হ'তে হ'তে এই আত্মানুসন্ধান নির্লিপ্ত মনে অনাসক্ত দৃষ্টিতে ক'রে যাওয়া চাই।

দীর্ঘকাল আলোচনার পরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে রায় সাহেব বিদায় লইলেন।

দ্বিপ্রহর আড়াই ঘটিকার সময়ে মেড্ডা হইতে রায় সাহেবের সহধর্ম্মিণী আসিলেন শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীচরণ-দর্শন করিতে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবামণি, আমাদের কর্ত্তাকে আপনি কি উপদেশ দিয়েছিলেন? এত হৃষ্ট, এত সন্তুষ্ট, এত তৃপ্ত তাঁকে আমি অনেক দিনের ভিতরেও দেখি নাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাগো, মুক্তির বারতা বলেছি। তবে তোমার তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মুক্তি তোমাদের দুজনের একই সঙ্গে হবে। একজন দিব্যানন্দে বাস কর্ব্বে, আর একজন দাবদাহ সহ্য কর্ব্বে, এটা হবে না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চতুর্থ বক্তৃতা

অপরাহ্ণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চতুর্থ বক্তৃতাটী হইল। আজও লোকে লোকারণ্য। দিনের পর দিন কেবল শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতেছে। আনন্দময়ী কালীবাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিতেছেন যে, স্থানীয় অন্নদা হাইস্কুলের খেলার মাঠে সভাটী স্থানান্তরিত করা হইবে কি না। স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী বর্দ্ধন বলিলেন,— সেই চেষ্টা তিনি করিবেন। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুণ মহকুমাহাকিম অনুমতি দিবেন কিনা, একথাও অনেকে ভাবিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি

বলিলেন,—স্থান পরিবর্ত্তনের দরকার নাই।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২২শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩

(৫ই মে, ১৯৩৬)

নারীনৃত্য

প্রাতে বেশ কতক্ষণ হরিওঁ কীর্ত্তন হইল। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের পত্নী শ্রীমতী অবলা ঘোষ মৃদঙ্গ বাজাইলেন। মৃদঙ্গ-বাদনের দক্ষতা সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিল। কীর্ত্তন-শেষে একজন প্রশ্ন করিলেন,—মেয়েলোকদের কি মৃদঙ্গ-বাদন উচিত?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনুচিত হবার ত' কারণ দেখি না! যিনি মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন, তাঁর অন্তরের ভাব ভক্তিরসাপ্লুত। তাঁকে মৃদঙ্গ-বাদন-রতা অবস্থায় দেখ্‌লে দর্শকের মনেও ভক্তি ভাবেরই উদ্রেক হয়। সুতরাং এটা অন্যায় হবে কেন? যার ফলে পুরুষদের মনে কলুষিত কামনার উত্তেজনা আসতে পারে, নারীদের তেমন আচরণই নিন্দনীয় এবং বর্জ্জনীয়। আমি যে মহাপ্রতিভাধর বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত নারী-নৃত্য আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরোধিতা ক'রে অধিকাংশ স্থানেই বক্তৃতা ক'রে আসছি বা এসেছি, তার ত' প্রধান যুক্তিটা এই। শিল্পের চর্চ্চা কত্তে হয় কর, কিন্তু পুরুষ-পতঙ্গকে অগ্নিদগ্ধ করার জন্য যেন তা না হয়। নারী-

জীবনের নিজস্ব পবিত্রতার দিকে তাকিয়ে এবং তাদের অন্তরে বিমল শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই আমার প্রতিবাদ। আমি অন্ধ নই। শিল্পের শিল্পত্ব আমি বুঝতে পারি কিন্তু বাড়াবাড়ির আনুষঙ্গিক কুফলকে আমি অস্বীকার করি কি ক'রে? ধনলোভে নৃত্য, যশোলোভে নৃত্য, সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ও দেহভঙ্গিমার প্রশংসার লোভে নৃত্য নিশ্চয়ই নারী-মহত্ত্বকে লঙ্ঘন ক'রে যাবে। পারদ যেমন একবার হাত থেকে খ'সে পড়্‌লে বিন্দু বিন্দু হ'য়ে সারা আঙ্গিনায় ছড়িয়ে পড়ে, নারীদের নৃত্য যদি পরিণামে নারীর মনকে নিয়ে সেই খেলা খেলে, তবে ক্ষতিটা কার বেশী হবে? দেশের কি নয়? নারীর অবরোধকারী পুরোণো কুসংস্কারের আমি দাস নই। আমি স্বাধীন ভাবেই চিন্তা কচ্ছি। একদিন নারীকে ট্যাক্‌সি, বাস, ট্রাম, রেলগাড়ী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের যান-বাহন চালাবার জন্য চালিকা রূপে নিযুক্ত হ'তে হবে, এ আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। একদিন এদেশের নারীও পুলিশের কাজ, সৈনিকের কাজ, এমনকি সেনাধ্যক্ষের কাজ কর্ব্বে, এটাও সুনিশ্চিত। সুতরাং নারীরা নৃত্য কচ্ছে ব'লে আমার দিক্ থেকে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু নারী-নৃত্য-প্রচলন-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশহিতকামী সেবাব্রতী কত যুবকের মনে বাসনার তরঙ্গ উত্তাল হ'য়ে উঠ্‌ছে, সেটা কি উপেক্ষার?

একজন প্রশ্ন করিল,—আজ কি তাহ'লে এই বিষয় নিয়ে সভাস্থলে বলবেন নাকি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না। অধিকাংশ শ্রোতাই ত' আসছেন গ্রামাঞ্চল থেকে। এটা এখনো তাঁদের প্রগ্রাম নয়। নারীনৃত্য-প্রবর্ত্তনের জন্য যাঁরা দিব্য প্রতিভা আর অসামান্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে খেটে মরছেন, তাঁদের কণ্ঠ গ্রাম্য জনসাধারণের কাণে এখনো বলতে গেলে পৌঁছোয় নি।

ব্রহ্মচর্য্য মৃতসঞ্জীবনী

অদ্য অপরাহ্ণে আনন্দময়ী কালীবাড়ীর প্রাঙ্গণেই শ্রীশ্রীবাবামণির পঞ্চম বক্তৃতাটী হইল। তিনি বলিলেন,—মেড্ডার শ্মশানে গিয়েছিলাম মড়াদের দেখ্‌তে। দেখ্‌তে সত্যই পেলাম। দেখ্‌লাম চারিদিকে ছড়ানো অনেকগুলি মড়ার খুলি। তাদের জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম,—ভাই তোমরা কি আমাকে কিছু বল্‌তে চাও? একথা বল্‌তে বল্‌তে আমি যেন ভাবস্থ হ'য়ে গেলাম। অনেকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে কাট্‌ল। হঠাৎ শুনলাম, সহস্র সহস্র মৃতের আত্মা যেন সমস্বরে আমাকে ব'লে উঠ্‌ল,—ওরে আমরা আবার বাঁচতে চাই। আমরা চাই রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সমন্বিত পৃথিবীর বুকে জন্ম নিতে। আমরা অতীতে যে পূর্ণতা আহরণ কত্তে পারিনি বা চাই নি, তাই আবার চেষ্টা ক'রে আমাদের পেতে হবে। জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম,—তোমরা ত' মৃত। তোমাদের বাঁচাব কি ক'রে? সকলে সমস্বরে ব'লে উঠ্‌ল,—ব্রহ্মচর্যই সেই মৃত-সঞ্জীবনী সুধা, যা পান কর্ল্লে আমরা পুনরায় এই সুধাপায়ী নরনারীদের ঘরে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আবির্ভূত হবো।

এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি, ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে তিনঘন্টাকাল ব্যাপিয়া তাঁহার পঞ্চম ভাষণটী শেষ করিলেন। উৎকর্ণ জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৩শে বৈশাখ, বুধবার,১৩৪৩
(৬ই মে, ১৯৩৬)

আনন্দময়ী কালীবাড়ীর নাট-মন্দিরের ছায়ায় যৌগিক আসনমুদ্রা শিক্ষাদানের ক্লাস বসিয়াছে। একজন ব্রহ্মচারী সব দেখাইয়া দিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি স্বয়ং পরিদর্শন ও আদেশদান করিতেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যুবক-সমাজের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি খুবই অন্তরের জন, ইহারা অনেকেই শ্রীশ্রীবাবামণিকে বহুবার দেখিয়াছেন। আসন-শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় একশত হইবে।

আসন-মুদ্রার উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসন-মুদ্রার দুইটী উদ্দেশ্য। এক, শরীরকে নিয়ত কর্ম্মক্ষম রাখা। দুই, মনকে সহজে একাগ্র করার আনুকূল্য বিধান। আসনমুদ্রা ঘন্টার পর ঘন্টা অভ্যাস কত্তে হয় না, প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুই দশ বা বিশ মিনিট অভ্যাস কর্ল্লেই যথেষ্ট।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ষষ্ঠ বক্তৃতাটী হইল। বক্তৃতা আড়াই ঘন্টা চলিল।

গোঁসাইপুর
২৫শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৪৩
(৮ই মে, ১৯৩৬)

পিতামাতার আশীর্ব্বাদ

২৪শে বৈশাখ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে সপ্তম বক্তৃতাটি দান করিয়া অদ্যই বেলা দশটায় নৌকাযোগে শ্রীশ্রীবাবামণি গোসাইপুর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়ের বাড়ীতে আসিয়াছেন। গ্রামের একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়া নিজ সংসারের হাল বর্ণনা করিয়া অভিযোগ করিলেন যে, পুত্র তাঁহার কথা শোনে না, পিতৃবাক্য অবজ্ঞা করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন একটা দিন অতি দ্রুত এসে যাচ্ছে, যখন পুত্রকন্যারা পিতামাতার বাঞ্ছিত ধন না হ'য়ে অবাঞ্ছিত আপদ হ'য়ে দাঁড়াবে। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ লিখলেন আমাদিগকে কর্ত্তব্য শেখাবার জন্য, পিতার প্রতি, মাতার প্রতি, ভ্রাতার প্রতি। কিন্তু পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্পর্কে তিনি খুব উচ্চরবে কিছু বলেছেন কিনা, মনে নাই। এই যুগে পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যই প্রধান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং অন্য সকলের প্রতি কর্ত্তব্যকে গিলে ফেলেছে। সুতরাং দুঃখ ক'রে লাভ কি? সহিষ্ণু অন্তরে, ক্ষমাশীল হ'য়ে, সস্নেহ মনে পুত্রকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করুন। কারণ, পিতামাতার আশীর্ব্বাদ সন্তানের সমগ্র জীবন জুড়েই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

স্বামি-পরিত্যক্তার প্রতি

আর একজন একটী স্বামি-পরিত্যক্তা সৎস্বভাবের রমণী সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পতি-পরিত্যক্তা রমণী হিন্দুর সমাজে বড়ই অনাদরে বাস করে। কি কারণে স্বামী তাকে পরিত্যাগ কর্ল্, তা সম্পূর্ণ জানা থাকলেও লজ্জাশীলা ও ভদ্রস্বভাব পত্নীরা সে কথা জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করে না। কিন্তু এই সকল নারীর প্রতি সমাজের নিশ্চয়ই সুনির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য রয়েছে। তাকে আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হ'তে সাহায্য কর্ত্তে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এমন ভাবে আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা স্থাপন কারো উচিত নয়, যার ফলে এই নারী সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোনো সন্দেহসূচক মন্দ মনোভাবের উদয় হ'তে পারে। মা, মাসী, দিদি, বোন্, মেয়ে প্রভৃতি নানা সম্বোধনে আত্মীয়তা করা আমাদের দেশের স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু রীতিকে রীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেওয়া উচিত। তাকে অবলম্বন ক'রে আবার আসক্তির বন্ধন যাতে সৃষ্ট না হয়, এতটা অনাসক্ত প্রত্যেককেই থাকতে হবে। প্রত্যেককে কথাটার মানে ঐ পতিপরিত্যক্তা মেয়েটীকে এবং তার হিতসম্পাদনে ইচ্ছুক পুরুষকে। মেয়েদের প্রতি সাহায্য যে স্থলে মেয়েদের মাধ্যমেই করা চলে, সে স্থলে পুরুষদের সোজাসুজি গিয়ে কোনও

সাহায্য হাজির করা ঠিক নয়। অবশ্য, এমন দিন সম্মুখেই আস্‌ছে, যেদিন নারী ও পুরুষের ব্যবধান-জ্ঞান ও ব্যবধান-রীতির ব্যাপক পরিবর্ত্তন হবেই হবে। পৃথিবীর নানা দেশে যা যা ঘট্‌ছে, ভারতবর্ষে তার ব্যতিক্রম হবেই না ব'লে জেদ করার কোনো অর্থ নেই। ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সর্ব্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকতে হবে। তথাপি, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এমন কতকগুলি বদ্ধমূল সদাচার আছে, যা কোনো ক্রমেই লঙ্ঘিত হ'তে পারে না। লঙ্ঘিত হ'লে বরং বিপদ আস্‌বে। স্ত্রী-পুরুষ একই মাঠে হয়ত খেল্‌বে, একই মঞ্চে হয়ত অভিনয় কর্ব্বে কিন্তু একই শয়নাগারে কদাচ শোবে না। এই জাতীয় বিধিনিষেধ হয়ত প্রবর্ত্তিত হবে। দৈহিক পবিত্রতা এবং মানসিক শুচিতার দিকে লক্ষ্য দিয়ে সমাজ নিজেই নিজের বিধান তৈরী ক'রে নেবে। অনেক আজগুবি কল্পনা আমরা অনেক সময়ে করেই থাকি, যার কতকটা ফল্‌বে, কতকটা ফল্‌বে না,— এই কথা জানা সত্ত্বেও আমরা স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণের ব্যাপারে কড়া কড়া নিষেধ দিয়ে যাবই যাব। কারণ, বর্ত্তমানে দেশ, সমাজ ও জাতির যা অবস্থা, তাতে উচ্ছৃঙ্খলতার যা পরোক্ষ ভাবে উত্তেজক, এমন কোনও ব্যবস্থাকে আমরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারি না বা বিনা যুদ্ধে স্বীকার কর্ব্ব না।

নারী ও পুরুষের ব্যবধান-জ্ঞান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পরে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান-জ্ঞানটা আমৃত্যু থাকা সত্যই আবশ্যক। নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য-বোধ-জনিত জ্ঞান একের প্রতি অপরকে যৌন কর্ত্তব্যে ও যৌন অকর্ত্তব্যে সজাগ রাখে। যেখানে যৌন আকর্ষণ প্রবল হবার সম্ভাবনা, সেখানে প্রবলতর সংযমের বোধকে স্থাপন কত্তে হয়। সংযম আছে বলেই ত' সমাজ আছে, সংযম চলে গেলে ত' মানুষ এক অসামাজিক জন্তুতে পরিণত হবে। সুতরাং স্ত্রীলোক ও পুরুষদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহারের আদান-প্রদানকে সর্ব্বজনসুখকর সর্ব্বজীবহিতকর রাখার জন্যই সামাজিক যত শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা। এই কথাটি ভুলে না গিয়ে প্রত্যেককে ভাবী মানবজাতির অভ্যুদয়ের বিষয় ভেবে কাজ কত্তে হবে। যেখানে পুরুষ-মাত্রেই লোলুপ নেক্‌ড়ে বাঘ, সেখানে স্বামি-পরিত্যক্তা মেয়ের নিরাপত্তা সম্ভাবনা কোথায়? অথচ চিরকাল একদল মূর্খ বিবাহ করার পরে স্ত্রীত্যাগ কর্ব্বেই। সুতরাং দেখাদেখি কিছু কিছু স্ত্রীলোকও বিবাহ করার পরে স্বামিত্যাগ কর্ব্বে। ত্যাগ করার হয়ত তাদের বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণ থাক্‌তে পারে বা থাকবে, কিন্তু এই সম্ভাবনাটী থেকে সমাজ মুক্ত হ'তে পারবে না। এই সকল অবস্থায় যে যে নারী একাকিনী

হ'য়ে পড়বে, সসম্ভ্রমে সসম্মানে সমাজমধ্যে উঁচু মাথায় বিচরণ করার সুযোগ তাদের দিতে হবে। এই জায়গাতেই এই কথাটা আসে যে, নারীর অধিকতর স্বাধীনতার প্রয়োজন সত্যই আছে।

নারীর হাতে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীরাই যদি দেশ শাসন করে, তা হ'লে পুরুষদের ত' ভেড়ার পালে পরিণত হ'য়ে থাকতে হবে। স্থল বিশেষে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে খুবই বিরল ছিল এবং বিরল হবে। নারী যদি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে জগদ্বাসীকে শাসন করে, তবে সে তা কর্ব্বে তার মনুষ্যত্বের বলে, নারীত্বের বলে নয়। নারী শুধু নারী হিসাবে খুবই দুর্ব্বল। তার সম্মোহিনী শক্তির সীমা স্বল্পদূরগত পরিধি পর্য্যন্তই ব্যাপ্ত। তার দৌড় খুব দূরে নয়। নারী যখন পরমা শক্তির অংশস্বরূপিণী তখন সে জগতের যে-কোনও দুঃসাধ্য কর্ম্ম অনায়াসে সম্পাদন কত্তে সমর্থ হয়।

নারীমাত্রে মহাশক্তি-ভাবনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নারীমাত্রে মহাশক্তি-ভাবনা ভারতবর্ষের এক আদি ও অকৃত্রিম আবিষ্কার। রোমান ক্যাথলিকরা যে মাতা মেরীকে পরমোপাস্য জ্ঞান করে, এটাও মহাশক্তিরই পূজা। এই পূজা যেখানে মানুষের মনে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমার মতে সেখানেই প্রকৃত মানুষের অস্তিত্ব। প্রকৃত মানুষের কাছে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান থাক্‌লেও নারীর প্রতি সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার অকুলান নেই। সে যখন দুঃস্থা রমণীকে সাহায্য কত্তে যায়, তখন সে ঐ নারীতে তার নিজের মাকেই দেখে। এই ভাবটী যখন সর্ব্বজনীন হবে, তখন পতি-পরিত্যক্তা দুঃখিনীর বা অকালবৈধব্য-পীড়িতা দুর্ভাগিনীর অবাধ বিচরণে কোনো অসুবিধা বা আশঙ্কার কারণ থাক্‌বে না।

পুরুষোত্তম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুরুষ ও নারী মাত্রেই যদি ভুলে যায় যে, সে পুরুষ বা সে নারী, তাহ'লে এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে। এই অবস্থা এলে একমাত্র ভগবদিচ্ছাতে দুনিয়ার সব কাজ হবে। কিন্তু এই অবস্থা সর্ব্বজনীন ভাবে আশা এক অবাস্তব কল্পনা। ব্যক্তিগত ভাবে এই অবস্থা এলে সংশিষ্ট মানুষগুলি পুরুষোত্তম হয়ে যেতে পারে। এটা নিশ্চয়ই কাম্য।

ব্রহ্মস্বরূপতায় দৃষ্টি দাও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্ত্রী-পুরুষ- ভেদবুদ্ধি বিবর্জ্জিত মানুষের দল আবির্ভূত হওয়া মানব-সভ্যতার জীবনে একটা নূতন উত্তরণ। কিন্তু জাতি-ভেদ-বোধ-বর্জ্জিত মানুষ সৃষ্ট

হওয়া সেই তুলনায় সহজতর। সব মানুষ এক জাতি হ'তে পারে যদি সবাই শূদ্র-স্বভাব হয়। সব মানুষ এক হ'তে পারে যদি সবাই ব্রাহ্মণ-স্বভাব হয়। বংশ-লব্ধ উপাধি-বর্জ্জিত মানুষেরা কয়েক প্রজন্ম পর নিজেদিগকে একটা জাতি ব'লে মনে করতেও পারে। প্রাক্তন নাম ও উপাধি বর্জ্জনের ফলে নব-দীক্ষিত মুসলমানদের একেবারে বিস্মরণ হ'য়ে গেছে যে, তাঁদের পূর্ব্বপুরুষরা কে ছিলেন। এতে জাতিভেদ বিলুপ্ত হোল। কিন্তু একদল যখন বল্‌ছেন—আমরা সৈয়দ, আর ওরা হচ্ছে আন্‌সার, আমরা শেখ আর ওরা হচ্ছে মিঞা ইত্যাদি, তখন মনে খট্‌কা জাগে যে, জাতিভেদ তো বিলুপ্ত হোল, কিন্তু ভেদ-বোধটা বিলুপ্ত হোল কি? সুতরাং মনুষ্য-মাত্রেই পরমেশ্বরের প্রতিনিধি এবং ব্রহ্মস্বরূপ, এই বোধটিকে জাগ্রত করাই হচ্ছে অভিপ্রায় পূরণের শ্রেষ্ঠ উপায়। তার দিকে সবাই নজর দাও। তার ফলে যখন যা মঙ্গলকর, তখন তা তোমাদের জীবনে ঘটবে।

গোঁসাইপুর

২৬শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪৩

(৯ই মে, ১৯৩৬)

স্ত্রী-পুরুষে একত্র মিলিয়া সমবেত উপাসনা

এই গ্রামে সমবেত উপাসনা করিবার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট

স্থান আছে। সেই স্থানে স্ত্রী-পুরুষে একত্রে মিলিয়া উপাসনা হয়। এই বিবরণ শুনিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শহরে বা যেসব স্থানে ধর্ম্মীয় প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে স্ত্রী-পুরুষের একত্র সমাগম প্রচলিত আছে, সেই সকল স্থানে পুরুষদের মধ্যে মহিলাদের এবং মহিলাদের মধ্যে পুরুষদের সমাগম নিষিদ্ধ নয়। তবে সম্ভব হ'লে নারীরা সকলে ডানদিকে এবং পুরুষেরা সকলে বামদিকে বসবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ এটা সর্ব্বত্র প্রচলিত সদাচার। তবে যাতায়াতের রাস্তার উপরে বা পার্শ্বে মেয়েদের স্থান হওয়া উচিত নয়। নানা সম্প্রদায়ে যুক্তভাবে যে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ-মিলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান হ'য়ে থাকে, তার সঙ্গে আমাদের মিল নেই। যে সব অঞ্চলে ঐ সকল সম্প্রদায়ের নামে প্রচরিত অপধর্ম্মচর্চ্চা হয়ে থাকে, তার প্রতি আমাদের কোনও সমর্থনও নেই। ঐ সব অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে কার কি আধ্যাত্মিক লাভ হ'য়ে থাকে, তা আমাদের পক্ষে অনুমান করা শক্ত। কিন্তু তার ফলে দেশ ও সমাজের যে ক্ষতি হয়, এটা অবধারিত। ঐ সকল চর্চ্চা যে অঞ্চলে বহুল প্রচলিত, সেই সমস্ত অঞ্চলে তোমরা তোমাদের পুরুষদের সমবেত-উপাসনা এবং মহিলাদের সমবেত-উপাসনা আলাদা আলাদা ক'রে ক'রো। কারণ, ধর্ম্মের নামে বা ধর্ম্মের ছদ্মবেশে ব্যভিচার বড় মারাত্মক ভাবে সংক্রামক।

গোঁসাইপুর
২৭শে বৈশাখ, রবিবার, ১৩৪৩
(১০ই মে, ১৯৩৬)

গোঁসাইপুরের বক্তৃতা

দুপুরের পরে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। নানা কারণে গোঁসাইপুরের বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ নিদারুণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আপাদমস্তক-সিক্ত হইয়াও সমাগত নরনারী উৎকর্ণ হইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ কোনও প্রকারে এই বক্তৃতার বিস্তারিত রিপোর্ট কলিকাতার ইংরাজি দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা এবং অ্যাড্ভান্সে সম্ভবতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং খুব সম্ভবত ভারতের হিতৈষী বিদেশীয়দের দ্বারা মহাসমাদরে পঠিত হইয়াছিল। কারণ, "Naedof" লিখিত এক বিবরণে জানা যায় যে, স্বামী স্বরূপানন্দের প্রচারের দৃষ্টান্ত তুলিয়া জনৈক ভারতহিতৈষী বিদেশী বিদেশের কোনও সিনেমাহলের দ্বারদেশে এই তর্কের জবাব দিতেছিলেন যে, ভারত ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মকে সমর্থন সহ্য করে না।

ধর্ম্মচর্চ্চায় অসংযম

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন,—ধর্ম্মের নামে

ব্যভিচারাদি অধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়চর্চ্চা কি ভাবে নানা দেশে আবির্ভূত হ'ল, তা নিয়ে পণ্ডিতগণের মতভেদ থাক্তে পারে কিন্তু কোনও যুক্তিপরায়ণ ব্যক্তিই কদাচ স্বীকার কর্বেন না যে, ধর্ম্মের নাম ক'রে ব্যভিচার ভাল, ঈশ্বরপূজনের নাম ক'রে ইন্দ্রিয়ের পূজা শ্রদ্ধেয় বা ভগবৎসাধনার নাম ক'রে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা সভ্য মানবের উপযুক্ত। প্রজনন-শক্তিকে আদিযুগ থেকেই মানুষেরা খুব সম্ভ্রম, ভয়, বিস্ময়, চমৎকারিত্ব ও কৌতূহল সহকারে দেখে এসেছে। কিন্তু নরনারীর যেই জাতীয় মিলনের ফলে শারীরিক সুখোৎপাদন হয় বা সন্তানের জন্ম ঘটে, তার সম্পর্কে কিছু কিছু রহস্য জানবার পরেই মানুষের সমাজ এই ব্যাপারে বিশেষ সচেতন হ'য়ে যায় এবং সমাজমধ্যে লজ্জাশীলতার প্রবর্ত্তন ঘটে। তার পর থেকে ধর্ম্মকে ইন্দ্রিয়সেবা থেকে মানুষ চিরকাল দূরে রেখে এসেছে। নানা কৌলিক আচারের ভিতরে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার প্রশ্রয় দেখা গেলেও সভ্য মানুষ বহুযুগ আগেই জেনেছে যে, ধর্ম্মকে ইন্দ্রিয়সেবার উর্দ্ধে নিয়ে যেতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ঠিক এই রকম একটী বস্তু। রসেশ্বর কৃষ্ণ কামেশ্বরও বটেন কিন্তু তাঁতে যে রতি, তার মধ্যে কামের গন্ধ-মাত্রও নাই। রতিকে কামগন্ধহীন করার অধ্যবসায়ই বৈষ্ণব সাধকের সমগ্র জীবনের তপস্যা।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কতকগুলি কামাতুর ছাগছাগীর ধর্ম্ম নয় সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমের নাম ক'রে ব্যভিচার করার কারো অধিকার নেই।

তান্ত্রিক-ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তান্ত্রিক-ধর্ম্ম নরনারীর সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার ধর্ম্ম। পুরুষ পরমকল্যাণদায়ী নির্ব্বিকার শিব, নারী সর্ব্বশক্তিদাত্রী মহাশক্তির উৎস। এর ভিতরেও কামচর্চ্চার কোনো প্রয়োজন নেই, অবসর নেই। ধর্ম্মচর্চ্চার মধ্যে যাঁরা কামচর্চ্চাকে এনে প্রবিষ্ট কচ্ছেন, দেশের শত্রু ব'লে তাঁদের জ্ঞান কর্ব্বে। ধর্ম্ম চিরকালই ধর্ম্ম, ধর্ম্মের মধ্যে কদাচ পাপ প্রবেশ কর্ব্বে না।

বক্তৃতা তিন ঘন্টাকাল চলিল। কখনো অল্প অল্প ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি, কখনো মুষলধারে বর্ষণ। ইহারই মধ্যে ভিজিয়া ভিজিয়া সকলে বক্তৃতা শুনিলেন। মধ্যপথে সামান্য সময়ের জন্য অতি বর্ষণকালে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া সকলকে প্রাঙ্গণ হইতে সরিয়া গৃহাশ্রয়েও যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি শ্রোতাদের শুনিবার আগ্রহ কমে নাই। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছিল যে, বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সকলেই ধর্ম্ম হইতে ব্যভিচারকে নির্ব্বাসন দিবার পক্ষপাতী ছিলেন।*

ধর্ম্মের জন্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মের সৃষ্টি মানুষের মনের

* এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ "সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

আদিম-কালীন ভয় থেকে, এই যে একটা কথা চলিত আছে, তা আংশিক ভাবে সত্য। কিন্তু কিসের সেই ভয়? ভয় কামের উৎপীড়নের, ভয় ক্রোধের বিস্ফোরণের, ভয় লোভের তৃপ্তিহীন লালায়নের, ভয় মোহজনিত অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের, ভয় গর্ব্ব-জনিত আত্মবিস্মৃতির, ভয় মাৎসর্য্য-জনিত ইতর মনোবৃত্তির। মানুষ যে মুহূর্ত্তে জানল যে, তার শক্তি আছে কিন্তু সেই শক্তি সীমাহীন নয়, যে মুহূর্ত্তে সে বুঝল যে, তার যেটুকু শক্তি আছে, মাত্র সেইটুকুর সম্বলে সে অজ্ঞেয় অজ্ঞাত অনিশ্চিত ভবসমুদ্র পাড়ি দিতে সমর্থ নয়, তখনি তার মনে উদয় হ'ল এই ধারণার যে, নিশ্চয়ই এমন কেউ আছেন, যাঁর উপরে নির্ভর কর্লে, যাঁর কৃপাবলে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গও জয় করা যাবে, উত্তাল সমুদ্রের অগণিত উর্ম্মিমালাকেও ভেদ ক'রে কোনও সুনিশ্চিত লক্ষ্যে সুনিশ্চিত মনে পৌঁছা যাবে। সেই অতীন্দ্রিয় সহায়তালাভের জন্য মানুষের মন ব্যগ্র হ'ল, ধর্ম্মের তখন জন্ম হ'ল।

ধর্ম্মের প্রকৃত মেরুদণ্ড

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাম, ক্রোধ আদি রিপুগণকে মানুষ সাধারণ বুদ্ধির বলে বা যুক্তির বলে অবদমিত রাখতে সমর্থ নয় ব'লেই তাকে পরমমহেশ্বরের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। সেই পরমমহেশ্বরকে যে যেই নামেই ডাকো না কেন,

তিনি প্রত্যেকের মনের কথা শুনতে পান। সব দেশের সকল ভাষা তিনি বোঝেন। তাঁকে কেউ কখনো ফাঁকি দিতে পারেন না। তাই, ধর্ম্মচর্চ্চার প্রথম কথাটাই হ'ল বিশ্বাস এবং পবিত্রতা। পৃথিবীর সব কালের সব ধর্ম্মই বিশ্বাস আর পবিত্রতাকে প্রধান অবলম্বন ক'রে নিয়েছে। সেই ধর্ম্মের নাম ক'রে তোমরা নিজ নিজ দেহ ও মনকে ব্যভিচারে অপবিত্র ও কলঙ্কিত কর্ব্বে, এটা পরমেশ্বর কদাচ অনুমোদন কত্তে পারেন না। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অবিশ্বাসকে বাড়ায়, বিশ্বাসকে নষ্ট করে। এক শেয়ালের লাঙ্গুল কাটা গেলে সে যেমন অন্য শেয়ালদের লাঙ্গুল কাটবার পরামর্শ দিতে গিয়েছিল, ধর্ম্ম নিয়ে ব্যভিচারকারী ব্যক্তির আচরণও তদ্রূপ। সে মনে মনে জানে যে পরস্ত্রী-সঙ্গম বা পরপুরুষ-সহবাস কর্লে কদাচ কুশল হয় না, কিন্তু তামসিক লোকদের দলে টানার পক্ষে এমন চমৎকার কৌশল আর কিছু নেই। সুতরাং সে তার সাংসারিক স্বার্থে দুনিয়ার মানুষকে ডেকে এনে ব্যভিচারে দীক্ষিত কচ্ছে, ব্যাপক অনাচারের মূল কথাটা হচ্ছে মাত্র এই। তোমরা এই সকল অপবিত্র আহ্বানে কেউ সাড়া দিও না। মনে রেখো, ধর্ম্মের প্রকৃত মেরুদণ্ড হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসের মূল শিকড় হচ্ছে পবিত্রতা, পবিত্রতা দেহে, পবিত্রতা মনে, পবিত্রতা চিন্তায়, পবিত্রতা আচরণে, পবিত্রতা উদ্দেশ্যে এবং পবিত্রতা যাবতীয় অবলম্বিত উপায়ে।

অন্ধ গুরুভক্তির কুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কোনো ধর্ম্মসঙ্ঘে যোগদানের ফলে তোমার মনের পবিত্রতা, রুচির পবিত্রতা, চেষ্টার পবিত্রতা, ভাষার পবিত্রতা বা অন্য যে-কোনও ব্যাপারে পবিত্রতা আস্তে আস্তে যেন ক'মে আসছে, এই রকম যদি কখনো দেখো, তবে তৎক্ষণাৎ সেই ধর্ম্মসঙ্ঘ ত্যাগ কর্বে। উপদেষ্টারা নিজ নিজ জীবনের দৃষ্টান্তে যদি অপবিত্রতাকে করেন প্রদর্শন, তবে তাঁদের কাছ থেকে হাজার যোজন দূরে স'রে দাঁড়াবে। একটী নারীরও সতীত্ব বা মর্য্যাদা, একটী পুরুষেরও চরিত্র বা সততা যদি কারো সাহচর্য্যে নষ্ট হ'য়ে থাকে, তবে জান্‌বে যে, ধর্ম্মজগতে তিনি একেবারেই অস্পৃশ্য। জোর ক'রে বা কৌশল ক'রে কেউ একদিন তোমাকে একটা মন্ত্র তোমার কাণের কুহরে গুঁজে দিয়েছিলেন ব'লেই তুমি তাঁর অন্যায়, অযৌক্তিক, অধার্ম্মিক উপদেশও পালন কর্বে, এমন অন্ধত্ব যেন তোমার কদাচ না হয়। দীক্ষা একটা দিয়েছেন ব'লেই কেউ তোমার তালুক কিনে রাখেন নি বা তোমার মাথা কেটে ফেলার অধিকার পান নি। ধর্ম্ম ব'লে যারা ব্যভিচার করে, তাদের অন্ধ গুরু-ভক্তিই তাদের সর্ব্বনাশ সাধন কচ্ছে। তোমার আচরণ এমন হোক্, যেন তোমার গুরু চিরকাল গুরুত্বের গৌরবে উজ্জ্বল থাকেন, হীন কার্য্য যেন তাঁকে লঘু না করে।

স্বাভাবিক কামাচার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যতকাল পৃথিবীতে পুরুষ জাতি এবং নারী জাতি ব'লে দুইটা জাতির সৃষ্টি হবে, ততকালই সৃষ্টি-রক্ষার প্রয়োজনে বা স্বাভাবিক ভাবাবেগের চরিতার্থতা বিধানের জন্য স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কামাচার থাক্‌বে। কিন্তু কামাবেগকে প্রশমিত রেখে কামাচারের ঊর্দ্ধে নিজেদিগকে টেনে নিয়ে চলতে সমর্থ হওয়ার মতন যোগ্য মহামানবও নিশ্চিতই থাক্‌বেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগের গ্রীসে প্লটিনাসের শিষ্য পরফিরি এই রকম মানুষ ছিলেন। লিখিত দলিল পুরাতত্ত্বজ্ঞদের হস্তগত হয়েছে, যাতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরফিরি সস্ত্রীক দাম্পত্য সংযম পালন করার সামর্থ্য দেখিয়ে গিয়েছেন। আধুনিক ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এর এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। চারদিকে জানাজানি না থাক্‌লেও ময়মনসিংহের অধ্যাপক অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বরিশালের জননেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত যে নিজ নিজ জীবনে দাম্পত্য সংযমের সদ্দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত কত্তে সমর্থ হয়েছেন, একথা অতীব অন্তরঙ্গ-সমাজে অজ্ঞাত নয়। দাম্পত্য সংযম এমনই একটা ব্রত, যা পালন কত্তে হ'লে গোপনতা বা মন্ত্রগুপ্তি একটা অত্যাবশ্যকীয় অলঙ্ঘনীয় সর্ত্ত হয়। যেখানে মানুষের কামাচার প্রয়োজন, সেখানে সে তা স্বামিস্ত্রীতে করুক, আমাদের সভ্যতার অভিমান, ধর্ম্মজ্ঞান বা কোনও বিরুদ্ধ

সংস্কার বা আশঙ্কা সেখানে বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে কামাচার অত্যাবশ্যক ব'লে অনুভূত হয়েছে ব'লেই তাকে ধর্ম্মের মুখস প'রে তবে তা কত্তে হবে এবং তা আবার কত্তে হবে তারই সঙ্গে মিলে, যে তার স্ত্রী নয় বা যে তার স্বামী নয়,—এটা বড়ই জঘন্য ব্যাপার। স্বাভাবিক কামের ভিতরে দিব্য ভাবের সঞ্চরণের জন্য কেউ সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম স্মরণ কত্তে থাক্‌বে, এটা অস্বাভাবিকও নয়, অনুচিতও নয় কিন্তু কামোপভোগ কত্তে হবে ব'লেই তার সঙ্গে ঘটা ক'রে নানা প্রকারের ধর্ম্মীয় মুখসের সমাগম সুলভ কত্তে হবে, এটা গুরু-নামধারী ব্যাধবর্গের চালাকি মাত্র। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা কর। যে যতটা পার, স্বভাবের পথে চল। যে যতটা পার, কাম দমন ক'রে চল। যে রতি-সম্ভোগ-লালসাকে দমন ক'রে চল্‌তে একান্ত অক্ষম সে ভগবানের চরণে নিয়ত প্রার্থনা কত্তে কত্তে স্বামি-সম্ভোগ কর বা পত্নী-সম্ভোগ কর, কুবুদ্ধি পরিচালিত হ'য়ে আত্মাবনতিকর, আত্মাবমাননাকর, অতীব অনিষ্টজনক অপধর্ম্মের আশ্রয় নিও না।

ভারতীয়ত্ব ভুলিও না

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এশিয়া এবং য়ুরোপের নানা দেশে নানা সময়ে নানা রকমের মদনোৎসব প্রচলিত হয়েছে।

কিন্তু প্রায় সকল দেশই নবতর সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল আচরণ প্রকাশ্য জীবন থেকে একেবারে নির্ব্বাসিত করেছে। ভারতবর্ষেও লিঙ্গপূজা ছিল, কিন্তু আজ চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে দেখ, লক্ষ লক্ষ কুমারী লক্ষ লক্ষ বিধবা গৌরীপট্টের উপরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে পূজা কচ্ছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কাম-বিকার নেই। হয়ত একদা এই লিঙ্গ-পূজা প্রভৃতিকে আশ্রয় ক'রে এক প্রকারের অপধর্ম্ম ধর্ম্মের মুখোস প'রে জাতিকে প্রতারণা করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ভাবের দিক থেকে তাদের বিষদন্ত উৎপাটিত হ'য়ে গেছে সম্পূর্ণতঃ। তার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষ অতীব প্রাচীন কালেই ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের মূলদেশে স্থাপিত কত্তে সমর্থ হয়েছিল। তারই জন্য ভারতবাসীর সাধারণ যৌন জীবনে কদর্য্য কদাচার বা ঘৃণাকর বিলাস কিছুই নেই। সকল স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবনতি থেকে ভারতের অধিবাসী-দিগকে অনন্তকাল ধ'রে রক্ষা ক'রে যাবার জন্য প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে উদ্ভাবন করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্-বংশীয়দের অসামান্য উপকারার্থে তার কিছু কিছু নিজ নিজ জাজ্জ্বল্যমান জ্যোতির্ম্ময় জীবনের মধ্য দিয়ে রেখে গেছেন। সেই আদর্শ আমাদের অন্তরে পৃথিবীর সর্ব্বজাতির সম্পর্কে মৈত্রী-ভাবের সৃষ্টি করেছে। মৈত্রীভাব কামভাবের প্রশমক। হিংসা-দ্বেষে জর্জ্জরিত মনগুলি কামরিপুর সহজ শিকার।

ভারতীয়ত্বের এই বিশেষ নিদর্শনের কথা স্মরণ রেখে তোমরা প্রতিটি পদবিক্ষেপ কর। নিশ্চয়ই শ্রীভগবান্ তাঁর স্বরূপমূর্ত্তিতে তোমাদের ভিতরে জেগে উঠ্বেন।

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা লোকে যে কি আগ্রহ সহকারে শুনিল, তাহা বর্ণনা অসম্ভব। অদ্যকার সভার শ্রোতাদের মধ্যে একজনও যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন এই কথা বলিবার প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে তিনি থাকিবেন যে, স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ভয় কাহাকে বলে, তাহা জানেন না।

বক্তৃতান্তে একজন বিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন,— মহাশয়, আপনি কি জানেন না যে, আপনাকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করার জন্য হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজাধারীই অনেক লোক আছেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জানি ব'লেই ত' আমি নির্ভীক। সমাজকে জঞ্জালমুক্ত রাখার জন্য ঝাঁটার ব্যবহার কি অন্যায়? প্রত্যেকটী মেয়েকে আপনারা সর্ব্বদা এই শিক্ষা দিন যে, স্বামী ব্যতীত অন্যের সহবাস পাপ। প্রত্যেকটী পুরুষকে আপনারা এই শিক্ষা দিন যে, নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীতে উপরত হওয়া মহাপাপ। ঘরে ঘরে এই শিক্ষা দিন যে, বিবাহের পূর্ব্বে বীর্য্যধারণের চেষ্টা নিদারুণ হওয়া উচিত। আরও শিক্ষা দিন যে, বিবাহিত হওয়ার পরেও স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঐক্যযুক্ত মনোভাব স্থাপনের আবশ্যকতা ব্যতীত মৈথুন-

মিলন বর্জ্জন কত্তে হবে। ঘরে ঘরে আজ শিক্ষাদান করান যে, কর্ণ বা অর্জ্জুনের মত একটী পুত্র, সীতা বা সাবিত্রীর মত একটী কন্যাই সংসারের পক্ষে যথেষ্ট সামগ্রী। এর চেয়ে অধিক পুত্রকন্যা যাতে না হয়, তার জন্য প্রতিটী দম্পতীর জীবনব্যাপী সচেষ্টতা থাকা সঙ্গত। প্রাচীন কালের লোকেরা শত সন্তান, সহস্র সন্তান কামনা কত্তেন। সেটী সে যুগে প্রয়োজনীয় ছিল। আগাছা আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ শ্যামলা পৃথিবীর বুকে অরণ্যরাজির উচ্ছেদ সাধন ক'রে জনপদ তৈরী করার প্রয়োজনে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির আবশ্যকতা ছিল। আজ আর তা নেই। অদ্যকার দিনে সমস্যা এক বিপরীত রূপ ধারণ কত্তে চলেছে, এই সময়ে জনসংখ্যাও একটা সমস্যা। দুঃশাসনাদির মতন শত শত দুষ্কৃতিকারী সন্তানের জন্ম ও পালনের দায়িত্ব থেকে মানুষের অব্যাহতি পাওয়া প্রয়োজন। সময় থাক্‌তে যদি চেষ্টা আরম্ভ হয়, তবে একমাত্র সংযম-শক্তির বলে সেই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হ'তে পারে।

ইন্দ্রিয়-চর্চ্চীরা ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা করিবেই

একজন মন্তব্য করিলেন,—ইন্দ্রিয়চর্চ্চীরা ইন্দ্রিয়চর্চ্চা করিবেই। আপনাদের হিতোপদেশ কেহ কাণেও তুলিবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চোরেরা চুরি করবেই, তাই ব'লে আমি ঘরের দরজায় অর্গল বন্ধ কর্ব্ব না, এটা কি রকম কথা? ইন্দ্রিয়লিপ্সুরা ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা কর্ব্বেই ব'লে মানুষকে সংযমের পথে চালাবার জন্য আমরা কোনো চেষ্টাই কর্ব্ব না, সবাই একেবারে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন হ'য়ে যাব, এটা কখনো হতে পারে না। বরং একদল লোক অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চর্চ্চা ক'রে সমাজ-মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে ব'লেই ত' আমরা অন্য হাজার কর্ম্ম ফেলে রেখে সংযম-প্রচারে লেগে গেছি। একাজ আমি ত' আমৃত্যু ক'রে যাব। আমার পরে আর কেউ এই কাজটিতে হাত ছোঁয়াল কিনা, তার অনুসন্ধানও আমি কর্ব্ব না। আমার জীবৎকালেও আমার হাতে হাত কেউ মিলাল কিনা, আমার কণ্ঠে আর কারো কণ্ঠ সংযুক্ত হ'ল কিনা, তা নিয়েও আমার দুশ্চিন্তা নেই। ক্ষুদ্র আমি, তুচ্ছ আমি, কিন্তু আমার ভিতরেও পরমেশ্বর যে কণাপ্রমাণ শক্তিটুকু দিয়েছেন, তার সদ্ব্যবহারে আমি যে কখনো কৃপণ হইনি, এইটীই দেখা আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। হাজার গরু, কুকুর, মহিষ ও মানুষ যখন সদর রাস্তার উপরে ম'রে পড়ে থাকে, তখন স্বরূপানন্দের মত একটা ধাঙ্গড়ে আর কতটুকু সাফ কর্ব্বে? কিন্তু সে যে অলস ছিল না, সে যে প্রতি মুহূর্ত্তে কাজ কিছু না কিছু করেছে, এই আত্মপ্রসাদটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট প্রাপ্তি।

২৮শে বৈশাখ, সোমবার, ১৩৪৩
(১১ই মে, ১৯৩৬)

নৌকাযোগে প্রাতে ৫ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি গোঁসাইপুর ত্যাগ করিয়াছেন। বেলা নয়টার সময়ে শ্রীরামপুর পৌঁছিলেন। নৌকাঘাট হইতে গৃহস্বামীর গৃহ পর্য্যন্ত অভ্যর্থনা করিয়া নিবার জন্য একটি বিরাট শোভাযাত্র প্রস্তুত ছিল। সকলে হরিওঁ কীর্ত্তন শুরু করিলেন। কিন্তু নিদারুণ বৃষ্টিপাতে সবাই ভিজিয়া গেলেন। শোভাযাত্রাকারীদের নেতৃত্ব করিলেন গ্রামের উৎসাহী যুবক-কর্ম্মী শ্রীশশধর দত্ত।

শ্রীরামপুরের বক্তৃতা

বেলা এগারটায় শ্রীরামপুরে বক্তৃতা শুরু হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধক রামপ্রসাদ খেদ সহকারে গেয়ে গেছেন,—

"অমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ কর্‌লে ফল্‌ত সোনা,—
মন তুমি কৃষিকাজ জান না।"

বক্তৃতা দুই ঘন্টাকাল চলিল। জল ও কাদায় ভিজিয়া শত শত নরনারী ভাষণ শুনিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি ও বাত্যা কিছুতেই আমরা ভীত হইব না। কাজ আমরা করিয়াই যাইব।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অষ্টম বক্তৃতা

শ্রীরামপুরের বক্তৃতা সারিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রওনা হইলেন সেখানকার অষ্টম বক্তৃতাটী দিবার জন্য।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বক্তৃতামালার অদ্যই শেষ গ্রন্থিটি পড়িল। জনতার পারকূল ছিল না। সাধারণতই শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা শুনিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শ্রোতাদের কদাচ অনাগ্রহ নাই কিন্তু অদ্যকার সভাতে চারিদিকে বিশ পঁচিশটী গ্রাম হইতেও জনতার সমাবেশ হইয়াছে। নিঃস্তব্ধ নীরব জনতা তিন ঘন্টাকাল ধরিয়া সাগ্রহ-চিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। জলে ও কাদায় সভাস্থলের অবস্থা সঙ্গীন তথাপি সভা বন্ধ করা হইল না।

বলা, শোনা ও ধরিয়া রাখা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথা ত' অনেকদিন ধরেই ব'লে যাচ্ছি। কিন্তু আপনারা কথাগুলি সত্যি সত্যি শুন্‌তে পাচ্ছেন ত'? কাণের ভিতর দিয়ে কথা যদি প্রাণে না প্রবেশ করে, তবে সে কথা শোনার জন্য ভীড় করায় লাভ কি? বক্তা অযোগ্য, সুতরাং সে আশা করে না যে, কাণের ভিতর দিয়ে তার কথা মরমে মরমে সত্য সত্যই প্রবেশ কর্ব্বে। কিন্তু শ্রোতারও ধ'রে রাখবার ক্ষমতার প্রয়োজন। কথা বরং কমই হ'ল কিন্তু কথাগুলি কেউ অন্তরের অন্তরে ধ'রে রাখল কি?

বলা সহজ কিন্তু ধ'রে রাখা কঠিন। শোনাও সহজ কিন্তু ঐ ধ'রে রাখাটাই বিপজ্জনক দায়িত্ব। প্রাচীন ঋষিরা জেনেছিলেন যে, ব্রহ্মচর্য্য ধ'রে রাখবার ক্ষমতা দেয়। তাই তাঁরা ব্রহ্মচর্য্যকে সকল তপস্যার মূলদেশে স্থাপন করেছিলেন। সেই ঋষিদের পদাঙ্ক আমাদের অনুসরণ কত্তে হবে, সেই ঋষিদের আদেশ আমাদের প্রতিপালন কত্তে হবে। ব্রহ্মচর্য্যের মহতী শক্তিকে তাঁরা নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ ক'রে তবেই না উপদেশ দিয়েছিলেন,—বিদ্যার্থং ব্রহ্মচারী স্যাৎ, বিদ্বান্ যদি হতে চাও, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর। পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা এই উভয় বিদ্যার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের মূল ভিত্তি ক'রে নিয়ে পুরুষকার-প্রভাবে ভাবী জীবনের বিশাল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হও,— এই ছিল তাঁদের বাণী। সেই বাণী নূতন শ্রদ্ধা নিয়ে নূতন বোধি নিয়ে, নূতন আবেগ সহকারে আমাদের শুনতে হবে, পাল্‌তে হবে। ব্রহ্মচর্য্যের অপহ্নব-কারিণী নানা প্রকারের অপচেষ্টাকে পরাহত ক'রে যুগে যুগে ভারতের স্মৃতি, ধৃতি, বুদ্ধি, মেধা ও মনস্বিতা জগদ্বিজয়ের ক্ষমতা নিয়ে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হবে। এই বিশ্বাস আমাদের সুদৃঢ় হোক। পাশ্চাত্যের মরীচিকা দর্শনে আমরা যেন গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে না যাই।

বক্তৃতা সাড়ে তিন ঘন্টাকাল চলিল।

নবীনগর

২৯শে, বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩

(১২ই মে, ১৯৩৬)

প্রাতে সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি নবীনগরে পৌঁছিয়াছেন। আট ঘটিকায় কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে দুই ঘন্টাব্যাপী একটী ভাষণ হইল।

ঝালাইতে আসিয়াছি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি জ্বালাতন কত্তে আসিনি, এসেছি ঝালিয়ে দিতে। অনেক কথা অনেকবার তোমরা আমার মুখ থেকে শুনেছ। সেই একই কথা আমি বারংবার শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদের অন্তরে বদ্ধমূল ক'রে দিতে এসেছি। একটু স্মরণ ক'রে দেখ ত'; অতীতে কি কি কথা বলেছি? মনে আছে? বেশ, একবার স্মরণ কর, অতীতের ভালো কথাকে বারংবার স্মরণে লাভ আছে। লাভটা তোমার, আমার নয়। কিন্তু আত্মপ্রসাদ এতে তোমারও যেমন, আমারও তেমন। তোমার লাভ হ'লে তার ভাগ তুমি আমাকে নাও যদি দাও, তবু তা স্বভাবতই আমার। কারণ তোমাকে লাভবান্ করার জন্যই আমার জন্ম হয়েছে, আমার নিজের লাভের জন্য নয়। আমি যখন ম'রে যাব, তখনো তোমার লাভের জন্যই কাজ কত্তে কত্তে মর্ব্ব, এইটাই আমার আশা। অতীতের সব ভাল ভাল কথাগুলি যদি ভুলে গিয়ে থাক,

তবে এস, আমি একটার পর একটা ক'রে পুনরায় অন্যতর ভাষায় অন্যতর ভঙ্গীতে ব'লে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আর একবার যদি না আসি তারই জন্য তোমাদের কাছে এবার বিশেষ গরজ নিয়ে এসেছি। আত্মজয়ী হও, স্বাবলম্বী হও, সততাপরায়ণ হও। এইটুকুই তোমাদের জন্য আমার বাণী।

চরিত্রগঠনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন পূর্ব্বপাড়া শ্রীযুক্ত সদয়চন্দ্র সাহার গৃহে। আহারান্তে পুনরায় ছুটিলেন স্থানীয় হাইস্কুলে। এখানেও দেড় ঘন্টাব্যাপী একটি ভাষণ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চরিত্রগঠনের সাধনাই হচ্ছে জীবনের বনিয়াদ-গঠনের সাধনা। দেশ যখন চরিত্রবান্ নেতাদের দ্বারা চালিত হবে, তখন দেশের লোক অল্প ত্যাগে মহতী সমৃদ্ধি অর্জ্জন কত্তে সমর্থ হবে। দেশ যতদিন চরিত্রহীন ব্যক্তিদের ইচ্ছানুসারে চলতে বাধ্য হবে, ততদিন দেশের কোনও প্রকৃত মঙ্গল বা স্থায়ী কুশল সুপ্রতিষ্ঠিত হবার কোনো আশা নেই। আজ তোমার দুগ্ধপোষ্য বালক, কাল তোমরা দেশের অভিভাবক হবে, শিক্ষক, অধ্যাপক, নেতা ও ত্রাণকর্ত্তা হবে। তারই জন্য তোমাদের চরিত্রগঠনের বিশেষ আবশ্যকতা। কে হিন্দু, কে মুসলমান, ওটা বড় কথা নয়। কে কতখানি মানুষ, ওটাই আসল কথা। চরিত্রবান্ ব্যক্তিই প্রকৃত মানুষ। তোমরা চরিত্রবান্ হবার জন্য প্রতিজনে বদ্ধপরিকর হও।

বিকাল পাঁচটায় নৌকা ছাড়িয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পাঁচ সাত মাইল দূরবর্ত্তী কোনও একটী গ্রামে রওনা হইলেন। সেই গ্রামে পৌঁছিতে ঘন্টা তিনেক লাগিল।

উক্ত গ্রামে রাত্রি দশটার সময়ে কোনও এক উপধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান-সভা ছিল। স্ত্রী-পুরুষে প্রায় ষাট সত্তর জন সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠানাদি তখনও আরম্ভ হয় নাই।

ভগবল্লাভই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি গুরুবন্দনার স্তোত্রটী গম্ভীর স্বরে সুর-সহযোগে গাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—শুনেছি তোমরা সকলেই এখানে আজ বিশেষ কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান কত্তে এসেছ। আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। আমি তোমাদের কাজে বাধা দিতে বা তোমাদের কোনো অনিষ্ট কত্তে আসিনি। আমি জানি যে, তোমাদের অরুচিকর কোনো কথা বল্লে তোমরা আমার ক্ষমা কর্ব্বে না। আমি এখানে একাকী, একটি ব্রহ্মচারীও আমার সঙ্গে আসে নাই। আমার নৌকার মাঝিরা আমার অপরিচিত। সুতরাং আমার বন্ধুও নয়, শত্রুও নয়। তবে তোমাদের প্রতি তারা শত্রুভাবাপন্ন নয়। তারা পয়সা পেলেই নৌকা নিয়ে বিদায় হ'য়ে যাবে এবং এখানে আমি অসহায় অবস্থায় একাকী প'ড়ে থাক্ব। আমি নিজেকে

সম্পূর্ণ অসহায় ব'লে জানি ব'লেই পরমেশ্বরের অভয়-ক্রোড়ের আশ্রয় নিয়ে অকুতোভয়ে তোমাদের কাছে কয়েকটা কথা নিবেদন কচ্ছি। পল্লী-অঞ্চলের সরলবুদ্ধি সহজ প্রকৃতির সাধু-স্বভাব মানুষ তোমরা। তোমরা আমার কথাগুলি মন দিয়ে শুনো। ভগবল্লাভই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। সারাদিন সংসারের ধান্ধায় কাল কাটিয়ে, সংসার-মরুভূমির প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হ'য়ে হ'য়ে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন ক্ষণকালের জন্য ভগবানকে ডেকে প্রাণ শীতল করার জন্যই মানুষের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান। তোমরাও স্নিগ্ধ হ'তে চাও, শীতল হ'তে চাও। তার আসল উপায় কিন্তু সরল মনে অকপটে নিঃসংশয়িত চিত্তে ভগবানের নামের আশ্রয় নেওয়া। নাম কত্তে কোনো অস্বাভাবিক আচরণের প্রয়োজন নেই। নাম-সেবকের পক্ষে কোনও প্রকার ইন্দ্রিয়চেষ্টার আবশ্যকতা নেই। বরং নামসেবককে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা থেকে যতটা সম্ভব বিরতই থাক্‌তে হয়। এ সত্য সর্ব্বজনীন সত্য, এই সত্য সর্ব্বতোভদ্র সত্য, এ সত্য অবিনশ্বর সত্য। তোমরা এই সত্যের আশ্রয় থেকে যার নাম ক'রো, সিদ্ধি তোমাদের করামলকবৎ আয়ত্ত হবে।

এমন সময়ে হঠাৎ শ্রীযুক্ত হরিবল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সদয় চন্দ্র সাহা আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন,—চলুন বাবামণি, চলুন। আপনার উদ্দেশ্য আপনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সফল হয়েছে। যে গোস্বামী-প্রভু আজকের নৈশ

ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিচালন কর্ব্বেন ব'লে কথা ছিল, আমরা দুজন বেলা দুটার সময়েই তাঁর বাড়ী রওনা হয়েছিলাম। আপনার নাম শুনে তিনি এত ভীত হ'য়ে পড়্‌লেন যে, কোথায় যে পালালেন, তার হদিসই পেলাম না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার কাজ এখনো এখানে শেষ হয় নি। আমার বক্তব্যটুকু অতি সংক্ষেপে এই ভক্তিমান্ সরলবুদ্ধি মানুষগুলিকে শুনিয়ে যেতে চাই।

সংযমের মহিমা

শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—দেখ, মানুষ্যজন্ম বড় দুর্লভ জন্ম। এই জন্মটীকে ভুল পথে চালিয়ে আমরা নষ্ট কত্তে পারি না। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য ধর্ম্মের যা নির্দ্দেশ, তার গোড়ার কথা ইন্দ্রিয়-সংযম। ইন্দ্রিয়-বিলাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-সাধনে সিদ্ধি আসে না। যতই রম্য বিবরণ ও রমণীয় শব্দাবলির সহযোগে তোমাদের বুঝান হোক না যে, পরমেশ্বরকে তুষ্ট কত্তে হ'লে স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয়-ব্যবহার প্রয়োজন, জান্‌বে, সেগুলি সবই অশাস্ত্রীয় ও মিথ্যা প্রচারণা। সংযমই দেবত্ব, সংযমই ঋষিত্ব, সংযমই সর্ব্বসিদ্ধির সোপান। তোমরা কারো প্ররোচনাতেই কদাচ সংযম থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে কোনো কাজ ক'রো না। দেখ, তোমাদের কাজে আমার কোনো স্বার্থ সাধনের অবকাশ নাই। আমি নিঃস্বার্থ চিত্তে তোমাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমি নিঃস্বার্থ চিত্তেই তোমাদের বলছি যে, যে যেই ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথই গ্রহণ ক'রে থাকো, প্রাণপণে চেষ্টা কর, নাম সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সংযমী থাক্‌তে। অসংযমীর যজ্ঞীয় ঘৃতে কুক্কুরেরা রসনা স্পর্শ দিয়ে যায়, তার হোম ও আহুতি শুদ্ধ হয় না, নিষ্পাপ হয় না। গুরুদেবের আদেশেও যদি কেউ ব্যভিচার করে, তবে সেটী ব্যভিচার ছাড়া আর কিছু নয়, সেটা সতীত্ব নয়। গুরুদেবের সংসর্গেও যদি কারো চরিত্র যায়, তবে তা জীবনের কোনো মহিমা হবে না, সেটা চরিত্রহীনতাই হবে। যার সঙ্গে যার আজীবনের স্বামি-পত্নী সম্পর্ক নয়, তাদের মধ্যে ধর্ম্মের নামেও সঙ্গমাদি কাজ চলতে পারে না। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, ইহাই ভারতীয় জীবনের আদর্শ।

বক্তৃতা দুই ঘন্টাকাল চলিল। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি নৌকাযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরিলেন। শ্রীযুক্ত হরিবল ও শ্রীযুক্ত সদয় তাঁহার সঙ্গে রহিলেন। তাঁহারা বলিলেন,— বাবামণি, এমন দুঃসাহস আর করিবেন না। গোঁসাইরা আপনার প্রাণহানি কত্তেও কুণ্ঠিত হ'ত না।

২৯শে বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩

(১২ই মে, ১৯৩৬)

প্রাতে নৌকা আসিয়া পৌঁছিল আখাউড়া রেল-জংশনের নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীতে। পূর্ব্বাহ্ণেই সংবাদ দেওয়া ছিল যে,

অদ্য প্রাতে আট ঘটিকায় নিকটবর্ত্তী কোনও একটি প্রসিদ্ধ গ্রামে একটি বিশেষ জনসভা হইবে এবং তাহাতে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারের প্রতিবাদে নানারূপ ব্যাখ্যা ও যুক্তি প্রদর্শিত হইবে। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারকে সমর্থন করিবার যদি কাহারও সাহস থাকে, তবে তিনি যেন শাস্ত্রীয় পুথিপুস্তক প্রভৃতি লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত থাকেন।

ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার হয় কেন

আকাশ আজ খুবই পরিষ্কার এবং এই কারণে জনতার ভিড় অত্যধিক হইয়াছিল। গ্রামটীর নাম ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীশ্রীবাবামণি যথাকালে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,— কোনো কোনো গ্রামের কুখ্যাতি থাকে যে, এই গ্রামে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলে অথবা ব্যভিচার ক'রে লোকে তাকে ধর্ম্ম ব'লে ব্যাখ্যা দেয়। ব্যভিচারটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, তবু এমন বেপরোয়া ভাবে এবং পাইকারী হিসাবে ব্যভিচার কেন চলে, তার কারণ অনুসন্ধান নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সকল বিবাহিত নরনারীরাই ত' স্বাভাবিক ভাবে স্ত্রীসঙ্গম বা স্বামিসহবাস ক'রে থাকে। তা নিয়ে ত' কারো কোনো কথা বলার নেই। তবে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা

উভয়েরই স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়, এই কথাটা সত্য। কিন্তু স্বামীরা ও স্ত্রীরা নিজ নিজ জীবনে বৈধ ভোগসুখ আস্বাদনে আগ্রহী হ'লে, তার বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ করার কারণ থাকে না। স্ত্রী যেখানে সুলভ্যা, স্বামী যেখানে সুপ্রাপ্য, সেখানে পরনারী আর পরপুরুষের সংসর্গ-কামনা জাগাটা স্বাভাবিক নয়। তবু অনেকের জাগে। জাগে কৌতূহল থেকে। "আমার স্বামী ত এইরকম, আর একজনের স্বামীটী কি রকম রে? আমার স্ত্রী ত' এই রকম, আর একজনের স্ত্রী কি রকম রে।"—এই জাতীয় কৌতূহল অনেক লোকের মনে অনেক সময়ে জাগে। সুচতুর ধর্ম্মব্যবসায়ীরা এই কৌতূহলের চাহিদা মিটাবার জন্য রাধা-কৃষ্ণের দোহাই দিয়ে বা শিব-কালীর নাম ক'রে কিছু লোককে গোপন-সাধনার পথে টেনে আনে। হাট-বাজারের নিয়মই এই যে, কোনো জিনিষের চাহিদা থাক্‌লেই কেউ না কেউ তার সরবরাহের ভার নেয়। আবার এটিও সত্য যে, কোনও জিনিষের বেশী আমদানী হ'তে দেখ্‌লে কিছু কিছু বিলাসী চিত্ত তা সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করে। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারের উৎপত্তি এই ভাবেই হয়েছে।

ব্যভিচারের বিপত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্ম-ফর্ম্ম ছেড়ে দাও। অমনিতেই কত মানুষ ব্যভিচার কচ্ছে। তাদের এই অসামাজিক

আচরণের দরুণ সমাজমধ্যে যে অসুস্থতা, অস্থিরতা, দুঃখ, মর্ম্মদাহ ও অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে, তারই পারকূল নেই। তার উপরে ধর্ম্মের নামেও যদি ব্যভিচার চলতে থাকে, তবে মনুষ্য-সমাজ গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? কেউ কেউ যুক্তি দেন যে, ব্যভিচারটা যদি ধর্ম্মের নাম ক'রে হয়, তবে আস্তে আস্তে ব্যভিচার-প্রবৃত্তি ক'মে যায়। একথা সত্যও হ'তে পারে, মিথ্যাও ত' হ'তে পারে। সচ্চরিত্র মানুষটাকে ব্যভিচারে প্রমত্ত ক'রে দেওয়ার পরে কেবলই আশা কত্তে থাক যে, লোকটী সংযমী হবে, এ একপ্রকারের আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্যভিচারকে উৎখাত কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই প্রতিজ্ঞা ক'রে তোমরা আজ নিজ নিজ ঘরে ফির যে, ধর্ম্মের নামে বা অধর্ম্মের নামে কোনো নামেই তোমরা ব্যভিচারকে সমর্থন কর্ব্বে না, ব্যভিচার হ'তে দেবে না, ব্যভিচারকে সমাজ-জীবন থেকে তোমরা উৎখাত কর্ব্বে।

বেলা বাড়িলে সভাভঙ্গ হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ধর্ম্মের নামে স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয়চর্চ্চার সমর্থনকারী একটী ব্যক্তিরও টিকি দেখা গেল না।

অপরাহ্ণে অপর একটি গ্রামে আর একটি সভার অধিবেশন

হইল। এই সভাতে নানা স্থানের কতিপয় গোস্বামী উপাধিধারী ধর্ম্মগুরুও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের একজন বলিলেন,— আমি আগে কিছু বলিতে চাই।

শ্রোতারা ভাবিতেছিলেন যে, এই গোস্বামি-প্রভু নিশ্চয়ই ধর্ম্মীয় ব্যাপারে ব্যভিচারাদি সমর্থন করিয়া কিছু বলিতে চাহেন। তাই জনতার মধ্য হইতে তীব্র আপত্তি উত্থিত হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রিয় বা অপ্রিয় সকল সত্য কথাই আমাদিগকে কাণ পাতিয়া শুনিতে হইবে এবং শুনিবার পরে আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে, কতটুকু গ্রহণীয় আর কতটুকু বর্জ্জনীয়। সুতরাং গোস্বামি-প্রভুকে বলিতে দেওয়া হইল।

গোস্বামী প্রভু প্রায় ঘন্টাখানিক শ্রীকৃষ্ণ রাধার পুণ্যলীলা বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন,—শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব দেশকে, জাতিকে, সমাজকে এবং মনুষ্যমাত্রকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এই যুগে তাঁহার বাণীই প্রকৃত আপ্তবাণী এবং তাঁহার নির্দ্দেশেই প্রত্যেকটী মানুষের চলা উচিত।

শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল।

সংযত হও

শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার দুই ঘন্টাব্যাপী ভাষণে বলিলেন,—

আমার অনেকগুলি বাণী নাই। আমার একটী মাত্রই বাণী। সেই বাণী হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যমত সংযত হও। প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ শাসনে রাখ। ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উপরে তোমরা নিজ নিজ প্রভুত্ব স্থাপন কর,— কেউ ইন্দ্রিয়ের দাস হ'য়ে যেয়ো না। সমগ্র মনুষ্যজাতিকে একটী মাত্র প্রেমের ডোরে বাঁধবার ব্রতই ভারতীয় মানুষের যোগ্য লক্ষ্য। আর, তা কত্তে হ'লে প্রথম সর্ত্ত হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযম। মানুষ যদি নিজেকে নিজে সংযত ক'রে চলে, তবে ত' ব্যভিচারের প্রশ্নই আর ওঠে না। ব্যভিচারকে দমন করার জন্য পৃথক্ আন্দোলনের আর আবশ্যকতাই ত' থাকে না। প্রত্যেকে সঙ্কল্প কর যে, আমরা যতটুকু পারি সংযত হ'য়ে চল্‌ব এবং অন্যকে সংযত হবার সাহায্য দেব।

৩০শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৪৩
(১৩ই মে, ১৯৩৬)

অদ্য ভিন্ন আর একটী গ্রামে বিরাট এক সভার অধিবেশন হইল।

আমরা কি চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের লক্ষ্য নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জনসংখ্যা-বৃদ্ধি নয়। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ মাত্রকেই দেবত্বের পথে প্রবর্ত্তিত করা। পথের ত' অন্ত

নাই। অনাদি কাল থেকে কত কত যুগন্ধর পুরুষেরা কত কত সৎপথ দেখিয়ে এসেছেন। তার যে-কোনো একটিকে অবলম্বন ক'রে নিঃসীম ধৈর্য্য সহকারে অবিরাম পথ চলতে চলতে আমরা প্রত্যেকে পরমামৃতকে পাব। অতিচার, অবিচার, ব্যভিচার, অমিতাচার আমাদের প্রতিজনের জীবন থেকে নির্ব্বাসিত হোক্,—এইটুকুই আমরা চাই।

কসবা কালীবাড়ী

৩১শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩

(১৪ই মে, ১৯৩৬)

আজিকার বক্তৃতা বিখ্যাত কমলাসাগর কালীমন্দিরের সম্মুখস্থ দীঘিকার পারে এক বিরাট ময়দানে। জনতা দশ হাজারের বেশী হইয়াছিল।

ব্যভিচার নির্ম্মূল করিব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—ধর্ম্মের আমি অনুশীলন কর্ব্ব অক্ষত দেহে, পবিত্র মনে, অটুট মনে। অসংযম বা ব্যভিচার প্রভৃতিকে এর মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে দিব না। অনেক অনেক কাজ কর্ত্তে না পারি ত' তুচ্ছ তুচ্ছ দুই চারটা কাজই কর্ব্ব খুব ভাল ভাবে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে। আমরা সংযমী হব, সদাচারী হব, লোক-ব্যবহারে সৎ ও সাধু থাকব, কাউকে প্রবঞ্চনা কর্ব্ব না, কারো অনিষ্ট সাধনের চিন্তামাত্রও

কর্ব্ব না। আমাদের জীবন যেন সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অনুকরণীয় হয়। এই জন্যই আজ আমাদের প্রয়োজন যে সকল প্রথাকে ধর্ম্মীয় আচরণ থেকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করা যে সকল আচরণ ধর্ম্মকে ইন্দ্রিয়াসক্তির গ্লানিতে পঙ্কিল কর্ত্তে চায়। যত মহৎ লোকের প্রবর্ত্তনই হোক্, যত দিনের পুরাতনই হোক্, একে একেবারে সমূলে উৎখাত কর্ত্তেই হবে। সমগ্র ভারতব্যাপী নৈতিক চরিত্রের অভ্যুদয়ের আন্দোলন আমরা করে যাব। তার জন্য যে-কোনও স্বার্থ আমরা বিসর্জ্জন দিব। প্রকৃত ধর্ম্মের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না। সুতরাং তাকে আমরা সহ্য করব না। ধর্ম্মের নামে হোক্, সাহিত্য-চর্চ্চার নামে হোক্, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নামে হোক্, যে-কোনো প্রকার ইন্দ্রিয়-বিকারকে আমরা নির্ম্মূল কর্ব্ব এস এই পণ আমরা করি।

তৎপরে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার সম্পর্কিত যত দিকে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা প্রায় তিনঘন্টা ব্যাপিয়া বলিয়া উপসংহারে বলিলেন,—ছোট্ট একটু বাক্যের দ্বারা মহৎ কাজের সূচনা হ'তে পারে, সুতরাং ছোট বাক্যটীকেও তুচ্ছ ক'রে হেলায় যেন না বলি।

অদ্যকার বক্তৃতার রিপোর্টও নাকি কলিকাতার বহু ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কুমিল্লা
১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৩
(১৫ই মে, ১৯৩৬)

কুমিল্লার একাদশ বক্তৃতা

গতকল্য সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবাবামণি কুমিল্লা পৌছিয়াছেন। অদ্য অপরাহ্ণে মহেশ-প্রাঙ্গণের মাঠে তাঁহার একাদশ বক্তৃতা হইবে। বক্তৃতারম্ভের পূর্ব্বে একঘন্টা কাল তিনি যৌগিক আসন-মুদ্রাদি প্রদর্শন করিলেন। বক্তৃতার কোনও নোট রাখা হয় নাই। তবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় যোগীদের সাধন-পদ্ধতিগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনাই অদ্যকার প্রধান উপজীব্য ছিল। শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও অধ্যাপকেরা অদ্যকার সভায় আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন।

অতীত ও ভবিষ্যৎ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন বস্তুকে প্রাচীন ব'লেই পূজা কর্ত্তে চাই না, সে প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও আধুনিকতম কালের সমস্যা সমাধানে যে চির-তরুণের শক্তি ধারণ ক'রে আছে, তারই জন্য দিতে চাই তার নামে জয়জয়কার। আমরা প্রাচীনের ভক্ত কিন্তু অন্ধ ভক্ত নই। আমরা ভবিষ্যতের পূজারী কিন্তু লক্ষ্যহীন ধানুষ্কি নহি। আমাদের অতীত আমাদের

ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণ কর্ব্বে ব'লেই আমাদের কাছে অতীতের সমাদর। আমাদের ভবিষ্যৎ জগদ্বাসী সর্ব্বজাতির গতিনিয়ামক হবে, এই বিশ্বাস রাখি ব'লেই আমরা ভবিষ্যতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বর্ত্তমানের অধঃপতন দেখেও সেই জন্যই আমাদের হৃদয় ভীতি-ভয়ে কম্পিত নয়।

কুমিল্লা
২রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৪৩
(১৬ই মে, ১৯৩৬)

প্রাতঃকাল ছয়টায় শ্রীশ্রীবাবামণি হাটিতে হাটিতে আসিয়া পড়িলেন দিগম্বরীতলা। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার দত্তের গৃহে বসিলেন। একটী কুমারী মেয়ে বলিল,—আমাকে দীক্ষা দেবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোকে দীক্ষা দিতেই হেঁটে চলে এলাম।

কুমারীর ভগিনী বলিল,—আমিও দীক্ষা নিব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মাতাপিতার অনুমতি ছাড়া আমি কাউকে দীক্ষা দেই না।

কুমারীরা হাসিতে হাসিতে বলিল,—এই মাত্র কয়েক মিনিট আগে আমরা বাবা ও মায়ের অনুমতি চেয়েছি, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দিয়েও দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আর দ্যাখ আমি কেমন কল্পতরু, সঙ্গে সঙ্গে এসেও গেলাম। তোদের

সঙ্গে আমার ত' আগে পরিচয় ছিল না। ব্যাপারটা কেমন ক'রে হ'ল বলত।

মেয়ে দুটী বলিল,—আমাদের ভাগ্যে ছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি নিজে যেচে কোথাও কাউকে দীক্ষা দেই না। একটা লোককে বোধ হয় একবার দিয়েছিলাম, তার ফল ভাল হয় নি। তারপর থেকে আমি বড় সাবধান। তবু তোরা আজ পেয়ে যাচ্ছিস্। যাঁর নামটী তোদের দীক্ষাকালে দেব, তাঁর জয়জয়কার দিস্। আমার জয় দিতে হবে না। আমার পূজার কোনো প্রয়োজন নাই। যে গুরু শিষ্যের পূজা চায়, সে লঘু হ'য়ে যায়। আমি লঘু হ'তে চাই না।

বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাসি হাসিলেন।

কুমিল্লার দ্বাদশ বক্তৃতা

অদ্য অপরাহ্নে কুমিল্লার শেষ অর্থাৎ দ্বাদশ বক্তৃতা। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আজকের বক্তৃতা নিয়ে আমার কুমিল্লার দ্বাদশ বক্তৃতা শেষ হবে। আজ কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি, জনতা যেন এত বড় বিরাট মাঠটিতেও আটছে না। সুতরাং অনুমান কর্ত্তে হয় যে, সম্ভবতঃ এমন অনেক শ্রোতা আজকের সভায় আছেন, যাঁরা আগের বক্তৃতাগুলি শোনেন নাই। সুতরাং তাঁদের দিকে তাকিয়ে আমি একটী একটী

ক'রে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী এগারটী বক্তৃতার সারাংশ বর্ণনা কর্লেন। তারপরে অদ্যকার বিষয়ে প্রবেশ কর্লেন। *

প্রকাশ্য বক্তৃতার উপসংহার-কালে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অতীতে আমরা যতই ভুলভ্রান্তি ক'রে এসেছি, সবকিছুর প্রতিকার সম্ভব হবে, যদি জাতিগত ভাবে আমরা চরিত্রবান্ হই। চরিত্রই জাতির মেরুদণ্ড, চালবাজি নয়।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৩৪৩

(১৭ই মে, ১৯৩৬)

কাঁঠালিয়া

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি চলিলেন শ্রীযুক্ত শশিমোহন পালের সহিত ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত কাঁঠালিয়া নামক একটী মৌজা দেখিতে। শশিবাবুর ইচ্ছা এই যে, সেখানে একটী আশ্রম স্থাপিত হউক। শ্রীশ্রীবাবামণির মত এই যে, পুপুন্‌কী এবং রহিমপুরে আশ্রম স্থাপন করিয়া তিনি তাহা

* শ্রীশ্রীবাবামণি সারাংশে বলিলেন বটে কিন্তু সকলের মনে হইল যেন নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিলেন। এই বিষয়ে কুমিল্লার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীশ্রীবাবামণিকে প্রশ্ন করিলে বক্তৃতার শেষে জনান্তিকে তাঁহাকে তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আসল বক্তব্য একই রহিয়াছিল কেবল দৃষ্টান্তগুলি ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল উকিল মহোদয় বিস্ময় মানিয়াছিলেন।

চালাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সুতরাং দুইটা গোদের উপরে আবার একটা বিষফোঁড়া তিনি চাপাইতে চাহেন না। তথাপি শশিবাবুর আগ্রহে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে হইল।

কুমিল্লা হইতে একটা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তাঁহারা প্রায় পাঁচ ঘণ্টায় একস্থানে পৌছিবার পরে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। একটা স্থানে বৃক্ষপত্র হইতে বৃষ্টির জল-বিন্দুর ন্যায় টুপটুপ করিয়া কালো কালো চিনা-জোঁক সর্ব্বশরীরের উপরে পড়িতে লাগিল। পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া তাহা দিয়া শরীর হইতে কাচাইয়া কাচাইয়া জোঁকের ঝাঁক ফেলিতে হইতে লাগিল। সমস্ত শরীরময় চুলকণা ধরিয়া গেল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শশিবাবু চমৎকার স্থানে ত' নিয়ে এলেন। জমি উর্ব্বরা, মাটি চমৎকার। দশ বছরেও কোনো সার-প্রয়োগ দরকার হবে না। ভূমির আয়তন বাঞ্ছাযোগ্য। জোঁক আছে, তা সহ্য করা যাবে। অন্য দিক দিয়ে সবই ভাল। কিন্তু এখানে আশ্রম কি হবে? আমার ত' মনে হয়, হ'তে পার্ব্বে না। আপনারা গৃহী লোক। সাধুকে ধ'রে এনে ভূদান ক'রে পুণ্য লাভ কর্ব্বেন কিন্তু ক'দিন পরেই শুরু করবেন অবিশ্বাস কত্তে। আর নানা জনের সঙ্গে লেগে যাবে মামলা আর মোকদ্দমা। অশান্তির চূড়ান্ত হবে। আমি কিন্তু এখানে আশ্রম কত্তে পার্ব্ব না।

শশীবাবু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি বলিলেন,—তবে কি আমাদের শ্রম বৃথা হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্রম বৃথা হবে কেন? আমি ত' জীবনে কাজ কিছুই করিনি, কেবল কথাই বলেছি, এখানেও কিছু কথা বলে যাই।

একথা বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি একটা পরিচ্ছন্ন জায়গায় আসন পাতিয়া বসিলেন। চক্ষু-মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তৎপরে বলিলেন,—হে আকাশ, বাতাস, মৃত্তিকা, হে সর্প-সরীসৃপ কীট-পতঙ্গ, হে অনাগত যুগের লক্ষ লক্ষ অচেনা-অজানা পশুপক্ষী মানুষ উদ্ভিদ প্রভৃতি, তোমাদের সকলকে ডেকে শোনাচ্ছি এই অভয়-বাণী যে, তোমাদের সকলের কুশলের জন্য সকলের নিঃশ্রেয়স মুক্তিরই জন্য আমাদের প্রতিজনের জীবনের লক্ষ্য, হে ভূতপ্রেত যক্ষরক্ষ গন্ধর্ব কিন্নরাদি জীব বা বস্তু, তোমরা যদি থেকে থাক, তবে তোমাদেরও সকলকে এই আশার বাণী শোনাচ্ছি যে, তোমাদেরও নিঃশ্রেয়স মুক্তির জন্য আমরা তপস্যা কচ্ছি। জগন্মঙ্গল-সাধনপথের আমরা পথিক, তোমরাও আমাদের সঙ্গী হও। আমাদের আর কোন দেশ নাই, আর কোন জাতি নাই, আর কোন ধর্ম্ম নাই। এইটিই আমাদের একমাত্র সাধনা।

রাত সাড়ে দশটায় কুমিল্লা ফিরিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখনো জোঁকেরা গা ঘেঁষে রয়েছে রে। একটু নুণ মেখে দে রে সারা গায়ে। তবে যদি রক্ষা পাই।

পাথরঘাটা আশ্রম, চট্টগ্রাম
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৪৩
(১৮ই মে, ১৯৩৬)

অপরাহ্ণ ছয়টায় শ্রীশ্রীবাবামণি উঠিয়াছেন শ্রীমৎ নগেশ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে। জনা পনের যুবক পাথরঘাটা আশ্রমে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অড়ম্বরের দোষ ও গুণ

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এখানে?

তাঁহারা বলিলেন,—ষ্টেশনে অভ্যর্থনা নিষেধ করেছেন। এইজন্য আমরা ষ্টেশনে যাই নি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভালই করেছ। বাহ্যাড়ম্বর যত বর্জ্জন করতে পার, ততই ভাল। আড়ম্বরের গুণও আছে, দোষও আছে। গুণটা হচ্ছে এই যে, আড়ম্বর দেখে সাধারণ লোক আকৃষ্ট হয়। দোষটা হচ্ছে এই যে, আড়ম্বর একবার শুরু হ'লে বিনা আড়ম্বরে আর কাজ কত্তে মন চায় না। আড়ম্বরে আর আড়ম্বরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত জীবনটা একটা ভড়ংএ পরিণত হয়। জীবন থেকে ভড়ং, অভিনয় ইত্যাদি যত কমাতে পারবে, এই জীবন দিয়ে প্রকৃত কাজ তত বেশী কত্তে পার্ব্বে। কাজ করাই যাদের লক্ষ্য, তারা আড়ম্বরকে আবর্জ্জনা মনে করে। লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে কোনো একটা ভাব প্রচার কত্তে হ'লে শোভাযাত্রা, শ্লোগান, বক্তৃতা বা বহুভাষণ প্রভৃতি সবই

কাজে লাগে। কিন্তু তাদেরও মাত্রা পরিমিত। মাত্রাধিক্য ঘটলে সুফল না হ'য়ে কুফল হয়। সমস্ত দেশ যখন দুঃখে জর্জ্জরিত, তখন দুঃখাপহারী সেবকেরই প্রয়োজন,—'দুঃখ নাই, দুঃখ নাই' ব'লে চীৎকারকারী বৈতালিকের সঙ্গীত কোনো কাজে আসে না। কলেরা লেগেছে ত' ঔষধ খাওয়াও। স্যালাইন দাও। শুশ্রূষা কর। বক্তৃতায় তখন কি ফল দেবে? শোভাযাত্রায় তখন কি লাভ হবে? শ্লোগানে তখন কি উপকার হবে? যা আসল প্রয়োজন, সেইটা আগে চিনে নাও। তারপরে যতটা পারো সেই প্রয়োজনের দাবী মিটাও।

বিনীত হও, দরদী হও, নিরহঙ্কার হও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিরহঙ্কার না হ'লে মানবসেবা করা সম্ভব নয়। দাম্ভিক ব্যক্তি কদাচ কাউকে প্রকৃত সেবা দিতে সমর্থ হয় না। ধন বা বল থাক্‌লেই কেউ সেবা দিতে পারে না। সেবায় ইচ্ছুক একটী সরস ও বিনম্র মনও চাই। দেশমাতা আমাদের দুঃখিনী। তাঁর সেবা প্রয়োজন। দাম্ভিক গর্ব্বিত অহঙ্কারী পুত্রকন্যার দ্বারা তাঁর কোনো সেবা হবে না, হবে কেবল অনিষ্ট। আড়ম্বর, দর্প, দম্ভ, অহঙ্কারকে সৃষ্টি করে এবং বাড়ায়। সুতরাং আড়ম্বর সম্পর্কে সবাই সাবধান থেকো। বিনীত হও, নিরহঙ্কার হও, সরস মনের অধিকারী হও। দরদী হোক্ তোমাদের হৃদয়।

পাথরঘাটা আশ্রম, চট্টগ্রাম
৫ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৪৩
(১৯শে মে, ১৯৩৬)

জনতার ভিড় চলিতেছে। প্রত্যেকরই নাকি ব্যক্তিগত কথা। শ্রীশ্রীবাবামণি প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া ডাকিয়া আনিয়া প্রতিজনের সমস্যা-সমাধান করিতেছেন। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্ত একটার পর একটা করিয়া কথা লিখিয়া রাখিতেছিলেন।

ইন্দ্রিয়-সমূহ সুখপ্রাসাদের বাতায়ন

একজন প্রশ্ন করিল,—স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয়গত মিলনে শরীর এবং মনে এত আনন্দ অনুভূত হয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটী কথা সুনিশ্চিত জেনো যে, ভগবানের বিপুল সৃষ্টিকাণ্ডের মধ্যে কোনো বস্তুই নিষ্প্রয়োজনীয় নয়। স্বাভাবিক মানুষ স্বাভাবিক ভাবে দেহসুখ আস্বাদন ক'রে সুখী হবে, এটা ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়। এই জন্যই তিনি স্ত্রী আর পুরুষ এই দুই জাতিকে আলাদা আলাদা রকমের ভোগেন্দ্রিয় দিয়েছেন, যাতে স্পষ্ট ক'রে একজনের ইন্দ্রিয়কে অপর একজনের ইন্দ্রিয়ের অনুপূরক বা পরিপূরক করা হয়েছে। জীবসৃষ্টি হবে, এইটুকুই তাঁর চরম

অভিপ্রায় নয়। তিনি চান, জীবেরা ভোগানন্দও উপভোগ করুক। কিন্তু তার প্রকৃত তাৎপর্যটা কি? তাৎপর্যটা হচ্ছে এই যে, আমরা ইন্দ্রিয়াদি-সহযোগে যে সুখভোগ করি, সে সুখ নিতান্ত সীমাবদ্ধ হ'লেও, যদি সত্যি সত্যি তাকে আস্বাদন করা যায়, তবে একেবারে অনির্ব্বচনীয়। চোখ দিয়ে একটী ফুল দেখতে পেলাম, খুশী হলাম। এটা নিশ্চয়ই সুখ কিন্তু এই পদ্মফুল, এই গোলাপ ফুল, প্রভৃতির সৌন্দর্য্য কতটুকু দেখ্‌তে পেলাম? চোখ দুটা দুটা বাতায়ন বিশেষ। আসল সুখ আমার ভিতরে। চোখ গোলাপ ফুলের যে সৌন্দর্য্য আমাকে দেখিয়ে দিল, তার কোটি গুণ সৌন্দর্য্য আমার ভিতরে আছে, সেই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যই চোখ বলে দিল,—কমল কত সুন্দর, গোলাপ কত সুন্দর। গন্ধরাজ ফুল আমার নাসিকাকে জানিয়ে দিল যে, তার কত সৌরভ। আসলে কিন্তু নাসিকা রূপ বাতায়ন আমাকে জানিয়ে দিল যে, আমার ভিতরে পুঞ্জিত সৌরভের হিমালয় জমে রয়েছে। আমার ভিতরে আমাকে যেতে হবে। নাসিকা গবাক্ষ হ'য়ে আমাকে বলে দিল, "ভিতরে তাকাও, অনির্ব্বচনীয় সুখ আস্বাদন কর।" দেহের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কামভোগের ইন্দ্রিয়টি সব চাইতে ব্যাপক-শক্তি-সম্পন্ন। সে যখন তার সুখের নমুনা প্রদর্শন করে, তখন দেহ-মন-প্রাণ সব কিছুকে যেন এক সঙ্গে উজাড় ক'রে দেয়। আসলে কিন্তু ভোগেন্দ্রিয় একটী বাতায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বাতায়ন দিয়ে

ভোগলুব্ধ মানব দেখতে পায় যে, তার নিজের ভিতরে কি অনির্ব্বচনীয় সুখের আকর রয়েছে। এক এক ইন্দ্রিয় এক এক প্রকারের সুখ প্রদান ক'রে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে সেই সুখকে পৌঁছে দেয়, যেই সুখ আমাদের নিজেদের ভিতরেই পুঞ্জিত পরিমাণে আস্বাদন করতে আমরা সমর্থ। মিলনেই আনন্দ, বিরহেই দুঃখ। আমার ভিতরে একটা আমি আর একটা আমির সঙ্গে মিলিত হ'তে চায়। এই দুইটা আমিকেই সাংখ্য যোগীরা ভিন্ন দুইটা নাম দিয়েছেন,—প্রকৃতি এবং পুরুষ। এটা একটা মহাকাব্য। বৈষ্ণবেরা নাম দিয়েছেন রাধা এবং কৃষ্ণ। রামায়ৎরা নাম দিয়েছেন সীতা এবং রাম। বৈদান্তিকেরা নাম দিয়েছেন অহম্ এবং ব্রহ্ম। আমি নাম দিয়েছি আমি আর তুমি। যে যে ভাবে যে নাম দিক্, যে-কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ সুখের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ হচ্ছে সেই পরমসুখের প্রতি। নারী-পুরুষের মিলনে তোমরা যে সুখানুভব কর, তাহা ঐ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ মাত্র, আর কিছু নয়।

জীবনের অবলম্বন

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বরকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান ক'রে সংসারের কণ্টক-সঙ্কুল পথে নির্ভয়ে বিচরণ কর। তাঁর ইচ্ছাই নিখিল ভুবনে সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁর পরমমঙ্গলময় মধুমাখা নাম নিরন্তর

স্মরণ কর। ইহাই সকল কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করবে। নামে নির্ভর কর, নামে বিশ্বাস কর, নিখিল বিঘ্ন এতে দূরীভূত হ'য়ে যাবে। নাম তোমার চিত্তকে সকল পাপ হ'তে মুক্ত করবে। নাম তোমাকে মানুষের প্রতি বিদ্বেষহীন ও প্রেমশীল কর্ব্বে। নাম তোমার অন্তরের সীমাহীন উদ্বেগ প্রশমিত কর্ব্বে। নামের শক্তি অসীম অনন্ত অফুরন্ত। এই ছলনাময় চঞ্চল সংসারে নামই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পরমবন্ধু। নামে ডুবে যাও। অন্য চিন্তা যতটা পার, ছেড়ে দাও। কেউ কেউ হয়ত বল্‌বে, সবই ফক্কিকার, নাম-টাম কিছুই নয় প্রতারণা মাত্র। তাদের কথা তাদের ঠোঁটেই লেগে থাকুক, তাদের কথায় কর্ণপাত করো না। ভগবানের নাম কেউ চালাকি ক'রে তৈরী করে নি, শাশ্বত সনাতন বস্তু তোমাদের কুশলের জন্য নিজে থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। নামের কোনও জনক নেই, জননী নেই অথচ নামই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর জনক বা জননী। জীবন পেয়েছ নামেরই মহিমায়, এই নামকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ব'লে জানো। নাম সত্য, নাম নিত্য, নাম নিরঞ্জন, নামই আত্মা, নামই জ্যোতি, নামই স্বরূপ।

অসবর্ণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ

একজনের প্রশ্ন করিল,—আপনি ত' জাতিভেদ-প্রথাটাকে খুব একটা সমর্থন করেন না, বলেন যে সব জাতই ঈশ্বরের

দৃষ্টিতে সমান। তবে আপনি ঘরে ঘরে অসবর্ণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ-সম্পাদনের জন্য কোনো আন্দোলন কেন করেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রশ্নটা মন্দ নয়। জাতিভেদ যদি ভালো না হ'য়ে থাকে, তবে তা নিজেরই দৌলতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তার জন্য আমাকে আবার আন্দোলনে নামতে হবে কেন? দেশের অনেক চিন্তশীল ব্যক্তিই ত' জাতিভেদ দূর করার জন্য প্রকাশ্যে এবং পরোক্ষ অনেক আলোচনা, আন্দোলন এবং প্রচার-কার্য্য কচ্ছেন। এত লোক এই কাজটা করার জন্য থাক্‌তে আমাকে কেন আবার ঐ কাজে হাত দিতে হবে, বলতে পার? আমি যে কাজটী কচ্ছি, সেই কাজটী কত্তে কোনও ভদ্রলোককে কৈ বড় ত একটা দেখ্‌তে পাচ্ছি না! আমি আমার হতের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ ধরি কি ক'রে? অসবর্ণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ একটা দুটা ক'রে চারদিকে অনেকই হচ্ছে। কিন্তু কেন হচ্ছে? যবক-যুবতীদের মধ্যে প্রেম-বিনিময়ের সুযোগ সুবিধা দিনের পর দিন ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এক বংশের মেয়েরা অন্য বংশের ছেলেদের বিয়ে করার ভিতরে জীবনের ঐহিক উন্নতি লাভের সম্ভাবনা দেখ্‌তে পাচ্ছে। বিবাহকে উন্নতির সোপান জ্ঞান ক'রে এই সব ক্ষেত্রে অবাধে অসবর্ণ বিবাহ চল্‌ছে এবং চল্‌বে। প্রেরণাটা নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক। দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন আরও তীব্র ভাবে দেখা দেবে

এবং একই অফিসে চাকরী করার জন্য ছেলেরা আর মেয়েরা যখন প্রতিযোগিতা ক'রে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি শুরু করবে, তখন এই ব্যাপারটা আরও বেশী চালু হবে। কিন্তু গোড়ার সমস্যাটা একই থেকে যাবে। এক বংশের মেয়ে অন্য বংশের ছেলেকে বিয়ে কর্ল্লে সঙ্গে সঙ্গে এই বিবাহবন্ধ দম্পতীর বা এই বিবাহজাত সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বাড়বে ত'? এই বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? এই বিষয়ে যদি নিশ্চয়তার ব্যবস্থা কিছু না থাকে, তবে কিছু মানুষ একটা জাতি থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে আর একটা জাতিতে পরিণত হ'ল মোদ্দা লাভ মাত্র এইটুকু হ'ল। কিন্তু জাতিগত ভাব সমগ্র ভারতবাসীর উন্নতি যদি তুমি চাও, তাহ'লে তোমার লক্ষ্য থাকা উচিত, এই আসল দিকটিতে যে, কেমন ভাবে বিবাহ হ'লে তবে বংশাবলির ভিতরে চারিত্রিক বল বর্দ্ধিতই হ'তে থাক্‌বে। যুদ্ধের সময়ে, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে, মহামারীর সময়ে, নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রাণরক্ষার তাগিদে অনেক অমেক নরনারী নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বংশের লোকের সঙ্গে রক্তবিনিময় করে। তাতে কোনো আদর্শবাদ থাকে না। বেঁচে ত' রইলাম, তারই জন্য অমুকের ঘরণী হলাম, পরের ফলাফল যা হয় হবে। গীতায় যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুন বর্ণসঙ্করের আশঙ্কা করেছিলেন অথচ এই অর্জ্জুনের বা তার ভাই ভীমের অনার্য্যকন্যাকে, নাগকন্যা বা রাক্ষসকন্যাতেও অরুচি ছিল না। অনার্য্যকন্যাকে তাঁরা ভয় করেন নি, কারণ

বজ্রবাহন বা ঘটোৎকচেরা পিতৃধারা রক্ষা করার চেষ্টাই ক'রে থাকে। কিন্তু বর্ণ-সঙ্করের কোনো পিতৃধারা বা tradition থাকে না। অসবর্ণ বিবাহ যখন পিতৃধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার অনুকূল, তখন তা সমাজ হজম কত্তে পারে, যখন প্রতিকূল, তখন সমাজে নিদারুণ বদ-হজমির সৃষ্টি হয়। তাই আমি আন্দোলন কচ্ছি চরিত্র-গঠনের। সুগঠিত-চরিত্র মেথরের পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বা সুগঠিত-চরিত্রা চর্ম্মকার কন্যার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-সন্তানের বিবাহ হ'লে তাতে বংশের সদ্‌গুণাবলির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ফটো ছিন্ন করিলে

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার ফটো বা প্রতিচিত্র কেউ ছিন্ন বা ধ্বংস করলে আমার তাতে অপমান হয় না। এই জন্যই তাতে আমার ক্রোধ জন্মে না। অপমান হয় তার হাতের বা পায়ের, যার হাত করেছে ছিন্ন এবং যার পা করেছে পদাঘাত। ফটো বেরিয়েছে ব'লেই ঘরে ঘরে তাকে পুষ্পমাল্য দিয়ে সাজাতে হবে বা সকাল সন্ধ্যায় ধূপ-ধূনা-প্রদীপাদি দিয়ে আরতি কত্তে হবে, এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা আমার মনের কোনও গোপন কোণেও লুক্কায়িত নেই। আমি অতি সাধারণ মানুষ, তুমি মানুষের কাছে যে সম্মান পাও, তার বেশী সম্মান আমার প্রয়োজন কি?

রহিমপুর ও মোচাগড়া আশ্রম

মোচাগড়া-নিবাসী নেতৃস্থানীয় জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, রহিমপুর ও মোচাগড়া আশ্রম স্থায়ী হইবে কিনা।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি জ্যোতিষবিদ্যায় অধিগত নই যে, ভবিষ্যৎ বল্‌তে পার্‌ব। কিন্তু দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি আস্তে আস্তে নিদারুণ হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষের পথে জোর কদমে চলেছে। কাল্‌কের ভারত-প্রেমিক আজ হঠাৎ অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক হ'য়ে উঠ্‌ছেন। আজকের পরম-সম্প্রীতিবাদী কালকে কি মূর্ত্তি ধারণ কর্ব্বেন, তা কেউ অনুমান কত্তে পাচ্ছেন না। কাল যারা গলাগলি ক'রে চল্‌ছিল, আজ হঠাৎ তারা গালাগালি শুরু করেছে, আর পরশু হয়ত তারা সুযোগ পেলেই গোলাগুলি ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ কর্ব্বে। এমন একটা অনিশ্চিত সময়ে কেউ কি কখনো সঠিক ক'রে বল্‌তে পারে যে, এক প্রদেশবাসীর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম অন্য প্রদেশে থাক্‌তে পারবে কিনা অথবা এক প্রদেশেরই একাংশের আশ্রমগুলি জলবুদ্বুদের মতন সাগরজলে ডুবে যাবে কিনা। ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের হাতে, আমরা শুধু নিষ্কাম অন্তরে কাজ ক'রে যেতে পারি। কোথাও হয়ত পর্ব্বতপ্রমাণ কাজ ক'রেও সর্ষপ প্রমাণ সফলতা আহরণ কত্তে পার্ব্ব না, কোথাও হয়ত বিন্দুমাত্র শ্রম না ক'রেও হিমাচলমিত সাফল্য অর্জ্জন কর্ব্ব। আমাদের পরিশ্রম-রূপ

নৌটাই টিকিট যে কোথায় লুকালেন কবে, কেউ আমরা জানি না। সুতরাং অখণ্ড-বিশ্বের ভবিষ্যৎ ভেবে দুশ্চিন্তা ক'রো না।

প্রাদেশিকতার সমস্যা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতে আজ প্রাদেশিকতার সমস্যা একটা বড় জিনিষ। যে ভাবে এবং যাদের দ্বারা এই সমস্যাকে ক্রমশ জটিল করার চেষ্টা হচ্ছে, তার উপরে সাধারণ মানুষদের কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই। আমরা শুধু নিরন্তর কামনা করতে পারি যে, ভারতের অখণ্ড-সত্তার আদর্শ যেন সব মানুষের কাছে প্রিয় হয়। এক ভাষা বলছে,—"আমরা অপর ভাষাকে দাবিয়ে রাখব" এক সম্প্রদায় বলছে, "আমরা অপর সম্প্রদায়কে পায়ের তলায় পিষে মারব",—এই কথাগুলো চিন্তা অকল্যাণের রূপান্তর মাত্র। আদর্শের দিক থেকে প্রেম শব্দটি উত্তম, তাই শেখানো দেওয়া আজ জ্ঞানীদের প্রধান এবং প্রথম কর্তব্য। অজ্ঞান লোকেরা আবেগে চলে, যুক্তি দেখে না। জ্ঞানী লোকেরা আবেগকে যুক্তি দ্বারা শাসন ক'রে চলতে পারেন। সর্ব্বব্যাপী সমস্যার সমাধানে জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলের সহযোগ প্রয়োজন। কিন্তু শিশু শক্তি সকল শাস্ত্র জানিলে, তবে কাজ করার মতন শক্তি বর্ত্তমানে দেশে যতটা আছে, তাও বিরল। সব চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এই যে, জাতি-গঠনের মূল বিষয় চরিত্র-গঠনের

দিকে প্রখর দৃষ্টি না রেখেই দেশের অধিকাংশ আন্দোলন চলেছে বিষময় মূর্ত্তি ধারণ ক'রে।

অবনত শ্রেণীর উন্নতির চেষ্টা

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—সম্প্রতি অমুক স্থানে বাংলার সকল মাহিষ্যদের নিয়ে একটা বিরাট সম্মেলন হ'য়ে গেছে। তাতে নাকি প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরাই মাহিষ্য জাতিকে হেয় ক'রে রাখার ষড়যন্ত্রের আসল আসামী এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে যোগ্য ব্যবস্থা করা চাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—বাবা হে, খুব সম্ভবতঃ তুমি ভুল সংবাদ শুনেছ। মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, যোগী, কপালী, নমঃশূদ্র, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি নানা জাতি বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ সমাজের উন্নতি-কল্পে সম্মেলন ক'রে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্ত করেন, এটা ত' খুব ভাল কথা। কেউ নিজেদের অসুবিধার কথা প্রকাশ্য ভাবে না জানালে বাহিরের অন্যান্য সমাজের লোকেরা তা সঠিক ভাবে জানবেন কি ক'রে? সুতরাং সম্মেলন যদি হ'য়েই থাকে, তবে ভালই হয়েছে। তবে, ব্রাহ্মণরাই এই সকল অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে জগতের কাছে হেয় ক'রে রেখেছেন, এই কথাটা সম্পূর্ণ সত্য কিনা, ভেবে দেখতে হবে। ক্ষত্রিয় রাজা কৈবর্ত্ত-কন্যা বিবাহে আপত্তি করেন নাই, তপস্বী ব্রাহ্মণ ভিন্নতর জাতির

কন্যাকে অপছন্দ করেন নাই, এসব দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে আছে। প্রাচীন কালে জাতি ছিল জীবিকার অনুসারণী, ফলে কুম্ভকারের পুত্রকে ব্যবসা শিখবার জন্য অন্যমুখাপেক্ষী হ'তে হ'ত না। এটা একটা সামাজিক সুবিচার। কালক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। কালোচিত ব্যবস্থা সকল সম্প্রদায়কেই অবলম্বন কত্তে হবে। আমার ত' মনে হয়, ব্রাহ্মণদের তাতে আগ বাড়িয়ে বাধা দিতে যাওয়া অসঙ্গত হবে। যে-কোনও জাতি বা সম্প্রদায় যদি আত্মোন্নতি বিধানের জন্য হিংসা-বিদ্বেষ-বর্জ্জিত কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করে, তবে ব্রাহ্মণদের উচিত তাতে নিজেদের সাধ্যানুসারে সাহায্য-সহায়তা করা।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশা

প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণ-জাতির কথাও উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি ত' নানা দেশের নানা রকমের ব্রাহ্মণদের দেখছি। আমার ধারণা হয়েছে যে, লোককে বিদ্যাদানের জন্য টোল খুলে খুলে অধিকাংশ মনীষী ব্রাহ্মণ তৈলহীন প্রদীপের শিখার মতন নিষ্প্রভ হ'য়ে নিভে গেছেন। তিনি বিনা আর্থিক বিনিময়ে ছাত্র পড়িয়েছেন, তাঁর স্ত্রী বিনা প্রতিদানে ছাত্রদের ডাল-ভাত রেঁধেছেন, এবং অন্য ব্রাহ্মণেরা ধোবা, নাপিত, সূতার, কুমার, কামার ও পশুপালকের কাজ কত্তে অক্ষম হবার দরুণ দোকানদারদের জমা-খরচের খাতা

আর মহাজনদের সূদের হিসাব লিখেছেন। ফলে, জাতি হিসাবে আর্থিক জগতে ব্রাহ্মণ বড়ই নিঃসহায়। তবু এদের সন্তানদের মধ্য থেকে বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের আবির্ভাব কেবল সমস্ত সমাজেরই হিতবর্দ্ধক হয় নি, পরন্তু মানব-সভ্যতাকে গৌরবান্বিত করেছে। তোমরা ব্রাহ্মণদের গাল দেবার আগে এই কথাগুলি ভেবে দেখো।

সাম্যবাদ

সাম্যবাদের কথাও উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমাদের সাম্যবাদ আমি পছন্দ করি। সব মানুষকে উন্নতি লাভের সমান সুযোগ দেওয়া হবে, এটাই যার মূলকথা, তাকে সম্মান না ক'রে পারি না। কিন্তু আমার একটা ভোট আর তোমারও একটা ভোট, এই ব্যবস্থাটাকেই সাম্যবাদ ব'লে মান্‌তে পারি না। আমার ভিতরে যিনি আছেন, তোমার ভিতরেও তিনি আছেন, এই বোধটুকুও আসা দরকার। এই বোধটুকু এলে পারদ শোধিত হ'য়ে গেল, এখন এটা আর পারদের বিষক্রিয়া কত্তে পার্ব্বে না, এখন এটা মকরধ্বজ হ'য়ে যাবে।

চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ

আর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাস্ত্রীয় উক্তিকে মেনে নিতে হ'লে স্বীকার কত্তে হয় যে,

চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ ক'রে তবে তুমি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েছ। কথাটার প্রকৃত মানে কি? অনেক রকম বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে তুমি মানুষ-দেহে উন্নীত হয়েছ, শুধু এইটুকুই এর অর্থ নয়। যে যোনির ভিতর দিয়ে তুমি প্রসূত হয়েছ, সেই যোনি তোমার মাতৃপীঠ, তোমার তীর্থস্থান, তোমার পুণ্যপীঠ, তোমার সর্ব্ববিধ পূজার শ্রেষ্ঠ স্থান। এই যোনি তোমার পক্ষে একেবারেই অলঙ্ঘনীয়। চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ ক'রে এসেছ, এই কথার মানে এই যে, যেহেতু তুমি মানব, সেই হেতু পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ আদি সকলের স্ত্রীজাতি তোমার জননী।

গুরু কি জন্মজন্মান্তরীণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই যে তুমি চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ কর্লে, প্রত্যেক জন্মেই কি তোমার একজন ক'রে গুরু ছিলেন? মানুষ-দেহ নেবার পরেও ত' কতবার মানুষ হ'য়ে এসেছ। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জন্মে কে তোমার গুরু ছিলেন, বল ত! গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক এমনই অনির্ব্বচনীয় যে, নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে, নানা শব্দালঙ্কারে, নানারূপ বাগবাহুল্যে ভক্তদের মুখে তা বর্ণিত হয়েছে। জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক কথাটাও ঐ রহস্যময় ভাষার কথা। একে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণের কোনো প্রয়োজন দেখি না। গুরুতে একান্ত আনুগত্য এবং গুরুদত্ত সাধনের অমৃতময়

রসের আস্বাদন এসে গেলে ঐ-জাতীয় একটা দিব্য অনুভূতি শিষ্যের অন্তরে জাগে। এটা অনুভূতিরই ব্যাপার। জ্যামিতিক বা গাণিতিক নিক্তি নিয়ে এর ওজন করা সম্ভব নয়। সঙ্গতও নয়। প্রচলিত গুরুবাদের সমর্থক আচার্য্যদের হাতে এটা একটা চমৎকার টোপ। কিন্তু স্বাধীনচেতা গুরুদেবেরা মনে করেন যে, শিষ্যের অন্তরে যে অনুভূতি তার নিজ সাধনের ফলে জন্মে নাই, তাকে জোর ক'রে তার মনের মাটিতে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা একটা জুচ্চোরি মাত্র। তোমার প্রাণে অনুভূতিটা কি জেগেছে, তার দিকে তাকিয়ে পথ চল, কথা বল, কাজ কর। অতিরঞ্জন ক'রে সামাজিক কৌলীন্য অর্জ্জনের চেষ্টা ক'রো না। আমি গুরুভক্ত শিষ্যেই তুষ্ট নই, আমি সত্যবাদী শিষ্য চাই।

ব্যাকুলতা ও দীক্ষাগ্রহণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন ব্যাকুল হ'লেই দীক্ষা নিতে নেই। যোগ্য দীক্ষাদাতা খুঁজে বের ক'রে নিতে হয়। এজন্য প্রয়োজন সুসহিষ্ণু প্রতীক্ষার। যাকে দেখ্‌লাম, তারই গলায় স্বয়ম্বরের বরমাল্য অর্পণ মুর্খতা। ভগবানের চরণে নিরন্তর প্রার্থনা জানাতে হয়, হে প্রভু, গুরু একজনই কর্ব্ব, হাজার হাজার ঘাটে স্নান করার আমার রুচি নেই, প্রকৃত গুরু চিনিয়ে দাও, মিলিয়ে দাও, তাঁর চরণের কাছে আমাকে টেনে নিয়ে যাও।

গতি এবং গন্তব্য

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামই গতি এবং গন্তব্য। নামই পথ এবং পাথেয়। নামকে সর্ব্বশাস্ত্রের সার ব'লে জান। ভগবানের নামের ভিতরেই কোটি বিশ্ব ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। নামের শ্রেষ্ঠ প্রণব, কারণ এই নামে সব নাম একত্র নিবদ্ধ আছে। প্রণবের জন্ম নাই,—প্রণব অনাদি। প্রণব থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের আবির্ভাব, এতেই তাঁদের নিত্যাবস্থান। আদি সৃষ্টির আগেও প্রণবই ছিলেন, মহাপ্রলয়ের পরেও প্রণবই থাক্‌বেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন হয়, শ্রীরামের জন্মদিন হয়, প্রণবের জন্ম নাই ব'লেই তার জন্মদিন নেই, জন্ম নেই ব'লেই প্রণবের মৃত্যুও নেই, তিরোধান-দিবসও নেই।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলন

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার পরিচিত বা আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল যেখানে যে পুরুষ বা নারী দেখ্‌তে পাও, তাকেই প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে জানাতে থাকবে, নূতন মানব-জাতি সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে এমন ভাবে কর্ম্মপরায়ণ হ'তে হবে যেন তার ফলে বংশানুক্রমে আমাদের উন্নতি চলতে থাকে। মায়েরা যেদিন এই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়াবেন, সেদিন

এই আন্দোলন এক উত্তাল সমুদ্রের রূপ ধারণ কর্ব্বে। মায়েরা আমার কেউ একমাস, কেউ ছয় মাস কেউ বা এক বৎসর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে ভবিষ্যতের সেই মহাদৃশ্যপটের পশ্চাৎ-পট নির্ম্মাণ ক'রে যাচ্ছে আজ নীরবে, নিভৃতে, গোপনে। অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে এবং ব্যক্তিগত কৃতিত্বের প্রচার বন্ধ রেখে কতক বৎসর এভাবে কাজ চললে চরিত্র-আন্দোলন এক ত্রিভুবনময়ী বিরাট মূর্ত্তি নেবে। অবিরাম হাতুড়ি ঠোকার ফলে এই ভাবটাকে জাতির মনে স্থায়িভাবে অঙ্কিত ক'রে দিতে পার্লে এক নূতন প্রজন্মের সৃষ্টি হ'য়ে যাবে। কাজ শুরু করা যতটা উত্তম, কাজকে বারংবার ক'রে যাওয়া তার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম। ঐক্যে ফাটল ধরায় আত্মাভিমান, কর্ত্তৃত্বলিপ্সা, সেবাভাবের অভাব এবং অন্ধতা। এগুলিকে দূর ক'রে দিয়ে তোমরা মিলিত হ'য়ে কাজ কর। যেখানে তোমরা মিলিত, সেখানেই আমি আনন্দিত, প্রমুদিত ও হর্ষিত। যেখানে তোমরা বিচ্ছিন্ন, সেখানে আমি প্রচ্ছন্ন। নবীনদের হয়ত বিনয়-নম্রতার অভাব আছে। প্রবীণদের সম্পর্কে হয়ত তারা সহনশীল নয়। তবু প্রবীণেরা গায়ে প'ড়ে নবীনদিগকে কিছুদিন সহযোগ দেবার চেষ্টা কর। তোমাদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন তাদের আছে। জীয়ন্তে বা মৃতাবস্থায়ও তোমরা কিছু না কিছু কাজ ক'রে যাবে, এই পণ কর। পুণ্যবান্ লোকেরা জীবন্ত অবস্থায় এবং মৃত্যু দ্বারাও পরহিতেই সম্পাদন ক'রে থাকেন। দিনে রাত্রে চারিবার চারি ঘণ্টা

ক'রে উপাসনা করার সুযোগ প্রত্যেকের হয় না, কারণ দেশে অন্ন-সমস্যাই অতি প্রধান। কিন্তু চারবার চার ঘণ্টা উপাসনা কর্ব্বার রুচিটা খুব বড় কথা। নাম করা আর নামে রুচি রাখা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটাই প্রায় সমান কথা।

শ্বাস, প্রশ্বাস, ভ্রূমধ্য ও নাম

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষাকালে নাম যে ভাবেই শুনে থাক, আমার কণ্ঠের উচ্চারণই ত' শুনেছ। তাহ'লেই হল। প্রণব মন্ত্রের উচ্চারণ অনেক রকম হ'তে পারে, যথা ওঁ, ওম্, ঔঁ, ঔং, ওং, অউম্ ইত্যাদি। প্রত্যেকটা উচ্চারণই শুদ্ধ উচ্চারণের প্রায় কাছাকাছি। সম্পূর্ণ শুদ্ধ উচ্চারণটী কণ্ঠে ও ওষ্ঠে সম্পাদন করা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং যা শুনেছ, তা শুদ্ধই শুনেছ, জান্‌বে। তাই অভিনিবেশ সহকারে জ'পে যাও। নিজ কাণে এবং আমার কণ্ঠে শুনেছ। সুতরাং তোমার আর দ্বিধার প্রয়োজন কি? শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ, ভ্রূমধ্যে মনঃসংযোগ এবং নামের স্মরণ এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন খুব কঠিন ব্যাপার নয় বাবা। কিছুদিন অভ্যাস করলে আপনিই এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। ভ্রূমধ্যে শ্বেতচন্দনের ফোঁটাটি দিয়ে কাজের আরম্ভ। জোর ক'রে দৃষ্টিকে বা মনোযোগকে ভ্রূমধ্যে টেনে আনবার কুস্তি-কসরতের প্রয়োজন নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে সাধনের বিস্তার। নামে মনের স্থিতি চূড়ান্ত। তিনটাকে, অর্থাৎ শ্বাসবায়ু,

ভ্রূমধ্য ও নাম এই ত্রয়ীকে, জোর ক'রে এক সাথ মিলাতে যেও না। কাজ ক'রে যেতে থাক, যখন মিলবার আপনিই মিল্‌বে। নাম শুধু শ্বাসে জপলেই হবে না, প্রশ্বাসেও জপতে হবে। নাম শুধু প্রশ্বাসেই জপবে না, শ্বাসেও জপতে হবে। কারো কারো শ্বাস থাকে দীর্ঘ, প্রশ্বাস থাকে হ্রস্ব। কারো কারো প্রশ্বাস থাকে দীর্ঘ, শ্বাস থাকে হ্রস্ব। শ্বাস-প্রশ্বাস ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন যেমন থাকে, থাকুক। তা নিয়ে ভাব্‌বে না। শ্বাস-প্রশ্বাসকে একেবারে স্বাভাবিক থাক্‌তে দাও। তার সঙ্গে সঙ্গে বিনা ক্লেশে নামজপ কর। উচ্চে উচ্চারণ হবে না, শব্দ হবে না, নীরবে কাজ ক'রে যাবে।

শ্রেষ্ঠ উপকার

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের যত প্রকারের উপকার তুমি কত্তে পার, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপকার হচ্ছে তাঁকে ঈশ্বরবিশ্বাসের শক্তিতে সঞ্জীবিত করা। প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্ববাসী জীবমাত্রের প্রতি করুণাময়, প্রেমময়, স্নেহময় হয়। প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি মানুষের মনে স্নিগ্ধতা বিস্তার করেন। প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসীর স্পর্শে, বাক্যে, দৃষ্টিতে অনুক্ষণ বিদ্বেষ-বর্জ্জিত লোভমুক্ত সন্তোষ বর্ষিত হয়। ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিনা আয়াসে চরিত্রধন রক্ষা ক'রে চল্‌তে পারে ব'লে সে দেশের হয় অলঙ্কার, জাতির হয় ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরবিশ্বাসীর হিংসাহীন মন সর্ব্বত্র শান্তির প্রসার ঘটায়।

স্বাধীনতা ও চরিত্র-গঠন

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবামণি খাতুনগঞ্জ শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র দত্তের গৃহে আসিলেন। অতুলদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবামণি, ভারতবর্ষ কি স্বাধীন হবে না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা সাধু-সন্তেরা স্বাধীনতাকে উপনিষদীয় মন্ত্রের ভাষায় চিন্তা করি। অর্থাৎ আমরা চাই আত্মার স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা থেকে আমাদের বঞ্চিত কত্তে পারে নাই শক, হূণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি কেউ। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্তরের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি পদে পদে প্রতিহত হয়, বাধা পায়, মন পঙ্গু থাকে, প্রাণ জড়বস্তুতে পরিণত হয়। সেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য তোমরা এক এক জনে বহু বৎসর কারাগারে কাটিয়ে এসেছ। আচ্ছা বল ত' আমরা স্বাধীনতা পেলে প্রথমেই কি কর্ব্ব?

অতুলদা' চুপ করিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কারাবাসের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। আমি দেখেছি, সাধারণ খুনী, ডাকাত, নারীধর্ষক অপরাধীর প্রাণে কত কত মহৎ চিন্তা, আবার স্বাধীনতা-কামী শিক্ষিত যুবকের মনে কত সঙ্কীর্ণতা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাওয়ার আগে, পাওয়ার পরে, সর্ব্বসময় আমাদের চরিত্রিক উন্নতি অব্যাহত থাকা প্রয়োজন ব'লে আমি মনে করি। যেই ইংরাজ ভারতবর্ষ অধিকার ক'রে ব'সে আছে

ব'লে আমাদের অসন্তোষের সীমা নেই, সেই ইংরাজের দেশে হাজার হাজার টন গোদুগ্ধে কেউ কখনো একবিন্দু জল ভেজাল দেয়? সেই ইংরাজের দেশে লণ্ডনের রাজপথে প্রহরাহীন অবস্থায় ফেলে রাখা সংবাদপত্র কেউ বিনা পয়সায় নিয়ে চোর হয়? এইরূপ সততা ত' আমাদের দেশেও একদা ছিল। আজ কি আর পাটলীপুত্রের দোকানদার সদর দরজা খোলা রেখে রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে? স্বাধীন হবার পরে আমরা যদি একে অন্যাকে ঠকিয়ে কেবল অসৎ পথে ধনার্জ্জনকেই জীবনের কাম্য করি, তবে স্বাধীনতার জন্য যারা অবহেলে প্রাণ দিচ্ছেন, তাঁরা কি পরকালে শান্তি পাবেন? এই সব কথা ভেবে আমার মনে হচ্ছে যে, আমাদের চরিত্র-আন্দোলনকে একটা ব্যাপক রূপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি অযাচক। নিজের ক্ষমতায় আমি একা একা কতটুকু কাজ কত্তে পারি? তবু আমি সাধ্যমত কাজ ক'রে যাব। কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করুক আর না করুক, আমি আমার গান নির্লজ্জ ভাবে গেয়েই যাব।

পাথরঘাটা আশ্রম, চট্টগ্রাম
৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৪৩
(২০শে মে, ১৯৩৬)

পত্নী-বিয়োগে পুনর্দার গ্রহণ

একজনের স্ত্রী মারা গিয়াছেন। তিনি পুনরায় দার-পরিগ্রহ

করিতে চাহেন। শ্রীশ্রীবাবামণির নিকট হইতে আদেশ, উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ চাহিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন।

সমস্ত বিবরণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথমা পত্নী মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে তোমরা যেমন সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা কত্তে ব'সে যাও যে, দ্বিতীয়া পত্নী রূপে কোনো মেয়েকে বিবাহ কর্ব্বে কিনা, কোনো স্ত্রীলোকের যদি স্বামী মারা যায়, তাহ'লে সেই নারী কি তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে বসে যে, এখন কাকে দ্রুত দ্বিতীয় স্বামী রূপে গ্রহণ করা যায়? এই কথাটার উত্তর আগে দাও। বল্‌বে, সমাজে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ চালু নেই ব'লেই তারা মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করে। পুরুষের দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার, এমন কি চতুর্থ বার দারগ্রহণেরও হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং এতে লজ্জার কারণ নেই। কিন্তু আর একটী মেয়েকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা তোমার কি, তা আগে খুঁজে বের কর। তোমার অকালে মৃত্যু ঘটলে তোমার সদ্যোবিধবা পত্নী যদি আমৃত্যু পুরুষ-সংসর্গ-বর্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে যেতে সমর্থ হয়, তবে স্ত্রী ম'রে গেলে তুমি কেন তা পার্ব্বে না? তুমি বলতে পার যে, প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ছেলেমেয়েদের লালন, পালন, লেখাপড়া প্রভৃতি করার জন্য আর একটী মা তাদের দরকার। তাহ'লে তোমার সন্তানবতী বিধবা পত্নীও ত দাবী কত্তে পারে যে, শিশুপুত্রকন্যাদের লালন, পালন ও লেখাপড়া

করার জন্য তাদের আর একটী পিতা প্রয়োজন। তুমি পত্নীহীন হয়েছ, এটা দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই কিন্তু যে পতিহীনা হ'ল, তার দুর্ভাগ্যটা কি এর চেয়ে কিছু কম? তেমন একটী মেয়েকে বিবাহ ক'রে ঘরে তুলে নিলে দোষ কি? তোমার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে যদি নূতন মা এসে সমাদরে গ্রহণ কত্তে পারেন, তবে দ্বিতীয় স্বামী রূপে তুমি একটী শিশু-সন্তানের অধিকারী বিধবাকে বিবাহ ক'রে এনে তার সন্তানের পিতার অভাব কেন দূর কর্ব্বে না? যে ক্ষেত্রে পুনরায় কারো কাছে বিবাহিতা না হ'লে নানা দুর্য্যোগে প'ড়ে কোনো বিধবার সত্যচ্যুত, ধর্ম্মচ্যুত, সতীত্বচ্যুত ও নিরাশ্রয় হ'তে হবে, সে ক্ষেত্রে একটী মেয়েকে অধঃপতন এবং দুর্গতি থেকে রক্ষা করার জন্য তুমি একটী বিধবাকেই কেন বিবাহ কর্ব্বে না? এদেশে অকাল মৃত্যুর আকাল নেই, তাই বালবিধবারও অভাব নেই। তোমরা একটী পত্নীর বিয়োগের পরে আবার খুঁজে পেতে আর একটী কুমারীকেই বিবাহ কর। ফলে, কুমারী-বিবাহে যার সত্যিকারের অধিকার, সেই কুমার বিবাহার্থীরা উপযুক্ত কন্যা পায় না। এটা কি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যাপার নয়? দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার দুই চার মাস পর থেকেই তোমরা নিজ নিজ প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদিগকে অনাদর ও অপমান কত্তে শুরু কর। এর ফলে ঘরে ঘরে পুত্রকন্যারা মাতাপিতা থাকা সত্ত্বেও অনাথ হ'য়ে পড়ে। এর ফলে কি সংসারে অশান্তি

জন্মে না? সংসার কত্তেই ত' চাচ্ছ সুখের জন্য। সেই সুখ, সেই শান্তি যাতে অব্যাহত ভাবে পেতে পার, তার দিকে তাকিয়ে কাজ করো। আমি বলছি না যে, সবাই সন্ন্যাসী হ'য়ে যাও, সাধুদের মঠ-মন্দির-আখড়াগুলি নূতন নূতন সন্ন্যাসীতে মুখর হ'য়ে উঠুক। সর্ব্বজীব-কল্যাণের জন্য, বিশ্ব-মানব-কুশলের জন্য ধন্য-জীবন অনেক মানুষ সন্ন্যাসী হবেন, এটা ধ্রুব সত্য। কিন্তু কৃত্রিম ভাবে, নানা বিপর্য্যয়কর পরিস্থিতির চাপে, তাঁদের সংখ্যা বাড়ুক, এমন কামনা কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কর্ব্বে না। নিজে আর একটা বিয়ে করার আগে শতবার চিন্তা কর যে, অকাল-বৈধব্য-দগ্ধ নিরাশ্রয়া সচ্চরিত্র মেয়েদের প্রতি তোমাদের কি কর্ত্তব্য আছে।

কুমারী জীবনের সতর্কতা

প্রথমোক্ত ব্যক্তি চলিয়া গেলে অপর এক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নোত্তরে কথা উঠিল কুমারীদের বিষয় নিয়া। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— কুমারীর মুখসৌন্দর্য্য এক অপার্থিব বস্তু, যা দর্শনে আকৃষ্ট হ'য়ে পারে না পৃথিবীর অধিকাংশ মানব। গাত্রত্বকের বর্ণ, মুখের গড়ন, শরীরের চলন-ভঙ্গী প্রভৃতির সঙ্গে একেবারে নিরপেক্ষ ভাবেই তার কৌমার্য্য তাকে একটা অপরূপ সুষমায় সজ্জিত ক'রে দেয়। এ সৌন্দর্য্য সধবার নেই, বিধবারও নেই—অবশ্য যদি তাঁরা ঈশ্বর-নিবেদিত চিত্ত অসাধারণ কেউ না হ'য়ে থাকেন। কুমারীর এই স্বাভাবিক

আকর্ষণী শক্তির কথা কুমারীরা জানে না, তাই তারা সকল সময়ে সতর্ক হ'য়ে চলতে পারে না। তারা আরও জানে না কাম-কাতর কুক্কুর-স্বভাব জানোয়ার-তুল্য পুরুষদের কুটিল ও বিচিত্র ছলনাময় চরিত্রের কথা। নাই তাদের অভিজ্ঞতা সাংসারিক বহুবিধ কুটিলতা ও চতুরী সম্পর্কে। এই জন্যই তাদের না জেনে না বুঝে হঠাৎ বিপদে প'ড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তারই দরুণ বুদ্ধিমান্ পিতা ও বুদ্ধিমতী মাতা কুমারী কন্যা সম্পর্কে সর্ব্বদা সশঙ্ক ও সচকিত থাকেন এবং নিজ সন্তানকে পক্ষপুটে ঢেকে রেখে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এভাবে কটি কন্যাকে মা মুষ্টিমধ্যে আগলে রাখতে পার্ব্বেন? আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে কোনটী কোন্ দিকে গড়িয়ে পড়ে, তা কে বলতে পারে? সুতরাং সংসার সম্বন্ধে, সংসারের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে, সংসারের কুটিলতা, জটিলতা, কপটতা সম্পর্কে কুমারী কন্যাকে জ্ঞান দান ক'রে জ্ঞানেরই বলে তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সদুপায় হবে। কুমারীদের চরিত্র সম্পর্কে কারো মনে কোনো মিথ্যা সন্দেহের সৃষ্টি যাতে না হ'তে পারে, তার জন্য তাকে সদাচারের শিক্ষা দিতে হবে, লোকচক্ষে শ্রেষ্ঠ থাকার সদুপায়গুলি জানিয়ে দিতে হবে, বাইরে এবং ভিতরে এক থাকার মতন চারিত্রিক নিষ্ঠা তার ভিতরে সৃষ্টি ক'রে দিতে হবে। কাজটী কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। জনসংখ্যা-

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনপদের সমস্যাসমূহের যেমন জটিলতা বাড়ে, সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক সমস্যাসমূহও তেমন বাড়তে থাকে। এই জন্যই নিজ নিজ কুমারী কন্যার হিতের জন্যই পিতা ও মাতাকে নিজ নিজ সন্তান-সংখ্যা ব্রহ্মচর্য্যের বলে সীমিত রাখবার চেষ্টায় ব্রতী হ'তে হবে। যে পিতামাতা ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা গোপনে গোপনেও করেন, তাদের সন্তান স্বভাবতই কামদমনের সামর্থ্য অধিক পায়।

বালিকাদিগকে পুরুষের অতি-ঘনিষ্ঠতা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধু-সজ্জন নামে পরিচিত অনেককে দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁরা কিশোর-কিশোরী, বালক-বালিকা, এমন কি যুবক-যুবতীদের দেখলেও বুকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করেন। এ কাজটি যখন প্রকাশ্যভাবে সর্ব্ব-জন-সমক্ষে করেন, তখন মনে করা চলে যে, এটা তাঁদের শিশুবৎ হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাস কিন্তু যখন লোক-লোচনের অন্তরালে কাজটি করেন, তখন আবার উচ্ছ্বাসের আধিক্য দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে মনে করলে ভুল হবে না যে, একাজগুলি ভদ্রলোকের অন্তরে অবস্থিত গোপন ভোগ-কামনার একটি সভ্যতা-সম্মত

বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এসব ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী প্রভৃতির সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সর্ব্বজীব প্রেম নাম ধ'রে এই জাতীয় উচ্ছ্বাসকে আগে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। চুম্বন, লেহন, অঙ্গসংবাহন, চিবুকে চিবুক স্থাপন, জিহ্বা ও দন্তের সংযোগে নানা প্রকারের ধ্বনি উৎপাদন, কাতুকুতু দেওয়া বা ওষ্ঠ ধরিয়া আকর্ষণ আদি নানা প্রকারের কামাঙ্গ ব্যাপার স্বাভাবিক স্নেহের নামে চতুর ব্যক্তিরা অসদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত হ'য়ে চালু ক'রে থাকে। এ সব ব্যাপারকে ক্ষমার চক্ষে দেখা কখনো উচিত নয়। বয়সের ব্যবধান যতই থাকুক, শারীরিক দিক দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে অকারণ ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির সুযোগ দান কদাচ কর্ত্তব্য নহে। চখের সম্মুখে এই সকল আপত্তিজনক ব্যবহার দেখেও অনেক মূঢ় ব্যক্তি চখের লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারে না এবং এর ফলে, যেই পাষণ্ডকে গলাধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের ক'রে দেওয়া উচিত, তাকেও অনেক সময়ে বৎসরের পর বৎসর মহাসমাদরে ঘরের মধ্যে বড় আসনে বসিয়ে পূজা করা হয়। সাধু-সজ্জনেরা কি breeding bull যে, ঘরে ঘরে গিয়ে কেবল গাভীর গর্ভাধান ক'রে বেড়াবে? অভিভাবকগুলি অন্তঃসারহীন কাপুরুষ, এজন্যই এরকম ব্যাপার-সমূহ নানা স্থানে ঘটতে পারছে। সাধু-সজ্জনই হোন, ধর্ম্মপ্রচারকই হোন, সঙ্গীত-শিক্ষকই হোন, প্রাইভেট টিউটারই হোন, সতর্কতা সকলের সম্পর্কেই প্রয়োজন আছে। এদেশে নারীজাতির মধ্যে শৌর্য্যমূলক শিক্ষার অভাব

ব'লেই আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। আমার মতে মেয়েদের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগঠনের এবং আত্মরক্ষণের শক্তি অর্জ্জনের শিক্ষাও একান্ত প্রয়োজন। তুচ্ছ একটু আগুনের ফুলকি সমগ্র জনপদ দগ্ধ ক'রে দিতে পারে, এটা ভোলা উচিত নয়।

নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিও না

অপর একজনের বক্তব্য শুনিবার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— সুদূর প্রবাসে একা পড়ে গেছ। তাই নিজেকে একেবারে নির্ব্বান্ধব মনে হয়। তাই ত' তোমার সমস্যা? কিন্তু মনে রেখো, তুমি যখন সাধন কত্তে বস, তখন আমি তোমার নিত্যসঙ্গী, তখন আমি তোমার অনন্ত পথযাত্রার নিত্যসাথী, তোমার সঙ্গে তখন আমার অবিচ্ছেদ্য নৈকট্য। কেন তবে তুমি নিজেকে একক, নিঃসঙ্গ ও বান্ধবভাগ্য-বর্জ্জিত ব'লে ভ্রম কর্ব্বে? শুধু নিজ স্ত্রীটিকে নিয়ে সুদূর ব্রহ্মদেশে বাস কচ্ছ। তোমার কোনও ধর্ম্মীয় সতীর্থ নেই, কোনো গুরুভাইবোনের সান্নিধ্য তুমি পাও না কিন্তু স্বামি-স্ত্রী দুজনে মিলে সপ্তাহে যে একটি দিন সমবেত উপাসনাতে বসবে, সেদিন তোমাদের বসবার আসনখানার সম্মুখে আমার জন্য একখানা আসন রেখো। ঐ দিন আমি তোমাদের সঙ্গে সমসাধক হ'য়ে একসঙ্গে পরমেশ্বরের ভজনা করব। সপ্তাহে

একটি মাত্র দিন একাজটী ক'রো, দেখবে, বৎসরের বাহান্নটি সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা একবার পার হ'য়ে গেলে তুমি আর আমি দূরদূরান্তে বাস ক'রেও কত আত্মীয়তা, কত কুটুম্বিতা, কত নৈকট্য লাভ ক'রে আছি। যে দেশে একটীও সমধর্ম্মী নেই, একটিও সহকর্ম্মী নেই, সেই দেশেও আমি তোমার সঙ্গে আছি, ছিলাম এবং থাক্‌ব। দুচার বছর পরে তুমি হয়ত আর ব্রহ্মদেশে থাকবে না ঘটনার বিচিত্র গতিতে হয়ত যাবে জাপানে, চীনে, কানাডায়, রাশিয়ায়, ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্ম্মেণীতে বা হল্যাণ্ডে। হয়ত ব্রেজিল বা আফ্রিকার অরণ্যে, গোবীর বা সাহারার মরুভূমিতে তোমাকে ছুটতে হবে অন্নের তল্লাসে। তবু তুমি যাবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে। তোমার মনে, প্রাণে, বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে আমি তোমার অন্তরতম সমসাধক হ'য়ে নিয়ত বিরাজ কর্ব্ব। ভারতবর্ষকে আজ তুমি যা দেখ্‌তে পাচ্ছ, চিরকালই সে তা থাক্‌বে না। আজ বিদেশে তোমার যে অনাদর, বিশ্বের মানুষের কাছে তোমরা চিরকালই তেমন অনাদৃত থাকবে না। তোমাদের ভিতরের সুপ্ত সূর্য্য জ্ঞানের ও ভক্তির কিরণমালা নিয়ে চারিদিকে রশ্মি বিকিরণ কত্তে কত্তে বিশ্বজগতের সঙ্গে তোমাদের একাত্মতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে। তখন ত্রিভুবন তোমার স্বদেশ হবে আর ত্রিভুবনের যে কোনও স্থানের প্রতিটি অধিবাসী তোমার স্বদেশবাসী হবে। শুধু সেই শুভদিনটি

না আসা পর্য্যন্তই নয়, অনন্ত কাল ধ'রে আমি তোমার সঙ্গে থাকব। কদাচ তোমাকে একা থাক্‌তে দিব না।

ভারত কি স্বাধীন হইবে

এই সময়ে খাতুনগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র আসিয়া একটি পুরাতন প্রশ্ন দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন,—ভারতবর্ষ কি স্বাধীন হ'তে পার্‌বে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'তে পার্ব্বে কি পার্ব্বে না, এই প্রশ্নের আবার জবাব কি দিতে যাব? রাজনৈতিক এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। আমি দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে দু'কথা বলতে পারি। একদা এদেশের সর্ব্বত্র ছিলেন অনার্য্যরা। নানা রকমের অনার্য্য, নানা স্তরের অনার্য্য, নানা ভাষার অনার্য্য, নানা আচারের অনার্য্য। এলেন অবিমিশ্র আর্য্যেরা, তাঁদের নূতন ভাষা, নূতন রীতিনীতি, নূতন জীবন-দর্শন ও জীবন-ধারা নিয়ে। তাঁরা পারস্য দেশের তাৎকালিক অধিবাসী অহুরমজ্‌দার উপাসকদের দ্বারা বিতাড়িত হ'য়েই এদেশে এলেন কিনা, পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে দ্বিমত। কিন্তু তাঁদের পরেও এদেশে অনেক দেশ থেকে অনেক জাতি এসেছে, কেউ অগ্রবর্ত্তীদের সঙ্গে মিশে গেছে, কেউ কেউ ভাষায়, আহারে, বিহারে জীবনধারণ-রীতিতে বা অন্যান্য প্রকারে নিজ নিজ পৃথক্ অস্তিত্ব রক্ষা কর্ত্তে চেষ্টা করেছে। দিল্লীর তক্তে অথবা সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রভুত্বের আসনে অনেকেই

অনেকবার বসেছে। কিন্তু কেউ স্থায়ী হ'ল কি? আর্য্য-শাসন আজ আছে? গ্রীক-শাসন? ইরাণ-তুরাণের শাসন? পাঠানও গেল, মোঘলও গেল। সবাই যখন যায়, তখন এক ইংরাজই কি ভারতে অনড় হ'য়ে থাকবে? আমি রাজনীতির কথা বলছি না। বলছি বিশুদ্ধ দর্শনশাস্ত্র, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিশাস্ত্র বা লজিক। আর্য্যেরা একজনও এদেশে যখন আসে নি, তখন ভারত স্বাধীন ছিল কি? গ্রীক পাঠান, মোঘল এল, তখন ভারত স্বাধীন হ'ল কি? না পরাধীন হ'ল? ইংরাজ এসে মোঘল-পাঠান, মারাঠী, শিখ প্রভৃতি সকলের কর্ত্তৃত্বের অবসান ঘটিয়েছে ব'লেই কি আমরা পরাধীন? ইংরাজ এদের সকলের কর্ত্তৃত্ব বিনষ্ট ক'রে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করেছে ব'লেই কি আমরা পরাধীন? তা যদি হয়, তবে ত' ইংরাজ চ'লে গেলেই আমরা স্বাধীন হব। কিন্তু সত্যই স্বাধীন হব কি? এই সব কথা দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। ইংরাজ চ'লে গেলেই আমাদের স্বাধীনতা আমরা রাখতে পার্ব্ব ত'? ছোবল মেরে রাশিয়া বা চায়না আমাদের লুফে নেবে না ত'? এক অর্থে স্বাধীন হ'য়ে অন্য শত শত অর্থে আমরা এদেশের আর ওদেশের অধীন হ'য়ে পড়্‌ব না ত'? নিজেদের স্বাধীনতা নিজ ভুজবলে রক্ষা করার মতন রুচি এবং চরিত্রবল আমরা আহরণ কর্চ্ছি কি? না, আমরা স্বাধীন হবার পরে এক এক জনে কোটি কোটি মানুষকে বঞ্চিত ক'রে নিজেদের ব্যক্তিগত সৌভাগ্যের সাধন ক'র্ত্তে

মত্ত হ'য়ে যাব? এগুলি সবই ভাববার কথা। আজ যে মানুষ একটী কপর্দ্দক পরকে ঠকিয়ে নিতে কুণ্ঠিত, সুযোগ পেয়ে কাল সে কোটি কোটি মুদ্রা পরস্বাপহরণ ক'রে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেশময় চ'রে বেড়াবে না ত'? দেশ স্বাধীন হ'লে গরীব কি আরো গরীব হবে, দুর্ব্বল কি আরো দুর্ব্বল হবে, দুর্ভাগ্যের শিকার হবে? ধনী কি আরো ধনী হবে, বিলাসী কি আরো বিলাসী হবে? স্বার্থপর নরনারীরা কি আরো স্বার্থপর হবে? এই সব কথা ভাবতে হবে। দুটা কি দশটা পিস্তলের ট্রিগার চেপে ধ'রে ইংরাজকে তাড়ানো যায় নি, তবে কি দেশব্যাপী লঙ্কাকাণ্ড ক'রে তাকে তাড়াতে হবে, না সে তার নিজের সদিচ্ছায় আপনা আপনি চলে যাবে? ইংরাজ জাতির মধ্যে সে রকম মহানুভব মানুষ অনেক আছেন, যাঁরা জানেন এবং স্বীকার করেন যে, ইংল্যাণ্ড ভারতকে শোষণ ক'রে শেষ না ক'রে দিলে বর্ত্তমান ভারত দারিদ্র্যের এমন এক সীমান্তে এসে দাঁড়াত না। তাই অনেক সরল-হৃদয় মানুষ মনে মনে আশাও করেন যে, একদিন ইংরাজ আমাদের দেশ আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে বিলেত চ'লে যাবেন বিলাতি তুলসী-তলায় ব'সে চোখ বুজে মালা জপ কর্ব্বার জন্য। কিন্তু এরকম কিছু সম্ভব হবে ব'লে আমার মনে হয় না। কারণ, ইংরাজ তাঁর একনিষ্ঠার বলে, রণকৌশলের বলে, চতুরতার বলে, বহু বহু মূল্যবান প্রাণকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহুতি দিয়ে ভারতে সাম্রাজ্য জয় করেছেন।

ইংরেজ যদি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন, তার অন্য কারণে কর্‌বেন, যে কারণ সম্পর্কে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান কোনো অনুমান কত্তে অসমর্থ। কিন্তু ইংরাজ যেদিন থাকবেন না, সেদিন আমরা কি ভাবে চলব, কেমন ক'রে পথচলাকে সহজ ক'রে নেব, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আমাদের আজই। সুতরাং প্রশ্ন ক'রো না, ভারত স্বাধীন হবে কিনা। বরং প্রশ্ন কর যে, স্বাধীন হ'লে আমরা কি কর্ব্ব।

ঊর্দ্ধে উড়িছে পতাকা কার

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি গুন্‌গুন করিয়া স্বরচিত সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন,—

ঊর্দ্ধে উড়িচে পতাকা কার?
　　এ যে বিশ্বের স্বাধীনতার!
সবাই হইবে ঈশ্বরাধীন,
　　আপনার হবে সবে সবার।।
কে করিছে আজ শঙ্খনাদ—
"ভোল্ রে দুঃখ, ভোল্ বিষাদ?"
এ যে রে বিশ্বপিতার কণ্ঠ
　　ঘুচাতে সবার মনোবিষাদ;
ঘুচাইতে আধি, ব্যাধি ও দৈন্য,
　　ঘুচাতে সবার মনোবিকার।।

সবারে আজিকে করিয়া এক
বুকের রক্তে ঘোষণা লেখ্,—
সবাই হইব সবার আপন,
নখিল বিশ্ব চাহিয়া দেখ্।
প্রেমের প্রবল প্লাবনে ভাসিয়ে
করিব চিত্ত পরিষ্কার।।
অতীতে কখনো হয়নি যা,
আমরা সফল করিব তা,
মৃত্যুও যদি সম্মুখে আসে
আমরা তাহারে ডরিব না।
উত্থানে আর পতনে নিবেন
পরমেশ্বর মোদের ভার।।

পাথরঘাটা আশ্রম, চট্টগ্রাম
৭ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৩
(২২শে মে, ১৯৩৬)

মুখস-পরা জীবন

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধুপুরুষ নামে খ্যাত ব্যক্তিরা অনেক সময়ে সাধুগিরির মুখস প'রে লোক-প্রবঞ্চনা ক'রে বেড়ায়, একথা দুঃখজনক হ'লেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথার্থ সত্য। আবার গুরুভক্তির মুখস প'রে অনেক কপট ভক্ত নিরীহ গো-বেচারী

সাধুদের প্রবঞ্চনা ক'রে থাকে, এটাও সমান সত্য। সাধারণ মানুষের কাছে সাধুমানুষ নিঃসন্দেহে পূজনীয় ও অলঙ্ঘনীয়। আবার গুরুর কাছে শিষ্যগণের এমন একটা বিশ্বস্ততার মর্য্যাদা আছে, যা লঙ্ঘন করার কথা শিষ্যের পক্ষে অকল্পনীয়। কিন্তু তা হ'লে কি হবে? স্বভাব না যায় ম'লে। ব্যক্তি বিশেষ সারা জীবন এমন নিকৃষ্ঠতার অনুশীলন ক'রে এসেছে যে, সুযোগ পেলে সে জগতের সবাইকে ঠকাতে পারে। সে যে বেইমান নয়, একথা সে হাজার বার উচ্চারণ কর্ব্বে কিন্তু কাজের বেলা যা কর্ব্বে, তা বেইমানি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতির নিয়মে এসব বিসদৃশ ঘটনা ঘটছে মনে ক'রে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ নিজের উদ্বেগ ও অশান্তিকে সাম্‌লে যান কিন্তু সাধারণ উপাদানে গড়া, সাধারণ রীতিনীতিতে অভ্যস্ত, সাধারণ প্রজ্ঞার মানুষ ক্ষেপে যায় এবং হয় নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে আক্ষেপ করে অথবা অভিসম্পাত ক'রে ক'রে আর্ত্তনাদে আকাশ মথিত করে। মুখস-পরা জীবন জীবনই নয় ওটা একটা নারকীয় ব্যাপার। কপটতার লেশমাত্র গন্ধ কারো মধ্যে যদি পেয়েছ, তবে জান্‌বে, তোমাকে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ কত্তে হবে এবং সাহস ক'রে এই কুসঙ্গ পরিহার কত্তে হবে।

চক্ষুলজ্জার দোষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চক্ষুলজ্জার সব থেকে মারাত্মক

দোষ হচ্ছে এই যে, একবার চক্ষুলজ্জাবশতঃ যদি একটি ক্ষুদ্র অন্যায় দেখে তার প্রতিবাদ কত্তে বিরত থেকেছ, তাহ'লে সেই চক্ষুলজ্জার অভ্যাস তোমার ঘাড়ে ভূতের মতন চেপে বসবে এবং পরবর্ত্তী অন্য ঘটনা-কালে তোমাকে তোমার কর্ত্তব্য কততে প্রাণপণে বাধা দেবে। চক্ষুলজ্জা যার বেশী, তার আত্মসম্মান-জ্ঞান ক'মে যায়, সে নিজের কাছে নিজের মূল্য কমিয়ে দেয়। যতসব ছোকরা ছেলেমেয়ে দুষ্ট ও ধূর্ত্ত লোকদের দ্বারা নৈতিক ভাবে অসম্মানিত হয়, তারা সব এই রোগের রোগী। সাহস ক'রে তারা প্রতিবাদ করে না বা অন্যকে অপমানের বিষয়টী জানতে দেয় না। তারই ফলে একটা ছোট পাপ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে তারা পরে পরে অনেক জঘন্যতর এবং জঘন্যতম পাপের শিকার হয়। যত কুলবধূ সংসারের পবিত্র আশ্রয় ছেড়ে বিপথে পাদচারণা ক'রে জন্মের মত ভদ্র-সমাজের অস্পৃশ্য হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের প্রথম জীবনের শত্রু এই চক্ষুলজ্জা। নামী, দামী, প্রভাবশালী, বিদ্বান্ বা ধনবান্ লোকেরা যখন আসল বিপদের প্রথম কারণগুলি সৃষ্টি করে, তখন শুধু চক্ষুলজ্জায় নয়, ভয় থেকেও অনেকে প্রতিবাদ কত্তে বিরত থাকে। সুতরাং পাপ চেষ্টায় প্রতিবাদ করার জন্য চক্ষুলজ্জা আর ভয় এই দুইটাকেই বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। এই অতি দরকারী কথাটা কত কত লোকেই না নিজ নিজ জীবনের দুর্গতি থেকে জান্‌তে পেরেছে কিন্তু কেউ জনসাধারণকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেয়

না, প্রেরণা যোগায় না, উৎসাহ বিতরণ করে না। এটা সত্যই দুঃখজনক।

নামে রুচি

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামের মহিমার অন্ত নাই। কিন্তু অবিরাম সাধন ক'রে তা' উপলব্ধি করতে হয়। যখন যে উপলক্ষ্য পাও, কেবল নাম কর এবং লোককে নাম শুনাও। নাম কর বিনম্র মন নিয়ে। নাম শুনাও প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে প্রেমপূর্ণ মনে। অপরে নাম-কীর্ত্তনাদি করলে ভক্তিভরে তা শোনো এবং সকলকে শুনতে আগ্রহী কর। অনন্ত কোটি পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর বস্তু-সমাহারে রচিত এই সুন্দর ভুবনখানির মধ্যে একমাত্র শাশ্বত সত্য নিত্য বস্তু নাম। নামে যে রুচিমান্, সেই ভাগ্যবান্। নামে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গসুখ তোমার নামে রুচি বৃদ্ধি করবে। তুমি যদি রুচিমান্ হও, তা'হলে তোমার সংসর্গে এসে হাজার দিশাহারা নরনারীর প্রাণে নামের ও ব্যাকুলতার জোয়ার বইতে থাকবে। নামে রুচি এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস না আসা পর্য্যন্ত হাজার আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও জীবনকে মনে হবে বিস্বাদ, আলুনি, নীরস ও শুষ্ক। জীবনকে মধুময় করার, সুখময় করার, আনন্দময় করার একমাত্র উপায় হচ্ছে নামে রুচি আর ঈশ্বরে বিশ্বাস। যে সব সঙ্গ, প্রসঙ্গ বা অনুষঙ্গ তোমাকে নামে রুচি থেকে বিচ্যুত করে,

তোমাকে ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে স্খলিত করে, তা থেকে সযত্নে দূরে থাকবে। যুগের হাওয়া দিনের পর দিন পাল্টাচ্ছে, কাল মানুষকে যা দেখেছি, আজ সে তা নেই। আজ মানুষকে যা দেখতে পাচ্ছি, কাল সে তা থাকবে না। গত অল্প কয়েকটা বৎসরের ভিতরে নিত্য নব বিদেশী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ যে উদ্ধত পরাক্রমে অতি দ্রুত ঘ'টে যাচ্ছে, তাতে এই আশঙ্কা করা অন্যায় নয় যে, একদিন হয়ত উপনিষদ, গীতা, ভাগবত বা অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে উল্লাস সহকারে বীভৎস বহ্ন্যুৎসব হবে এবং যৌন তাড়নার অন্ধ প্ররোচনায় কিশোর-কিশোরী যুবক যুবতী সবাই মিলে শুধু প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চেই নয়, পরন্তু প্রকাশ্য জনসভার মাঝখানে, ন্যক্কারজনক যৌনলীলা প্রদর্শনকে একটা পরমপুরুষার্থ ব'লে গর্ব্বভরে জ্ঞান করবে। মহাদুঃখের ভিতর দিয়ে এদের চিত্তের পরিশোধন না হ'লে পরিণামে দেশব্যাপী ও জগদ্‌বিস্তৃত হাহাকারের সাহারা সৃষ্টি ক'রে এরা অন্তহীন তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে বারংবার কপাল চাপড়াবে। কাঁদবে "একটু জল" "একটু জল" ব'লে। সেই সুশীতল পানীয় জানবে ঈশ্বরের নাম। ছায়াশীতল স্নিগ্ধতা জানবে নামে রুচি।

ধৈর্য্য, প্রতীক্ষা, নিরন্তর স্মরণ-মনন

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি

বলিলেন,—কর্ম্মানুশীলন সম্পর্কে উপদেশ চাচ্ছ ত'? আমি বলি, তোমরা প্রতি কার্য্যে ঐক্যের অনুশীলন করো। ঐক্য সরলতার ফল। সরলতা নিয়ত-সাধন নিষ্ঠার ফল। সাধন-নিষ্ঠা গুরুভক্তির ফল। গুরুভক্তি পরমেশ্বর-কৃপার ফল। এই সকল সুদুর্লভ সুফল তোমাদের প্রত্যেকের সুলভ হউক, এইটাই আমি চাই। এই জন্যই বলি, প্রাণপণ যত্নে ঈশ্বরাভিমুখী হও। নিজসুখের অভিলাষী না হ'য়ে ঈশ্বর-প্রীণনকে জীবনের পরমাভীষ্ট কর। ভগবানকে নিয়ত ডাকতে ডাকতে এটা আপনি এসে যায়। চেষ্টা ক'রে তোমাকে কিছুই কত্তে হবে না, একমাত্র নাম-স্মরণ ব্যতীত। নাম কত্তে কত্তে, আর যা কিছু প্রয়োজন, নামের গুণে আপনা আপনি সিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে, প্রতীক্ষা করার সামর্থ্য চাই। আম্রবীজ বপন ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই আম্রফল পাওয়া যায় না। বীজকে অঙ্কুরিত হ'তে দিতে হবে। অঙ্কুরকে কাণ্ডে, শাখায়, পল্লবে ও ফুলে রূপান্তরিত হ'তে অবসর দিতে হবে, ফলকে সুপক্ব হবার সুযোগ দিতে হবে। সুতরাং সাধন-জীবনে প্রতীক্ষা একটা খুব বড় কথা। এই প্রতীক্ষাকেই বৈষ্ণব সাধকেরা নাম দিয়েছেন বিরহ। বিরহ-জ্বালায় জলতে জলতে একেবারে গ'লে যেতে পার্লে, তবে তুমি নিখাদ সোণার সন্ধান পাবে। ধৈর্য্য আর প্রতীক্ষা, অবিরাম স্মরণ, মনন, চিন্তন ও ধ্যান, নিরন্তর নামে লেগে থাকা,—এইটাই কর্ম্মানুশীলনের কৌশল সম্পর্কে একেবারে চূড়ান্ত কথা।

ভালবাসা

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভালবাসাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ফল ভালবাসা। ভালবাসা অতি পবিত্র বস্তু। জগতের প্রত্যেকটী জীবের ভালবাসাকে আমি অতীব সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকি। মানুষকে ভালবাসাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, ভাল না বাসাই অস্বাভাবিক। তবে, সে ভালবাসা যেন অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়। ভালবাসার পথে গোপনতাকে প্রশ্রয় দিলে সে স্বর্ণবর্ণ ত্যাগ ক'রে কৃষ্ণবর্ণ হয়, তার ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য্য তাতে নষ্ট হয়, সে তাতে বিকার-প্রাপ্ত অশুদ্ধ বস্তুতে পরিণত হয়। একটী স্থানে ভালবাসা জন্মে গেলে সেই ভালবাসা বিস্তৃততর হ'তে হ'তে কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করে,—তাকেই বলি প্রকৃত ভালবাসা। তোমরা সাধারণতঃ যাকে ভালবাসা ব'লে মনে ক'রে থাক তার ত' অধিকাংশ স্থলেই আলেয়ার আলো বা মরুভূমির মৃগতৃষ্ণিকা। সেই কৃত্রিম, ক্ষণস্থায়ী, অবাস্তব ভালবাসা থেকে দূরে থাক। যে-কোনও একজনকে যে ভালবাসা দিলে তা সমগ্র বিশ্বকে পায় এবং বিশ্বপতির চরণ পর্য্যন্ত পৌঁছে, সেই ভালবাসা বাসো। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অন্ধ হ'য়ে যাকে ভালবাসা ব'লে মনে কচ্ছ, তা তোমার জীবনে অতি অল্প মধুই সঞ্চিত কত্তে সমর্থ। ভালবাসা ভেবে যে গরল পান কত্তে যাচ্ছ, তাতে দৈহিক, মানসিক,

আত্মিক ও সার্ব্বজনিক কি কল্যাণ কতটুকু আছে, বিচার ক'রে দেখ। ভালবাসার মোহে নিশ্চয় তুমি তোমার সত্যিকার জীবনকে বাজি রাখতে পার না। জীবন দিয়ে জুয়া খেলা চলে না।

একের কুশলে সকলের কুশল

অপর এক প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একটু সাধারণ হিসাব কল্লেই বুঝতে পারবে যে, একটা লোক যদি প্রকৃত সাধুত্ব আহরণ কত্তে পারে, তা হ'লে সে লাভটা একটা বংশ, দেশ, জাতি বা সমগ্র জগতের পক্ষে কতবড় লাভ। লাভটা কারো একার নয়, লাভটা সকলের। লাভটা কারো পক্ষে প্রত্যক্ষ ব'লে পরিমাণে বেশী, কারো পক্ষে পরোক্ষ ব'লে পরিমাণে কম। কিন্তু লাভ প্রত্যেকের। তুমি সৎক্রিয়ান্বিত বা সৎচিন্তান্বিত হ'লে তাই আমি নিজেকেও লাভবান ব'লে জ্ঞান করি।

বিপিতা ও বিমাতা

সর্ব্বশেষ আলোচনা চলিতেছিল সামাজিক নানা সমস্যা লইয়া। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—চিরকালই ত' মানুষ সমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস করে নি। নৈরাজ্যের এক সমাজ সে সময়ে ছিল, ঠিক বানর বা হনুমানদের সমাজের মতন।

একটা বলশালী পুরুষ দুর্ব্বলতর পুরুষদের হত্যা ক'রে দলে দলে স্ত্রীগণের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে চল্‌ত এবং যথাভিপ্রায় জীবন যাপন কত্ত। এই স্ত্রীরা ছিল পুরুষটীর সম্পূর্ণরূপে দাসী, ঐ একটি পুরুষের আদেশে প্রত্যেকটী নারীকে চল্‌তে হ'ত। হঠাৎ আর একজন বলবত্তর পুরুষ এই বলবান্ অধিপতিটীকে হত্যা কত্তে পার্‌লে সঙ্গে সঙ্গে সবগুলি স্ত্রীলোক ঐ একটী মাত্র পুরুষের মুখাপেক্ষিণী বা আজ্ঞাবর্ত্তিনী হ'য়ে থাক্‌ত। কিন্তু পুষ্পধন্বা কামদেবের বাণ-নিক্ষেপের কারসাজিতে হঠাৎ হঠাৎ কোনও কোনও স্ত্রীলোক অন্যান্য স্ত্রীলোকদের চেয়ে অধিকতর কাম্যা ব'লে বিবেচিত হ'তে লাগল এবং প্রণয়িনী-প্রীণনের জন্য রুক্ষ, কঠোর, নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর যাযাবর কসাইটী হঠাৎ একদিন যুক্তপাণি ভক্তে পরিণত হ'য়ে গেল। সূচনা হ'ল নারী-রাজত্বের অর্থাৎ একটী নারীকে গায়ের বলে নয়, পরন্তু প্রেমের বলে, আপন করার জন্য আরম্ভ হ'ল পুরুষদের মধ্যে সুকুমার পথে আনাগোনা এবং অধিকাংশ স্থলে পরিত্যক্ত হ'ল হত্যার নারকীয় রীতি। একটী নারী বহু পুরুষের প্রভু হ'য়ে গেল। যে অঞ্চলে বা যে যুগে পুরুষের সংখ্যা বেশী এবং নারীর সংখ্যা কম, সেই সকল অঞ্চলে বা যুগে একই নারীর বহুপতিগ্রহণ চালু হওয়াটা অন্য কারণেও স্বাভাবিক। একটি অবস্থা থেকে অন্যতর অবস্থায় পৌঁছে যেতে সমাজের কত লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল, অনুমান করা শক্ত। একই পতির মৃতদেহের সঙ্গে বহু পত্নীর-মৃতদেহ

এক সাথে সমাহিত হবার প্রমাণ নাকি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু একই পত্নীর মৃতদেহের সঙ্গে বহু পতির মৃতদেহ এক সাথে সমাহিত হবার প্রমাণ হয়ত এখনো পণ্ডিতদের হাতে পৌঁছে নাই। তাই, কোন্‌টা আদি ব্যবস্থা আর কোন্‌টা পরবর্ত্তী, তা অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এক নারীর একবার একস্থানে বিবাহ হবার পরে অন্য পতি গ্রহণের অনেক প্রাচীন দৃষ্টান্তও আছে। আর, এক পুরুষের পত্নী বর্ত্তমানে বা পত্নীবিয়োগের পরে অন্য পত্নী গ্রহণের দৃষ্টান্ত ত' ঝুড়ি ঝুড়ি। তখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল কত কম। এখন ত' তা কল্পনাতীতভাবে বেড়েছে এবং বেড়েই চলেছে। এই সময়ে সামাজিক বিবর্ত্তনের ফলে যদি বিমাতার ঘরের ছেলেদের ন্যায় বিপিতাদের ছেলেরাও কলরব শুরু ক'রে দেয়, তবে তা কিছু অসম্ভব দৃশ্য হবে ব'লে মনে করি না। মানব-সমাজ নানা দেশে নানা বিবর্ত্তনের মুখে এসে পড়েছে, কোন্ স্রোত যে কোন্ জাতিকে কোন্ দিকে টেনে নেয়, বলা কঠিন। আমার মতে, প্রাচীন ভারতের ঋষি-মহর্ষিদের আদর্শের অনুশীলন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের উপরে ভিত্তি ক'রে যখন যেখানে যা ঘটুক, সব স্নিগ্ধ মনে মেনে নিতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য যদি আদর্শ হয়, তবে পারদশোধন বেশী দেরী হবে না। মানব সভ্যতার বুকে একই ঘটনা বারংবার নানা পরিবেশে নানা রূপে নানা বিচিত্রতায় অভিনীত হচ্ছে। সেটী হ'ল মানুষের সহিত মানুষের ভালবাসা। এই ভালবাসাকে

যদি ব্রহ্মচর্য্যের সুরভি দিয়ে চর্চ্চিত ক'রে নেওয়া যায়, তাহ'লে পৃথিবীর অধিকাংশ সমস্যা আপনা আপনি মিটতে শুরু করবে। তোমরা সবাই জাতিভেদ-সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা কচ্ছ। আর, আমি ভাবি, যাতে আমাদের সকলের সমভাবে মঙ্গল হয়, তার রাস্তা নিশ্চয় খুলে যাবে, যদি ছোট-বড়-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে একবার ব্রহ্মচর্য্যের ব্রাহ্মী চেতনা এসে যায়। সর্ব্বপ্রকার সমাজ-সংস্কারের এইটাই মূল কথা জানবে।

দ্বাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত

অখণ্ড-সংহিতার দ্বাবিংশ খণ্ডের

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অখণ্ড সংগীত

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।।
ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্ট হোক্ আনন্দ-লোক।।

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক।।

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগেই অমৃত, নহেক ভোগ।।

• মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৫৮' নং গান।

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান॥
দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার॥
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অবিচল স্থির॥
অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে॥
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন॥
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
বীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে॥
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর॥
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর, আনন্দ আমার!

• মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভর-পূর॥

সকলের হৃদি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরব পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

মুছিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে;—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"॥

কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৬০' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

অখণ্ড সংহিতা

বা

ত্রয়োবিংশ শ্রী শ্রী স্বামী খণ্ড

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড - সংহিতা

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

অখণ্ড সংহিতা

বা

ত্রয়োবিংশ শ্রী শ্রী স্বামী খণ্ড

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী